প্রথম প্রকাশ
মহালয়া, ১৩৬৭

প্রকাশক
শীলা ভট্টাচার্য
আশা প্রকাশনী
৭৪, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর
রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
নিউ টাইমস্ প্রিণ্টার্স
২০৬ বিধান সরণী
কলকাতা—৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

মাধবায় নমঃ তারা আনন্দময়ী জয় রামকৃষ্ণ

মা ও বাবা

আপনারা গ্রহণ করুণ

ভূমিকা

শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, আমাদের ভগবান হাসেন !

যাহারা ধর্মভাবনা করিয়া থাকেন তাঁহারা জানেন, মহাপ্রভু রামকৃষ্ণ ধর্ম সংস্থানের জন্য আমাদের মধ্য আসিলেন, হইলেও তাঁহারা ঠিক মানুষের মতই ; ঠাকুর বলিয়াছেন, জীবন ধারণে, মেতিটুকু চাই !

মহাপ্রভু অদ্ভুত রসিক ছিলেন।

যেই রাম সেই কৃষ্ণ ইদানীং রামকৃষ্ণরূপে ! তাঁহার ভক্ত সহিত কথা প্রসঙ্গে রঙ্গরসের ইয়ত্তা নাই ! অশ্বিনীবাবু বলিয়াছেন, আপনি মজার লোক এবং লিখিয়াছিলেন, সম্মুখ থেকে সরে এলেই মনে হত, ওরে বাপরে ! কার কাছে গেছলাম। শ্রীশ্রীমা সারদাময়ীর সম্পর্কে আর কি বলিব !

ঈশ্বর কোটি বলিতে মহাপ্রভু, ঠাকুর রামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদাময়ী, ইঁহারাই ; শুধু যে ইঁহাদের রঙ্গ কৌতুক এখানে গ্রন্থিত হইল তাহা নহে ! যাঁহারা আমাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, ভাল বাসিয়াছেন, সেই সকল যোগী মহাপুরুষ, শ্রীঅরবিন্দ, কাঠিয়া বাবা, রামঠাকুর এবং মহাসাধক বিজয়কৃষ্ণ, বামাক্ষ্যাপা, নিগমানন্দ এবং মহাযোগিনী গৌরী মা, দুর্গাপুরী এবং সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, জ্ঞান মহারাজ এবং শ্রীময় রঙ্গ রসিকতাও এখানে উল্লেখিয়াছি।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তক রামমোহন, দেবন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ, কেশব সেন ও শিবনাথ -- ইহাদের কথাবার্ত্তার নিদর্শন এখানে আছে।

নিশ্চয়ই সবই যে ঈশ্বর কোটি হইতে রসিকতা সংগৃহীত এমত নহে, তাঁহাদের কথিত কিছু আখ্যানও সন্নিবেশিত হইল। আদতে গ্রন্থের নাম ঈশ্বর কোটির রঙ্গকৌতুক কথা হওয়া উচিত ছিল—কিন্তু ছোট করিয়া শুধু ঈশ্বর কোটির রঙ্গকৌতুক করা হইল। যাঁহারা পুস্তক যোগাইয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন রবীন্দ্রভারতীর লাইব্রেরিয়ান সৌরীন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ মজুমদার, এবং প্রণব কুমার বসুরায়, শক্তি রায় চৌধুরী —তাঁহাদের নিকট কেনা হইয়া রহিলাম। এই সঙ্কলনটি যথার্থই আশা প্রকাশনীর উৎসাহে বিশেষত সুবীর ভট্টাচার্য্যর জন্যই সম্ভব হইল।

জয় মাধব তারা ব্রহ্মময়ী জয় রামকৃষ্ণ আমরা এখানে আমাদের সঙ্কলন করি।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর। শ্রী শ্যামলাল গোস্বামী।

একদিন শচীদেবী রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিলেন, কৃষ্ণ ও বলরাম শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন, এবং ক্রীড়া করিতে করিতে নিত্যানন্দ পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় তাঁহার নিকট অন্ন প্রার্থনা করিতেছেন। শচীদেবী নিদ্রা ভঙ্গের পর, উক্ত স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট ব্যক্ত করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ শুনিয়া বলিলেন, মাতঃ তুমি অতি সুস্বপ্ন দর্শন করিয়াছ। তোমার এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত আর কাহারও নিকট ব্যক্ত করিও না। তোমার গৃহে যে শালগ্রাম শিলা আছেন, তিনি অতীব জাগ্রত এ সকল তাঁহারই খেলা। তুমি প্রতিদিন শালগ্রামের পূজার নিমিত্ত যে নৈবেদ্য দাও, প্রায়ই দেখি, তাহার অর্দ্ধেক থাকে না। দেখিয়া, আমার মনে তোমার বধূকেই সন্দেহ হইত, আজ তোমার স্বপ্ন শুনিয়া ঐ সন্দেহ দূর হইল। যাহা হউক, আজ নিত্যানন্দকে ভোজন করাও।—পশ্চাদভাগ হইতে পতির কথা শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী হাসিতে লাগিলেন। ৯৩ পৃ

শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে বলিলেন, শ্রীপাদ চল আমরা দুইজনে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের আলয়ে গমন করি। উহারা পথিমধ্যে গঙ্গা তীরবর্ত্তী ললিতপুর গ্রামে এক সন্ন্যাসীর গৃহে উপস্থিত হইলেন, ঐ সন্ন্যাসী, বামাচারী তান্ত্রিক গৃহস্থ, বেশতঃ ও নামতঃ সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচিত,—সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে বিশেষ যত্ন ও আদরের সহিত দুগ্ধ ও ফলাদি ভোজন করিতে দিলেন। ভোজন প্রায় শেষ হয় এমন সময় সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, শ্রীপাদ, কিছু আনন্দ আনিব? শ্রীগৌরাঙ্গ অনুচ্চস্বরে নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সন্ন্যাসী কি বলিতেছে···আনন্দ কি? নিত্যানন্দ বলিলেন, বোধ হয় মদিরা! শুনিবা মাত্রই প্রভু, বিষ্ণু বিষ্ণু বলিয়া আচমন করিলেন: আচমনের পরই দুই প্রভু দ্রুতবেগে গঙ্গায় পড়িয়া সাঁতার দিতে দিতে শান্তিপুর উপনীত হইলেন। ১১৯ পৃ

একদা শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত নগর ভ্রমণ করিতে করিতে নগরের প্রান্তভাগে এক শৌণ্ডিকালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হলধরভাবে আবিষ্ট হইলেন। প্রভু আবেশে মুহুর্মুহু 'মদ আন' 'মদ আন' বলিতে লাগিলেন। শ্রীবাস অপকলঙ্কের আশঙ্কায় প্রভুকে উক্ত ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিতে অনুনয় করিতে লাগিলেন। প্রভু কোনরূপেই নিবৃত্ত হইতেছেন না, তখন বলিলেন, প্রভু তুমি যদি নিবৃত্ত না হও তবে আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিব। শ্রীবাসের আকুলতায় প্রভুর আবেশ ভাঙ্গিল। তখন তিনি…নিজভাব সংবরণ করিলেন। এদিকে মদ্যপায়ীগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া 'হরি' বলিয়া তাঁহাকে নৃত্য করিবার অনুরোধ জানাইল। শ্রীবাস দেখিলেন, বিষম বিপদ! প্রভু তখন মদ্যপায়ীগণের প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। অমনি তাহারা প্রেমে মত্ত হইল এবং 'হরি' বলিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। ১২৫ পৃ

প্রভু, হরিদাস ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিলেন, হরিদাস, তোমাকে যবনেরা যখন বেত্রাঘাত করে তখন আমি উহা নিজ পৃষ্ঠে গ্রহণ করিয়াছিলাম এই দেখ বলিয়া নিজ অঙ্গ দেখাইলেন; প্রভুর করুণা দেখিয়া হরিদাস মূর্চ্ছিত হন; প্রভু হরিদাসকে সচেতন করিয়া বর লইতে বলিলেন, হরিদাস বলিলেন, শচীর নন্দন বাপ কৃপা কর মোরে। কুক্কুর বলিয়া মোরে রাখ ভক্ত ঘরে॥ প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া হরিদাসকে তাঁহার অভিলষিত বর প্রদান করিলেন।…এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকল ভক্তকেই ডাকিয়া বরদান করিলেন, কেবল মুকুন্দকে ডাকিলেন না, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভুকে মুকুন্দর কথা বলিলেন; প্রভু বলিলেন, মুকুন্দর জন্য কেহ আমায় অনুরোধ করিও না। ও বেটা বহুরূপী, যখন যেমন, তখন তেমন হয়। ও যখন ভক্তের নিকট যায় তখন ভক্ত হয়। আবার যখন অন্য সম্প্রদায়ের নিকট যায়, তখন ভক্তির নিন্দা করিয়া আমাকে কষ্ট দেয়। অতএব ও বেটা আরও কোটি জন্মের পর আমার দর্শন পাইবে এখন আমার দর্শন পাইবে না।

(কোটি জন্মের পর প্রভু দর্শন পাইব শুনিয়াই মুকুন্দ, পাব তো পাব তো বলিয়া নাচিতে লাগিল)। ১০০ পৃ

একদা ব্রহ্মানন্দ ভারতী প্রভু দর্শনে আসিলেন; প্রভু বলিলেন, উনি গুরু স্থানীয়, আমি স্বয়ং তাহার কাছে যাইব। আসিয়া দেখিলেন ব্রহ্মানন্দ মৃগচর্ম

পরিধান করিয়া আছেন, ইহা প্রভুর ভাল লাগে নাই ; ভারতী গোঁসাইকে না দেখার ছলে কহিলেন, মুকুন্দ তুমি বলিলে ভারতী গোঁসাই আসিয়াছে, কৈ তিনি ? তদুত্তরে মুকুন্দ বলিলেন, এই ত ভারতী গোঁসাই, এই ত আপনার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া আছেন ? প্রভু বলিলেন, তুমি অজ্ঞ, তুমি ভারতী গোঁসাইকে জান না, ভারতী গোঁসাই চর্ম্ম পরিধান করিবেন কেন। (ভারতী গোঁসাই লজ্জিত হইলেন)। ২৮০ পৃ

মহাপ্রভু সনাতনকে কহিলেন, সনাতন, তুমি যতদিন এই কাশীধামে থাকিবে ততদিনই আমার গৃহে ভিক্ষা লইবে। সনাতন কহিলেন, আমি মাধুকরী করিব, স্থূল ভিক্ষা লইব না। সনাতন গোস্বামীর বৈরাগ্য দর্শনে প্রভু অপার আনন্দ লাভ করিলেন। কিন্তু সনাতনের গায়ে মহামূল্যবান এক কম্বলের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। ইহাতে সনাতন সঙ্কুচিত হইয়া তৎক্ষণাৎ উহা ত্যাগে মনস্থ করিলেন। তিনি গঙ্গা তীরে যাইলেন, দেখিলেন তীরে এক কাঁথা শুকাইতেছে ; সনাতন গোস্বামী যাহার কাঁথা তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন, আপনি আমার এই কম্বলখানি লইয়া আপনার ঐ কাঁথাখানি আমাকে প্রদান করুন।

বৈষ্ণব ভাবিলেন, সনাতন গোস্বামী তাহাকে পরিহাস করিতেছেন। এই ভাবিয়া তিনি সনাতন গোস্বামীকে বলিলেন, আপনি প্রবীণ লোক হইয়া আমাকে পরিহাস করিতেছেন কেন ? সনাতন গোস্বামী বলিলেন, আমি সত্যই বলিতেছি, আপনাকে পরিহাস করি নাই। তখন সেই বৈষ্ণব নিজের কাঁথাখানি দিয়া সনাতন গোস্বামীর কম্বলখানি লইলেন। সনাতন গোস্বামীও ঐ কাঁথাখানি গায়ে দিয়া প্রভুর নিকট গমন আগমন করিলেন।

সনাতনকে দর্শনে মহাপ্রভু কহিলেন, সেই কম্বল কই ? সনাতন সব কথা নিবেদন করিলেন। তাহাতে প্রভু কহিলেন, কৃষ্ণ তোমার বিষয়রোগ খণ্ডাইয়া উহার শেষ রাখিবেন কেন। তিন মুদ্রার কম্বল গায়ে দিয়া মাধুকরী করিতে দেখিলে লোকে তোমাকে উপহাস করিত। এই কথা বলিয়া প্রভু প্রসন্ন হইয়া সনাতন গোস্বামীর প্রতি কৃপা ও শক্তি সঞ্চার করিলেন। ৩৮১পৃ

প্রত্যহই বল্লভভট্ট প্রভুর নিকট আগমন করেন ; প্রভুর ভক্তগণের সহিত

বিচারে প্রয়াসী হন, কিন্তু বিচারের সুযোগ হয় না; যাহা তিনি বলেন, বলিবামাত্র তাহা অদ্বৈতাচার্য্য খণ্ডন করিয়া ফেলেন। শেষে একদিন তিনি অদ্বৈতাচার্য্যকে বলিলেন, জীব প্রকৃতি, কৃষ্ণ পুরুষ, পতিব্রতা নারী কখনই পতির নাম গ্রহণ করেন না; আপনারা কিন্তু যখন তখন কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহা কিরূপ ধর্ম্ম? অদ্বৈতাচার্য্য উত্তর করিলেন, আপনার সম্মুখে মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম বসিয়া আছেন, উনি উত্তর দিবেন…। প্রভু বলিলেন, স্বামীর আজ্ঞা পালনই পতিব্রতার ধর্ম্ম, কৃষ্ণের আজ্ঞাতেই জীব কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করিয়া থাকে।…শেষে আর একদিন বল্লভভট্ট সগর্ব্বে প্রভুকে বলিলেন, শ্রীধরস্বামী ভাগবতের টীকা করিয়াছেন বটে কিন্তু তাহার টীকার একস্থলের সহিত অন্যস্থলের একবাক্যতা হয় না। আমি দোষ সকল পরিহারপূর্ব্বক আর একখানি টীকা প্রণয়ন করিতেছি। প্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, যিনি স্বামীকে মানেন না, তিনি বেশ্যার মধ্যেই গণ্য হয়েন। ৫৪৩ পৃ

(পঙক্তি ভোজনে) এদিকে অদ্বৈতাচার্য্য ও নিত্যানন্দ দুইজনে পাশাপাশি বসিয়াছিলেন। ভোজন করিতে করিতে উভয়ের মধ্যে ক্রীড়া কলহ বাধিয়া গেল। অদ্বৈতাচার্য্য বলিলেন, অবধূতের সঙ্গে এক পঙক্তিতে ভোজন করিতে বসিয়াছি না জানি আমার গতি কি হইবে? প্রভু সন্ন্যাসী উহার উহাতে কিছুই আসে যায় না, সন্ন্যাসীর অন্নদোষ হয় না; আমি গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, অবধূতের জাতি, কুল, শীল ও আচার কিছুই জানি না, উহার সঙ্গে এক পঙক্তিতে ভোজন অতিশয় অনাচার। নিত্যানন্দ বলিলেন, তুমি অদ্বৈতাচার্য্য অদ্বৈত সিদ্ধান্তে শুদ্ধা ভক্তির বাধ হয়, তোমার সিদ্ধান্ত ও তোমার সঙ্গ সর্ব্বনাশকর। যে এক বস্তু ভিন্ন দ্বিতীয় মানে না, তাহার সঙ্গে একত্র ভোজন করিয়া আমারও কি দশা হয় জানি না। ২৯৫ পৃ

প্রভু গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভট্টাচার্য্যের আয়োজন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন পরে বলিলেন, দুই প্রহরের মধ্যে এত অন্নব্যঞ্জনাদি কিরূপে পাক করাইলে, ভোগের উপর তুলসী মঞ্জরীও দেখিতেছি, কৃষ্ণের ভোগ লাগিয়াছে। ভট্টাচার্য্য পরম ভাগ্যবান রাধাকৃষ্ণে এই সকল অপূর্ব্ব অন্নব্যঞ্জনাদি ভোগ লাগাইয়াছেন। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, আমার কি শক্তি যে আমি এই সকল অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করি। এখন এই আসনে বসিয়া প্রভু ভোজন করুন।

প্রভু বলিলেন, ইহা কৃষ্ণের আসন ইহা উঠাইয়া রাখ…। …এত অন্ন কে খাইবে, আমাকে ইহা হইতে কিঞ্চিৎ দাও। …

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, তুমি নীলাচলে বায়ান্ন বার ভার ভার অন্ন ভোজন করিয়া থাক, দ্বারকাতে ষোড়ষ সহস্র মহিষীর গৃহে এবং শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যেক গোপের গৃহে ভোজন করিয়া থাক, গোবর্দ্ধন যজ্ঞে রাশি রাশি অন্ন ভোজন করিয়াছিলে, আর এই ক্ষুদ্র জীবের গৃহে এক মুষ্টি অন্ন ভোজন করিতে পার না। ৩২৪ পৃ

নিত্যানন্দ প্রভু কীর্ত্তনীয়াগণকে শ্রান্ত দেখিয়া প্রভুকে জানাইয়া কীর্ত্তন বন্ধ করিলেন। প্রভু সগণে সমুদ্রে স্নান করিয়া প্রসাদ পাইয়া গম্ভীরার দ্বারে শয়ন করিলেন। গোবিন্দ প্রভুর পাদ সম্বাহন করিতে আসিয়া প্রভুকে দ্বার জুড়িয়া শয়ান দেখিলেন। প্রতিদিন ভোজনের পর শয়ন করিলে, কিছুক্ষণ তাঁহার পাদ সম্বাহন করিয়া থাকেন। আজ প্রভুকে দ্বারদেশে শয়ান দেখিয়া কিরূপে গৃহে যাইয়া তাঁহার পাদ সম্বাহন করিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে প্রভুকে পথ ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। প্রভু উত্তর করিলেন, আমার অত্যন্ত শ্রম বোধ হইতেছে, নড়িতে পারিতেছি না। তখন গোবিন্দ সেবার বাধ হয় দেখিয়া অগত্যা প্রভুর একখানি বহির্বাস লইয়া চরণোপরি আচ্ছাদন দিয়া ঐ চরণ লঙ্ঘনপূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশান্তর প্রভুর পাদসম্বাহনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রভু নিদ্রা গেলেন। দণ্ড দুই কাল এইভাবেই কাটিয়া গেল। অনন্তর প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ হইল।…প্রভু দেখিলেন, গোবিন্দ তখনও তাঁহার পাদ সম্বাহন করিতেছেন, ভোজন করিতে যান নাই। তদ্দর্শনে প্রভু কৃত্রিম কোপ প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, আদিবস্যা, এখনও প্রসাদ পাইতে যাও নাই ? গোবিন্দ উত্তর করিলেন, প্রভু দ্বার জুড়িয়া শুইয়া আছেন, যাইতে পথ পাই নাই। প্রভু বলিলেন, আসিতে পথ পাইয়াছিলে ত ? গোবিন্দ নিরুত্তর ভাবিলেন, আসিবার সময় সেবার বাধ হয় বলিয়া আসিয়াছিলাম, যাইবার সময় নিজের ভোজনের নিমিত্ত প্রভুকে লঙ্ঘন করিয়া অপরাধী হইতে পারি না। ৫৫০ পৃ

রামপ্রসাদ

যার জন্য মর ভেবে সে কি সেকি তোমার সঙ্গে যাবে
সেই প্রেয়সী দেবে ছড়া অমঙ্গল হবে বলে।

—

ডাকিনী যোগিনী দিয়ে তরকারী বানায়ে খাব
মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে অম্বলে সম্বরা দিব।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পৌত্তলিকতা ও অন্যান্য কুসংস্কার বিষয়ে ব্রাহ্মণদিগের সহিত আমার ক্রমাগত তর্কবিতর্ক হওয়াতে এবং সহমরণ ও অন্যান্য অনিষ্টকর প্রথা নিবারণ বিষয়ে আমি হস্তক্ষেপ করাতে, আমার প্রতি তাঁহাদিগের বিদ্বেষ পুনরুদ্দীপিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। এবং আমাদিগের পরিবারের মধ্যে তাঁহাদিগের ক্ষমতা থাকাতে, আমার পিতা প্রকাশ্যরূপে আমার প্রতি পুনর্ব্বার বিমুখ হইলেন। কিন্তু আমাকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য প্রদত্ত হইত। আমার পিতার মৃত্যুর পর আমি অধিকতর সাহসের সহিত পৌত্তলিকতার পক্ষ সমর্থনকারী-দিগকে আক্রমণ করিলাম। ৪ পৃ

আমার সমস্ত তর্ক বিতর্কে আমি কখন হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম্ম এক্ষণে প্রচলিত, তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল। ৪ পৃ

রামমোহন রায়ের জননী যার পর নাই সদ্‌গুণশীলা রমণী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমতী ও ধর্ম্মপরায়ণা নারী বিরল ছিল। কোন প্রকার মিথ্যা ও কুৎসিত ব্যবহার তাঁহার নিকট প্রশ্রয় পাইত না। দেশ-প্রচলিত ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ স্বভাবতঃ অতিশয় প্রবল ছিল। তাঁহার শেষাবস্থায় তিনি জগন্নাথ দর্শনের জন্য যাত্রা করেন। দেবদর্শনে যাইতে হইলে কষ্ট স্বীকার করিয়া যাইতে হয়, এই বিশ্বাসবশতঃ সাংসারিক অবস্থা ভাল থাকা সত্ত্বেও তিনি সঙ্গে একজন দাসী পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই; এমন কি, পথে তাঁহার সুবিধা ও

সুখের জন্য কোন প্রকার উপায় করিতেও দেন নাই ; দুঃখিনীর ন্যায় পদব্রজে শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করিয়া ছিলেন ; পরলোকগমনের পূর্ব্বে, এক বৎসরকাল, দাসীর ন্যায় জগন্নাথদেবের মন্দির সম্মার্জ্জনীর দ্বারা প্রত্যহ পরিষ্কৃত করিতেন। আবার এরূপও কথিত আছে যে, তিনি মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে, রামমোহন রায়কে বলিয়াছিলেন, রামমোহন তোমার মতই ঠিক। আমি অবলা স্ত্রীলোক, অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছি; সুতরাং যে সকল পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে আমি সুখ পাইয়া থাকি তাহা আর পরিত্যাগ করিতে পারি না। ৭ পৃ

অনেক সরল বিশ্বাসী সাকারবাদী ব্রহ্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া থাকেন। রাজা রামমোহন রায়ের মাতার সেই প্রকার ভাব বলিয়াই মনে হয়। ৮ পৃ

একটি গল্প।

ফুল ঠাকুরানীর শাক্তবংশে জন্ম হইলেও তিনি স্বামীগৃহে আসিয়া বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিতা হন। এস্থলে আমরা পাঠকবর্গকে একটি গল্প বলিব। ফুল ঠাকুরানী একবার কোন উৎসব উপলক্ষ্যে কনিষ্ঠপুত্র রামমোহনকে সঙ্গে লইয়া পিতৃভবনে আসিয়াছিলেন। একদিন শ্যাম ভট্টাচার্য্য (পিতা) ইষ্ট দেবতার পূজার পর শিশু রামমোহনকে পূজোপকরণ বিল্বদল প্রদান করেন। ফুল ঠাকুরানী আসিয়া দেখেন যে, রামমোহন বিল্বপত্র চর্ব্বণ করিতেছেন। দেখিয়া বিষ্ণুমন্ত্রে-দীক্ষিতা ফুল ঠাকুরানীর বড়ই ক্রোধ হইল। তিনি সন্তানের মুখ হইতে বিল্বপত্র ফেলিয়া দিয়া তাহার মুখ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। এবং তজ্জন্য পিতাকে তিরস্কার করিলেন। কন্যাকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হওয়াতে শ্যাম ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি কন্যাকে অভিসম্পাত করিলেন যে, তুই অহঙ্কার করিয়া আমার পূজার বিল্বপত্র ফেলিয়া দিলি ; তুই এই পুত্র লইয়া কখনও সুখী হইতে পারিবি না। এই পুত্র কালে বিধর্ম্মী হইবে। পিতার মুখে অভিসম্পাত শুনিয়া ফুল ঠাকুরানী একান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। শাপান্ত হইবার জন্য পিতার চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শ্যাম ভট্টাচার্য্য বলিলেন, আমার বাক্য অব্যর্থ; তবে তোমার পুত্র রাজপূজ্য ও অসাধারণ লোক হইবে। পাঠকবর্গ এ গল্পটি বিশ্বাস করিতে অবশ্যই বাধ্য নহেন। ৮ পৃ

কথিত আছে ফুল ঠাকুরানী গৃহদেবতা রাধাগোবিন্দ ও অসংখ্য শালগ্রাম সম্মুখে রাখিয়া জমিদারী কার্য্য সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। ১৪ পৃ

'মন্ত্রার্থের স্ফূর্ত্তি হইবার উদ্দেশে এবং ব্রহ্মজ্ঞানের স্থিরতার উদ্দেশে মদ্যপান করিবেক।' এ স্থলে স্মরণ করা উচিত যে রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মোপাসক মাত্রেরই জন্য সুরাপানের কথা বলিতেছেন না। ১১৭ পৃ

রাজা রামমোহন রায় সুরাপানের পক্ষসমর্থন করিতেন, ইহা শুনিয়া অনেকেই আশ্চর্য্য হইবেন। বিবেচনা করিলে ইহাতে বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। মহাপুরুষেরাও ভ্রম প্রমাদ শূন্য নহেন; সুরাপান তিনি দূষণীয় মনে করিতেন না বটে। কিন্তু অতিরিক্ত পানের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ঘৃণা ছিল। যে পরিমাণে সুরা পান করিলে চিত্তের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তাহা যার পর নাই নিন্দনীয় কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। তিনি নিজে এত অল্প পরিমাণে সুরাপান করিতেন যে, তাহাতে তাঁহার চিত্ত চাঞ্চল্য হইত না। কোন প্রাচীন ব্যক্তি বলেন যে, তিনি যতবার একটু করিয়া সুরাপান করিতেন, প্রত্যেকবারে এক একটি কপর্দ্দক সম্মুখে রক্ষা করিতেন। কপর্দ্দক রক্ষা করার তাৎপর্য্য এই যে, একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কপর্দ্দক হইলেই আর তিনি কোনক্রমেই সুরা স্পর্শ করিতেন না। কথিত আছে, এক দিবস তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া আমোদ দেখিবার জন্য কয়েকটি কপর্দ্দক চুরি করিয়াছিলেন, সুতরাং ভ্রমক্রমেই তাঁহার পানের পরিমাণ অধিক হইয়া গিয়াছিল। রামমোহন রায় ইহা অনুভব করিবা মাত্র বুঝিতে পারিলেন যে কেহ তাঁহার কপর্দ্দক চুরি করিয়া থাকিবে। কে চুরি করিয়াছেন জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং 'বরং পণ্ডিত শত্রু ভাল অথচ মূর্খ বন্ধু ভাল নহে' এই মর্ম্মের সংস্কৃত শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। অতিরিক্ত সুরাপানের প্রতি তাঁহার এতদূর বিদ্বেষ ছিল যে, তাঁহার কোন বন্ধু একবার উক্ত দোষে দোষী হইয়াছিলেন বলিয়া ছয় মাস কাল তাঁহার মুখদর্শন করেন নাই। ১৫৫ পৃ

রামমোহন রায় জাহাজে তাঁহার সঙ্গে দুইটি দুগ্ধবতী গাভী লইয়া বিলাত গিয়াছিলেন। ২৩৬ পৃ

প্রাচীনদিগের মুখে শুনিয়াছি যে তিনি একটি সমগ্র ছাগ মাংস একাকী ভোজন করিতে পারিতেন। সমস্ত দিনের মধ্যে দ্বাদশ সের দুগ্ধ পান করিতেন। ২৬৫ পৃ

পরলোকগত ভরত শিরোমণি মহাশয় বাল্যকালে মধ্যে মধ্যে রামমোহন রায়ের নিকট গমন করিতেন। আমাদিগের কোন বন্ধুর নিকট তিনি গল্প করিয়াছিলেন যে একদিন অপরাহ্নে তথায় উপস্থিত হইলে, রামমোহন রায় তাঁহাকে বলিলেন, দেবতা অদ্য গোটা পঞ্চাশ আম্র জলযোগ করা গেল। ২৬৫ পৃ

একদিন এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, মহাশয় আপনি সাকার উপাসনার বিরুদ্ধে পুস্তক প্রচার করিতেছেন, প্রতিমা পূজার অসারত্ব দেশের লোককে বুঝাইয়া দিতেছেন বলিয়া গোঁড়া পৌত্তলিকেরা আপনার প্রতি এতদূর ক্রুদ্ধ হইয়াছে যে, একদিন আপনাকে পথে ধরিয়া প্রহার করিবে। রামমোহন রায় একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, আমাকে মারিবে! কলিকাতার লোকে আমাকে মারিবে! তাহারা কি খায়! ২৬৭ পৃ

…একদিবস প্রাতঃকালে রামমোহন রায় তাঁহার মানিকতলার ভবনে মুখ প্রক্ষালন করিতেছেন, এমন সময় কয়েকজন অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য তাঁহার সহিত শাস্ত্রীয় বিচার করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। রামমোহন তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনাপূর্ব্বক বসাইয়া মুখ ধৌত করিতে লাগিলেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়-দিগের মধ্যে একজন দেখিলেন যে, রামমোহন রায় পূর্ব্ব দিবসের ব্যবহৃত দন্তকাষ্ঠে দন্তমার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই অনাচার দেখিয়া বিরক্ত হইয়া তিনি রামমোহন রায়কে আক্রমণ করিলেন। বলিলেন, মহাশয় এ আপনার কেমন ব্যবহার! রামমোহন রায় সে কথার বিশেষ কোন উত্তর করিলেন না। মুখ প্রক্ষালন করিয়া তিনি অধ্যাপক মহাশয়দিগের সহিত ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। বিচার করিতে করিতে উপস্থিত ভদ্রলোকদিগকে তামাক দিবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ করিলেন। ভৃত্য তামাক দিলে পরে, রামমোহন রায় ভৃত্যকে বলিলেন, একটা ভাল করিয়া নল প্রস্তুত করিয়া দাও। যে ভট্টাচার্য্যটি পূর্ব্ব দিনের

উচ্ছিষ্ট দণ্ডকাষ্ঠে দন্তমার্জ্জন জন্য রামমোহন রায়কে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি উক্ত নলসংযোগে ধূমপান করিতে লাগিলেন। ঘোরতর তর্কযুদ্ধ চলিতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর রামমোহন রায় তামাক দিবার জন্য পুনর্ব্বার ভৃত্যকে আজ্ঞা করিলেন। সেই ভট্টাচার্য্যটি পুনর্ব্বার নল সহযোগে তাম্রকূট সেবন আরম্ভ করিলেন। তখন রামমোহন রায় উপযুক্ত সময় বুঝিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন ; দেবতা, এ আপনার কেমন ব্যবহার ? আপনি আমাকে যে উপদেশ দিলেন, নিজে কেন তাহার বিপরীত ব্যবহার করেন ! যে দন্তকাষ্ঠ একবার উচ্ছিষ্ট হইয়াছে তাহা ব্যবহার করা যদি অনাচার ও অধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে যে নল একবার উচ্ছিষ্ট করিয়াছেন, কি বলিয়া তাহা পুনর্ব্বার ব্যবহার করিতেছেন ? ২৬৭ পৃ

রামমোহন রায়ের বাটির প্রাঙ্গণে উদ্যান ছিল, এক ব্রাহ্মণ প্রত্যহ পূজার জন্য পুষ্পচয়ন করিয়া লইয়া যাইতেন। এক দিবস ব্রাহ্মণ আসিয়া একটা বৃক্ষ শাখায় উত্তরীয় রক্ষা করিয়া পুষ্পচয়ন করিতেছেন। এমন সময়ে বাটির কোন ব্যক্তি আমোদ করিবার জন্য সেখানি তথা হইতে অন্তরিত করিল। ব্রাহ্মণ কার্য্য শেষ করিয়া আসিয়া দেখেন, যে যথাস্থানে উত্তরীয় নাই। অনেক অন্বেষণেও উহা প্রাপ্ত হইলেন না ! তখন তিনি অতিশয় বিরক্ত হইয়া চীৎকার পূর্ব্বক দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায় তখন বাহিরে আসিয়া ব্রাহ্মণের নিকট শুনিয়া সকল বুঝিতে পারিলেন ; বলিলেন, দেবতা (তিনি ব্রাহ্মণদিগকে দেবতা বলিয়াই সম্বোধন করিতেন) আপনি স্থির হউন, আপনার উত্তরীয় গিয়াছে, একখানা উত্তরীয় অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন। এই বলিয়া ব্রাহ্মণের সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে রাজার ইঙ্গিতে উত্তরীয় আসিয়া উপস্থিত হইল। উত্তরীয়খানি ব্রাহ্মণকে দিয়া বলিলেন, এই গ্রহণ করুন, কেমন সন্তুষ্ট হইলেন তো ? ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমার দ্রব্য আমি পাইলাম, তাহাতে আর সন্তুষ্ট কি ? রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, এ পুষ্পগুলি কাহার ? কেন ? দেবতার পুষ্প ? 'দিবেন কাহাকে ? দেবতাকে দিব। তখন রাজা বলিলেন, তবে দেবতা সন্তুষ্ট হইবেন কেন ? ২৬৯ পৃ

রামমোহন রায়—তিনি শিষ্যদিগের প্রতি অত্যন্ত স্নেহের সহিত

ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদিগকে 'বেরাদার'* বলিয়া সম্বোধন করিতেন।' কেবল শিশুদিগকে কেন। প্রায় সকল লোককেই তিনি এরূপ স্নেহ সম্ভাষণ করিতেন। অনেক সময় কোন আহ্লাদের কারণ উপস্থিত হইলে, প্রেমালিঙ্গন করিতেন। কোন শিশু তাঁহার কোন দুর্ব্বলতা দেখিয়া বিদ্রূপ বা তিরস্কার করিলে, তিনি যার পর নাই উদারভাবে তাহা গ্রহণ করিতেন। তৎকালীন প্রথা অনুসারে তাঁহার বাবরী চুল ছিল; চুলগুলির প্রতি অতিশয় যত্ন করিতেন; প্রতিদিন স্নানের পর দর্পণের সম্মুখে কেশবিন্যাসে অনেক সময় নষ্ট হইত। তজ্জন্য এক দিবস তারাপদ চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে উপহাস করিয়া বলিলেন, মহাশয়?

কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে

এই গীতটি কি কেবল পরের জন্যই রচনা করিয়াছিলেন?

রামমোহন রায় লজ্জিত হইয়া বলিলেন, ঠিক বলিয়াছ! ঠিক বলিয়াছ। ২৭২ পৃ

(রামকেলী আড়াঠেকা—কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে
এ সুখের পরিণাম বারেক না ভাব মনে।)

এক দিবস রামমোহন রায় বালকদিগের সহিত দোলায় দোল খাইতেছেন, এমন সময় কলিকাতার একজন বড় পণ্ডিত তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। আসিয়া দেখেন, এত বড় লোক হইয়াও রামমোহন রায় বালকদিগের সহিত দোলনায় দুলিতেছেন। অভ্যাগত পণ্ডিত, রামমোহন রায়কে বলিলেন, একি মহাশয়! একি মহাশয়! রামমোহন রায়ের অসামান্য প্রত্যুৎপন্নমতি ছিল; বলিলেন, মহাশয় ইহাতে আমার ভবিষ্যতে উপকার হইবে। পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাতে ভবিষ্যতে আপনার কি উপকার হইবে? রামমোহন রায় উত্তর করিলেন, আমার বিলাত যাইবার ইচ্ছা আছে; সমুদ্রে বাতাস হইলে জাহাজ অত্যন্ত আন্দোলিত হয়; সেই আন্দোলনে আরোহীদিগের সমুদ্রপীড়া (Sea sickness) বলিয়া এক প্রকার পীড়া উপস্থিত হয়। এইরূপ দোলনায় দোলায়মান হওয়া অভ্যাস থাকিলে উক্ত সমুদ্রপীড়া হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। ২৭২ পৃ

*বেরাদার : brother

রামসুন্দর নামে তাঁহার এক পাচক ব্রাহ্মণ ছিল। সে একদিবস মাংস রন্ধন করিবে বলিয়া বঁটি দিয়াএকটি ছাগল কাটিতেছিল, রামমোহন রায় ছাগের চীৎকার শুনিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলেন এবং নির্দ্দয় কার্য্যের বিষয় অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধের সহিত যষ্টি হস্তে রন্ধনশালার দিকে চলিলেন। রামসুন্দর দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। রামমোহন রায় তাহার পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড করিলেন। এবং বলিলেন যে, আমি মাংস ভোজন করি বলিয়া এ প্রকার জীব হিংসা করা অতি মূঢ় কর্ম্ম! ২৭৪ পৃ

তিনি (রামমোহন) পরে ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ মানিতেন। ২৯৩ পৃ

একদা এক ব্রাহ্মণ কোন বিষম রোগাক্রান্ত হইয়া কোন এক দেবীর নিকট ধরণা দেন। তাঁহাকে স্বপ্নে এই আদেশ হয় যে, যদি সে তাহার স্বগ্রামবাসী জনৈক নির্দ্দিষ্ট বৃদ্ধ তেলীর উচ্ছিষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিতে পারে, তবে এ বিষম রোগের হাত হইতে রক্ষা পাইবে। ব্রাহ্মণ মহাবিপদে পড়িলেন। কিরূপে যজ্ঞোপবীতধারী হইয়া নীচ জাতির অন্ন ভক্ষণ করেন! আর হিন্দু সমাজেই বা তাঁহার কি দশা করে? ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনেক বড় বড় মহানগরের অধ্যাপকের ব্যবস্থা চাহিলেন, কেহই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির কোন উপায় নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণ ইতি কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া রামমোহনের নিকট গমন করেন, ও আপন বৃত্তান্ত সবিশেষে বিবৃত করেন। রামমোহন সমস্ত অবগত হইয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ঐ বৃদ্ধ তেলী কি আপনার বিশেষ অনুগত? ব্রাহ্মণ তদুত্তরে বলেন যে, সে পুরুষানুক্রমে তাঁহাদের প্রজা ও অতীব অনুগত। রামমোহন পুনরায় প্রশ্ন করেন যে, ব্রাহ্মণ সঙ্গতিপন্ন লোক কিনা? ব্রাহ্মণ তাহাও স্বীকার করেন। তখন রামমোহন বলিলেন, বৃদ্ধ তেলীর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণের এখানে উপায় নাই। অবিলম্বে জগন্নাথ ক্ষেত্রে যাইয়া তিনি আপন অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারেন। রামমোহন এরূপ ভাবুক ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বপূর্ণ ছিলেন যে সকল কার্য্যই তিনি আপন নখাগ্রে দেখিতেন। ৩০১ পৃ

টাকীর প্রসিদ্ধ কালীনাথ মুন্সী রামমোহনকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। ও তাঁহাকে অনেক বিষয় পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। একদা কোন ব্যক্তি

কালীনাথবাবুর নিকট একটি শঙ্খ বিক্রয়ার্থে আসে। ঐ শঙ্খের ভয়ানক গুণ। উহা যাহার নিকট থাকে, তাহার আর কিছুর অভাব থাকে না, কমলা অচলা হইয়া সেই গৃহে অবস্থান করেন। শঙ্খের এবম্বিধ আশ্চর্য্যগুণ শুনিয়া মুন্সী মহাশয় উহা গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হন। ঐ শঙ্খের পাঁচশত টাকা মূল্য ধার্য্য হইল। কালীনাথ, শঙ্খ বিক্রেতাকে রামমোহনের নিকট লইয়া গেলেন এবং পরম আহ্লাদ সহকারে শঙ্খের অদ্ভুত গুণ ও মূল্যের বিষয় সকল কথা শুনাইলেন এবং এ বিষয়ে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। রামমোহন অনুপূর্ব্বক সমস্ত অবগত হইয়া উত্তর করিলেন যে সমস্ত জগৎ যাহার জন্য হাহাকার করিতেছে, যিনি আবালবৃদ্ধবনিতার অভীষ্ট দেবী, সেই কমলাকে যদি পাঁচ শত টাকার বিনিময়ে দৃঢ় বন্ধনে গৃহে রাখা যায়, তবে ইহা অপেক্ষা আর কি আছে? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কেবল মাত্র পাঁচশত টাকা পাইয়াই কেন শঙ্খ বিক্রেতা আপন চিরলক্ষ্মী দিতেছে? তবে কি পাঁচশত টাকাই অচলা কমলা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল? তখন স্বয়ং মুন্সী ও তাঁহার পারিষদবর্গের নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং আর বাক্যব্যয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ অচলা কমলা বিক্রেতাকে বিদায় দিলেন। ৩৭২ পৃ

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। | (মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত)

আমাদের বাটিতে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে আমি (মহর্ষি) একবার রাজাকে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিলাম। আমি আমার পিতামহর প্রতিনিধি স্বরূপ গিয়াছিলাম। চলিত প্রণালী অনুসারে আমি রাজাকে বলিলাম, রামমণি ঠাকুরের বাড়ীতে আপনার দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণ। রাজা ব্যগ্রভাবে উত্তর করিলেন, আমাকে পূজায় নিমন্ত্রণ? এই স্বর আমি যেন এখনও শুনিতেছি। তিনি আমার উপর বিরক্ত হন নাই। আমার প্রতি তিনি সর্ব্বদাই প্রসন্ন থাকিতেন। রাজা আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন যে তিনি পৌত্তলিকতা বিরুদ্ধে এত প্রতিবাদ করিতেছেন অথচ লোকে তাঁহাকে দুর্গোৎসবে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকে। যাহা হউক রাজা বুঝিলেন যে, ইহা সামাজিক ব্যাপার মাত্র। তিনি আমাকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদের নিকট যাইতে বলিলেন। প্রচলিত পৌত্তলিকতায় রাধাপ্রসাদের কোন আপত্তি ছিল না। সুতরাং তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। ৩৮৮ পৃ

রাজার একখানি অতি সামান্য ভাঙ্গা গাড়ী ছিল। ঘোড়ার উপযুক্তরূপ

সাজ ছিল না, এবং উপযুক্ত লাগামের পরিবর্ত্তে অনেক সময় দড়ি ব্যবহার করা হইত। কখন কখন এমন ঘটিত যে, রাজা গাড়ী করিয়া বাহির হইয়াছেন, পথে গাড়ী ছাড়িয়া ঘোড়া তফাতে চলিয়া গিয়াছে। গাড়ীর কম্পাস খুলিয়া গিয়াছে। কখনও কখনও গাড়ী ভাঙ্গিয়া যাইত। পথে অনেক লোক জমা হইত এবং রাজা গাড়ী ছাড়িয়া পায় হাঁটিয়া চলিয়া যাইতেন। একবার পথে রাজার গাড়ী ভাঙ্গিয়া গেলে, রাজা হাঁটিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন যে, আমার ঘোড়া ও গাড়ীর জন্য আমাকে সং হইতে ··· হইয়াছে।

আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, আমি তাঁহাকে দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ করিতে গেলে কি হইয়াছিল। তিনি কেমন বলিলেন, আমাকে পূজায় নিমন্ত্রণ? তিনি যখন এই কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, ভাবেতে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়াছিল। আমার জীবনে চিরকাল উহার আশ্চর্য্য প্রভাব রহিয়াছে। তাঁহার কথাগুলি আমার পক্ষে গুরুমন্ত্র স্বরূপ হইয়াছিল। তাহা হইতেই আমি ক্রমে পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিলাম। ৩৮৯ পৃ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস সমসাময়িক দৃষ্টিতে | ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। ধর্ম্মতত্ত্ব ১।১০।১৮৭৯

৬॥ তুমি এবার দুর্গোৎসব কর নাই কেন? আমার দাঁত নাই (১।১০।১৮৬৮)।...দাঁত...পড়ে গেছে আর দুর্গাপূজায় সুখ নাই। অর্থাৎ দাঁত পড়াতে পাঁঠার মাংস খাওয়া যায় না, দুর্গোৎসব করিয়া কি করিব?

ধর্ম্মতত্ত্ব (১।১১।১৮৭৯)। কমল কুটির। কোন এক স্ত্রী তাহার স্বামীকে বলিল, আমি আমার দাদাকে দেখিতে যাইব। দাদা শীঘ্রই সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যাইবেন। স্বামী বলিল, তুমি কেমন করিয়া জানিলে যে সে সন্ন্যাসী হইবে। স্ত্রী বলিল, দাদার ষোলটি স্ত্রী, তিনি একে একে অনেকগুলি ছাড়িয়াছেন এবং শীঘ্রই অন্য কয়েক জনকে ছাড়িয়া তিনি বৈরাগী হইয়া বাহির হইয়া যাইবেন। স্বামী বলিল, তোমার দাদা কখনই সন্ন্যাসী হইতে পারিবে না, যে একে একে ছাড়ে সে সন্ন্যাসী হইতে পারে না। স্ত্রী বলিল, তোমা অপেক্ষা আমার দাদা ভাল, তুমি কিছুই ছাড়িতে পার নাই আর দাদা কত স্ত্রীকে ছাড়িল। স্বামী বলিল, তুমি আমার মা, আর এই দেখ আমি কৌপীন পরিয়া চলিলাম, এই বলিয়া স্বামী সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

ধর্ম্ম প্রচারক ৬।৮.১৮৮৪

...মধ্যে মধ্যে তিনি স্বেচ্ছাক্রমে বৰ্দ্ধমানের রাজবাটিতে আসিতেন রাজপুরবাসিগণ তাঁহাকে একজন ভক্ত গায়ক বলিয়া জানিত।...রাজবাটিতে সময় সময় অনেক পণ্ডিতের সমাগম হইত। ঘটনাক্রমে একজন পশ্চিমোত্তর দেশবাসী বহুল শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত তথায় আসিয়াছিলেন। পণ্ডিতজী একদিন বাসায় নিদ্রিত আছেন, রামকৃষ্ণ সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া আপনার ভাবে আপনার হাতে করতালি দিয়া আনন্দময়ীর গুণকীৰ্ত্তন করিতে লাগিলেন। তিনি (পণ্ডিত) বিরক্ত হইয়া রামকৃষ্ণকে তিরস্কারপূর্ব্বক বলিলেন, তুম ক্যা পটপট আওয়াজ করতে হো! য়হ ক্যা ভক্তিকা লক্ষণ হ্যায়? য়হ তো রোটি বানানে কী খেল হ্যায়।

ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬।৯।১৮৮৬

পরমহংস জিলিপি খাইতে ভালবাসিতেন। একদিন মিষ্টান্নাদি খাওয়া হইলে, কেহ কেহ আরও খাওয়ার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, আমার গলা পর্য্যন্ত পূর্ণ আর একটি সর্ষপ পরিমাণ দ্রব্যও ভিতরে প্রবেশ করিবার পথ নাই, তবে জিলিপির পথ হবে, জিলিপি হলে একখানা খাইতে পারি। কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, যখন একেবারে পথ নাই তখন জিলিপির পথ কেমন করে হবে। তিনি বলিলেন, যেমন কোন মেলা উপলক্ষে রাস্তায় গাড়ীর অত্যন্ত ভীড় হয়, পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, একটি মানুষও কষ্টে স্বষ্টে চলিতে পারে না তবে সে অবস্থায় যদি লাট সাহেবের গাড়ী আসে, অন্য অন্য গাড়ী সরিয়া স্থান করিয়া দেয়, সেইরূপ জিলিপি খাইবার পথ হবে, অন্য অন্য খাদ্যদ্রব্য জিলিপিকে সম্মান করিয়া পথ ছাড়িয়া দিবে।

প্রবাসী। ফাল্গুন ১৩৪২। কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

একদিন বহুব্রাহ্ম সাধকদিগের নিকট বলিলেন, যে সত্য কথা বলে না তার ধর্ম্ম হয় না, ফাঁকি দিয়ে ভগবানকে পাওয়া যায় না...এই কথার পর প্রচারক ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মহাশয় তাঁহাকে (ঠাকুরকে) মিষ্টান্ন ভোজন করাইলেন...(ঠাকুর ...)...পেটে জায়গা নেই, কিন্তু জিলাপি দেখিয়া তিনি বলিলেন একখানা দাও। ত্রৈলোক্যবাবু...বলিলেন যে, আপনার সত্য কথা

রক্ষা পাইল না। পরমহংস বলিলেন, যখন কোন মেলায়…গাড়ীতে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু লাট সাহেবের গাড়ী এলেই …জায়গা হয়, এখন পেটে জিলাপির জায়গা হবে—এতে সত্য রক্ষার ব্যঘাত হবে না।

শ্রীঅরবিন্দ, দীনেন্দ্র রায়ের নিকট বাঙলা শিক্ষা করিতেন, পাঠ সূত্রে মামার পীরিতে মামী হঁাকোচ নাকোচ পদটির হাঁকোচ নাকোচ কথাটি কিছুতেই বুঝিতে পারে নাই। (sis).

শ্রীশ্রীসদগুরু সঙ্গ। কুলদাবঞ্জন ব্রহ্মচারী ২য় খণ্ড

আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তঁাহার শিষ্যর বাড়ীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কথা বলিলেন, রাত্রিতে বৃন্দবানবাবু আসিয়া ঠাকুরের ঐ কথা শুনিতে পাইয়া ঠাকুরকে বলিলেন মশায়! বাড়ী পরিষ্কার, হোক আর যাই হোক এখন ভূতের জ্বালাতনে যে সে বাড়ীতে টেকা শক্ত হয়ে পড়লো। আপনার সাধন নিয়ে আর কিছু হোক আর না হোক, ভূতে কিন্তু বেশ বিশ্বাস হল। ১৭০ পৃ

কম্বল মোড়া লেংটি পরা শ্রীধরকে একভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া ভদ্রলোকটির মনে একটা আশা হইল, তিনি কিছুক্ষণ শ্রীধরের কাছে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া বলিলেন, বাবাজী! কিছুকাল হয় আমার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে, আমার বড়ই ক্লেশ, একটু আরাম কিসে হয় বলিতে পারেন? শ্রীধর শুনিয়া ধীরভাবে বলিলেন, হাঁ আরাম কিসে হবে বলতে পারি! ঐ ঘরে যান। গোঁসাইয়ের কাছে গিয়ে বসুন তঁাকে কষ্টের কথা বলুন, আরাম পাবেন। ভদ্রলোকটি বলিলেন, ম'শায় এতক্ষণ তো গোঁসাইয়ের কাছেই ছিলাম, তিনি যা বললেন তাও শুনলাম, ও সব ঢের শুনা আছে, আপনি দয়া করে কিছু বলুন। 'ওসব ঢের শুনা আছে' ঠাকুরের কথায় এরূপ অবজ্ঞা-সূচক ভাব দেখিয়া, শ্রীধরের মাথা একেবারে গরম হইয়া উঠিল; বলিলেন, বিয়ে কর্বেন। ৯০ পৃ

বুড়োঠাকরুণ (দিদিমা) শ্রীধরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, শ্রীধর, এখন ধ্যান..ধারণায় চলবে না। আসন থেকে ওঠ, ভাণ্ডার একবারে, শূন্য

একবার বাজার যাও, বাজার হতে এলে রান্না চড়বে। ...শ্রীধর চীৎকার করিয়া বলিলেন, বাজার অমনি হয় টাকা ফেলুন···। বড়ো ঠাকরুণ টাকা দিতেই, শ্রীধর··· বাজারে যাইতে দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। বড়ো ঠাকরুণ শ্রীধরকে ডাকিয়া বলিলেন, কি কি জিনিষ আনবে শুনলে না? শ্রীধর বলিলেন, আমি ভাত খাই না ···ডাল আনবো চাউল আনবো আবার কি!··· আপনি যান উনুন ধরান, আমি তো যাব আর আসব।···ক্রমে বেলা হইতে লাগিল শ্রীধর আসিতেছেন না দেখিয়া বড়ো ঠাকরুণ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বেলা দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া শ্রীধরের কোন খোঁজ খবর না পাইয়া এ বাড়ী ও বাড়ী হইতে চাউল ডাইল ধার করিয়া রান্না চাপাইলেন। রান্না হইয়া গেল শ্রীধর আসিলেন না। সকলে ডাল ভাত মাত্র আহার করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। বেলা সাড়ে বারোটা। ঠাকুরের (আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ) ধুনী আমতলায় জ্বলিল, ঠাকুর আহারান্তে আমতলায় যাইয়া বসিলেন। মহাভারত পাঠ হইতে লাগিল, বেলা প্রায় দুইটা। শ্রীধর একটা বড় পুঁটলি ঘাড়ে লইয়া দ্রুতপদে আসিয়া উপস্থিত···ধুনী সম্মুখে···বসিয়া পড়িলেন। ৯২ পৃ

•

পাঁচ ছয় মিনিট অন্তর অন্তর এক একবার শ্রীধর পুঁটলি হইতে ধূপধুনা চন্দন গুগ্‌গুলাদি মুঠা মুঠা তুলিয়া 'অগ্নয়ে স্বাহা অগ্নয়ে স্বাহা' বলিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দিতে লাগিলেন। ঠাকুর উহা দেখিয়া কোন কথাই না বলিয়া খুব আনন্দের সহিত মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। বড়ো-ঠাকরুণ...আম তলায় আসিয়া উপস্থিত, শ্রীধরকে বলিলেন, শ্রীধর তুমি বাজারে যাও নাই! শ্রীধর সে কথার কোন জবাব না দিয়া খুব মনোযোগের সহিত পুঁটলি হইতে ধুনা চন্দনাদি মুঠা মুঠা তুলিয়া, 'অগ্নয়ে স্বাহা' বলিয়া আগুনে আহুতি দিতে লাগিলেন। বড়োঠাকরুণ বলিলেন, পাগল! একি কাণ্ড! এতে কি দিন যাবে! শ্রীধর খুব তেজের সহিত বলিলেন, আমায় কি বলছেন আপনি? জঠরানল তো অনল! আগুনে আহুতি দিলে কখনো আর ক্ষুধা থাকে? শাস্ত্র জানেন? ৯৩ পৃ

ঠাকুর (আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ) একটু হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, ...সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের একটি ভদ্রলোকের বাড়ীতে বহুকাল থেকে একটি কালীমূর্ত্তি

প্রতিষ্ঠিত আছেন, ঐ ভদ্রলোকের মা ঠাকুরুণ খুব শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত প্রত্যহ তাঁর সেবা কার্য্য করিতেন, ব্রাহ্ম ভদ্রলোকটি (ছোট ছেলে ?) বাড়ী গেলেই কালী প্রতিমা ফেলে দিতে চাইতেন, আর মন্দিরের বারান্দায় নানা প্রকার অনাচার করতেন। কালী একদিন বৃদ্ধাকে স্বপ্নে বললেন, ও গো সাবধানে থাকিস ! তোর ছোট ছেলে যে বড় বিষম অত্যাচার আরম্ভ করছে, নিষেধ করে দিস্ আবার ঐরূপ করলে আমি তোর বড় ছেলের ঘাড় মটকাবো। বৃদ্ধা বললেন, কেন মা ! বড় ছেলের ঘাড় মটকাবে কেন ? বড় ছেলে তো কোন অপরাধ করে নাই, ঘাড় মটকাইতে হয় তো ছোট ছেলের ঘাড় মটকাও না কেন। কালী বললেন, ওগো ! সে যে আমাকে একেবারেই মানে না ! কিছুই গ্রাহ্যি করে না। তাকে আমি পারবো না···। ৮৫ পৃ

(সতীশ) একদিন সকালে সন্ন্যাসী আমাকে বলিলেন, চলো ইহা আউর নেহি রহেঙ্গে। নিজের আসন গুটাইয়া অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে প্রকাণ্ড একটি বোঝা সাজাইয়া আমার ঘাড়ে তুলিয়া দিয়া চলিলেন। আমিও চলিলাম। আমরা একটি প্রকাণ্ড ময়দানের নিকট উপস্থিত হইলাম। ময়দানটি এত বড় যে তার অপর পার ধু ধু দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ন্যাসী বলিলেন, ময়দানটি পার হইয়া যাইব। বেলা তখন দশটা...সন্ন্যাসী দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন, বিষম ভারী বোঝা ঘাড়ে লইয়া ভয়ঙ্কর রৌদ্রে আমিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইতে লাগিলাম...সন্ন্যাসীকে একটু ধীরে ধীরে চলিতে বলায় তিনি বিরক্ত হইয়া কর্কশ স্বরে বলিলেন—আরে চল্। এ আবার কেমন সাধু, ক্লেশে আমার প্রাণ যায় একটু দয়া হইতেছে না। আবার ভাবিলাম ইনি তো সিদ্ধ পুরুষ, বোধ হয় আমায় পরীক্ষা করিতেছেন...কিছুক্ষণ আবার চলিলাম···ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, মহারাজ যব হাম নেহি থে, তব কোন এতনা বোঝা লে যাতা রহে ! সাধু বলিলেন, আরে হামারা ভূত সিদ্ধ হায়, হামারা সব চিজ ওহিলে যাতে। সাধুর কথা শুনিয়া আমার মাথা গরম হইল,...মাথার বোঝাটি দুড়ুম করিয়া ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া বলিলাম, শালা ভূতের বোঝা আমার ঘাড়ে। ৭ পৃ

(আচার্য্য) সতীশ তুমি গৈরিক নিয়েছ কেন! বীর্য্যধারণ না হলে গৈরিক

নিতে নাই, শাস্ত্রে নিষেধ আছে, গৈরিক ছাড়...তুমি গৈরিক নিয়ে আমার কাছে তো থাকতে পাবে না, অন্যত্র গিয়ে থাকে। সতীশ—আজ তো আমি আপনার অতিথি! ঠাকুর—অতিথি রূপে এসেছ? তাহলে তোমাকে আর কিছুই বলবার নেই—আজ তবে এখানেই থাক! এই বলিয়া ঠাকুর সতীশের আদর যত্ন করিতে আমাদিগকে আদেশ করিলেন। দিনরাত সতীশ আমাদের উপর হুকুম চালাইয়া ও খুব স্ফূর্তি করিয়া কাটাইলেন। পরদিন সকালে ঠাকুর সতীশকে ডাকিয়া কহিলেন—সতীশ এক তিথির অধিক সময় অতিথির তো থাকবার নিয়ম নাই, এখন তুমি অন্যত্রে যাও। পাগলা সতীশ খুব চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—তা কেন? শাস্ত্রে আছে এক রাত্র বাস করলেই সে বান্ধব হয় সুতরাং আপনি এখন তো আমার বান্ধব হইয়াছেন। বান্ধবশূন্য হইয়া কারো কোথাও থাকা উচিত নয়, এখন আর অন্যত্র যাইব না। ১৪ পৃ

হিন্দু ধর্ম্ম। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ।

মারাঠি মহাত্মা নামদেবের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করিতেছি, নামদেব বিঠ্ঠল দেবের অনুরক্ত উপাসক...বিঠ্ঠল দেব তাঁহার ভক্তের সহিত কথা বলিতেন। ইহা হইতে নামদেবের ধারণা জন্মিল যে, তাঁহার ঈশ্বর দর্শন হইয়াছে এবং আধ্যাত্ম জীবনে আর কোন কাম্য নাই। যখন তিনি উক্ত ভ্রান্তির বশীভূত ছিলেন তখন তিনি কোন মস্ত সভায় যোগদান করিতে যান। তথায়···সিদ্ধ সাধু গোরা কুম্বর সমবেত সাধুমণ্ডলীর মধ্যে কে কে পাকা সাধু এবং কে কে কাঁচ্চা (কাঁচা) সাধু তাহা পরীক্ষা করিতে আসেন; পাকা পোড়ান হাঁড়িতে হাতুড়ির ঘা মারিলে শ্রুতি মধুর শব্দ উঠে, কিন্তু কাঁচা মাটির পাত্রে আঘাত করিলে সেই ধ্বনি পাওয়া যায় না। গোরা কুম্বর তাহার ছোট হাতুড়ি হাতে লইয়া প্রত্যেক সাধুর মাথায় মৃদু আঘাত করিয়া বলিলেন, পাক্কাপাক্কা। যখন তিনি নামদেবের কাছে গেলেন তখন নামদেব হাতুড়ির আঘাতের ভয়ে সভা হইতে উঠিয়া গেলেন। ইহাতে গোরা কুম্বর বলিলেন, নামদেব কাঁচা সাধু। ৫৮ পৃ

একবার রঘুনাথ অজীর্ণতা রোগে ভুগিয়াছিলেন। বল্লভাচার্য্যর পুত্র বিঠলনাথ তাঁহার চিকিৎসার্থে দুইজন চিকিৎসককে আনয়ন করেন। সুনিপুণ

চিকিৎসকদ্বয় ভক্ত রোগীর নাড়ী টিপিয়া বলিলেন, এই অজীর্ণতা পায়সাদি খাওয়ার ফলে হইয়াছে। রঘুনাথ ভাত খাইতেন না—ইহা কাহারও অবিদিত ছিল না। সেই জন্ত চিকিৎসকদ্বয়ের অভিমত শ্রবণে বিস্মিত হইয়া বিঠলনাথ বলিলেন, ইহা কিরূপে সত্য হইতে পারে। কিন্তু রঘুনাথ স্মিতমুখে তাঁহাদের মন্তব্যের সত্যতা স্বীকার পূর্ব্বক বলিয়া দিলেন, ··· এ কথা সত্য যে আমি মনে মনে প্রচুর প্রসাদী পরমান্ন আহার করেছি! ১১১ পৃ

পুনঃ পুনঃ পুত্রের গৃহত্যাগে বিরক্ত ও বিচলিত হইয়া রঘুনাথের গর্ভধারিণী স্বীয় স্বামীকে পরামর্শ দিলেন, আমার ছেলে পাগল হয়ে গেছে। অতএব শক্ত করে রজ্জু দিয়ে বেঁধে রাখ। রাজপুত্রতুল্য স্বীয়তনয়ের পারমার্থিক অতৃপ্তির কথা পিতা জানিতেন। তাই তিনি বিদ্রূপভরে পত্নীকে বলিলেন, অতুল ঐশ্বর্য্য ও রূপসী ভার্য্যা যার চিত্তকে আকৃষ্ট করতে পারে না, সামান্ত রজ্জু তাকে কিরূপে বেঁধে রাখবে। ১০১ পৃ

শ্রীমা সারদাদেবী। স্বামী গম্ভীরানন্দ।

শ্রীমা বলিয়াছিলেন, কামারপুকুরে লক্ষ্মী আর আমি 'বর্ণ পরিচয়' একটু একটু পড়তুম। ভাগনে (হৃদয়) বই কেড়ে নিলে; বললে, মেয়ে মানুষের লেখা পড়া শিখতে নেই, শেষে কি নাটক-নভেল পড়বে? ৩৮ পৃ

শ্রীমা কামারপুকুরের সংসারে যাবতীয় কাজ নিজে হাতে করতেন। একদিন সকালবেলা মা বাড়ীর ভিতর ন্যাতা দিচ্ছেন (গোবর মাটি দিয়ে লেপছেন) ঠাকুর বাইরে দাঁতন করছেন, আর নানারূপ রঙ্গরসের কথা বলে সকলকে হাসাচ্ছেন। মা ঠাকরুণকে লক্ষ্য করে বললেন, ছেলের অন্নপ্রাশনে যে কোমরে গোট পরে নাচবে গাইবে, সেই ছেলে মরে গেলে, সেই কোমর ভুঁইয়ে আছড়ে কাঁদতে হবে। লজ্জাশীলা মা নীরবে সব শুনছিলেন, ঠাকুর বারম্বার ছেলের মৃত্যুর কথা বলতে থাকলে, তিনি অবশেষে আস্তে আস্তে বললেন, সবগুলোই কি আর মরে যাবে। মার কথা বের হতে না হতেই ঠাকুর চেঁচিয়ে বললেন, ওরে জাত সাপের ন্যাজে পা পড়েছে রে—জাত সাপের ন্যাজে পা পড়েছে—আমি বলি সাদাসিদে ভালমানুষ, কিছু জানেনা—পেটের ভিতর সব আছে! বলে কিনা সবগুলোই কি আর মরে যাবে? মা ছুটে পালিয়ে গেলেন। ৪১ পৃ

শ্রীমা বলিয়াছেন, কামারপুকুরে লক্ষ্মীর মা আর আমি রাঁধতুম। একদিন খেতে বসেছেন—ঠাকুর আর হৃদয়। লক্ষ্মীর মা ভাল রাঁধতে পারত। সে যেটা রেঁধেছে খেয়ে বললেন, ও হৃদু এ যে রেঁধেছে এ রামদাস বদ্যি, আমি যেটা রেঁধেছি, খেয়ে বললেন, আর এই ছিনাথ সেন। শ্রীনাথ সেন হাতুড়ে। লক্ষ্মীর মা হল রামদাস বদ্যি আর আমি হলুম ছিনাথ।সেন হাতুড়ে। শুনে হৃদয় বলছে, তা বটে! তবে তোমার এ হাতুড়ে বদ্যি তুমি সব সময় পাবে—গা টিপতে পা টিপতে পর্যন্ত! ডাকলেই হয়। রামদাস বদ্যি—তার অনেক টাকা ভিজিট, তাকে তো আর সব সময় পাবে না। আর লোকে আগে হাতুড়েকে ডাকে, সে তোমার সব সময় বান্ধব! ঠাকুর বললেন, তা বটে, তা বটে, এ সব সময় আছে! ৪৩ পৃ

একবার শ্রীরামকৃষ্ণ ও জনৈক ভক্তের মধ্যে কাহার বর্ণ উজ্জ্বলতর, এই বিষয়ে বিতর্ক উঠিলে, শ্রীমাকেই মধ্যস্থ সাব্যস্ত করা হইল; ঠাকুর শ্রীমাকে বলিয়া রাখিলেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বী দুইজন ঠাকুরের ঘরহইতে পঞ্চবটির দিকে হাঁটিয়া যাইবার সময় তাঁহাদের বর্ণ দেখিয়া তাঁহাকে৹সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। (আমাদের মনে হয়, শ্রীশ্রী মা ঠাকরুণ, নিশ্চয় তখন নহবতের ঘর হইতে দেখেন) শ্রীরামকৃষ্ণের অঙ্গের বর্ণ তখন তপ্তকাঞ্চনসদৃশ বাহুর স্বর্ণ কবচের সহিত মিশিয়া যায়! শ্রীমা তথাপি নিরপেক্ষ বিচারকের ন্যায় রায় দিলেন, অপর ব্যক্তিই কিছু অধিক ফরসা। ৯৭ পৃ

শ্রীমায়ের গর্ভধারিণী প্রায়ই অনুশোচনা করিতেন এমন পাগল জামাইয়ের সঙ্গে আমার সারদার বে দিলুম! আহা ঘর সংসার করলে না, ছেলে পিলেও হল না, মা বলাও শুনলে না। ঠাকুর একদিন ইহা শুনিয়া বলিলেন. শাশুড়ী ঠাকরুণ সে জন্য আপনি দুঃখ করিবেন না, আপনার মেয়ের এত ছেলে-মেয়ে হবে, শেষে দেখবেন, মা ডাকের জ্বালায় আবার অস্থির হয়ে উঠবে। ১৫৩ পৃ

একবার জগদ্ধাত্রী পূজার পরিবেশনের কার্য্যে নিরত সেজো মামার কপালে জনৈক সন্ন্যাসী হোমের ফোঁটা দেওয়াতে ব্রাহ্মণ জমিদার বাবুরা অনাচারের প্রতিবাদকল্পে ও জাতিনাশভয়ে অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় উঠিয়া পড়েন—শ্রীমা প্রভৃতির বহু অনুরোধেও আর বসেন নাই, অধিকন্তু পঁচিশ টাকা অর্থদণ্ড

আদায় করেন। পরে শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় জয়রামবাটি আসিয়া ঐ সংবাদ জানিতে পারেন। তিনি সঙ্গে গ্রামোফোন আনিয়াছিলেন ; গ্রামবাসীকে উহা বাজাইয়া শুনাইতে লাগিলেন। পল্লীগ্রামে তখন উহা অভিনব বস্তু, সুতরাং সেই আসরে জরিমানা আদায়কারীরাও উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমায়ের অপমানের প্রতিশোধ লইবার উত্তম সুযোগ পাইয়া বীরভক্ত তখন অগ্নিমূর্তি ধারণ করিলেন, এবং ভয় দেখাইলেন যে টাকা ফিরাইয়া না দিলে তিনি তাহাদিগকে গুলি করিবেন। বলা বাহুল্য, টাকা তৎক্ষণাৎ ফেরত দেওয়া হইয়াছিল। এই সব অদ্ভুত কীর্ত্তির জন্য ললিতবাবু ভক্ত মহলে কাইজার আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। ৩৩০ পৃ

জয়রামবাটিতে থাকার সময় বড়দিনের ছুটিতে রাঁচির ভক্তরা অনেকগুলি ফল লইয়া আসিয়াছেন। ভাবিনী দেবী নাম্নী মায়ের এক দূর সম্পর্কীয়া বিধবা ভাগিনী সেখানে আছেন, মায়ের বাড়ীতে তিনি ভাবিনী মাসী নামে পরিচিত। মাসীর বৃদ্ধা মাতা তখন অসুস্থা ; তাই শ্রীমা বুড়ীর জন্য দুইটি বেদানা পূর্ব্বেই মাসীর হাতে দিয়াছেন। ইহার পরেই রাঁচির ফলগুলি আসিতে দেখিয়া মাসীর আরও পাইবার ইচ্ছা হইল ; তাই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আহা পরমহংসদেবের সঙ্গে প্রথমে আমার বিয়ে হবার কথা হয়েছিল, বাবা তখন পাগল ভেবে তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে দিলেন না। সেই বিয়ে হলে এসব জিনিষ আমার ঘরেই আসত। কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলে হাসিয়া উঠিলেন। মায়ের মুখেও একটু হাসি দেখা দিল ; কিন্তু তাহা বিদ্রূপের নহে, পরন্তু সৌহার্দ্যের হাস্য তিনি মাসীকে বলিলেন, তা নে না তোর আর কি কি চাই। ৫৬০ পৃ

১৫ই মাঘ প্রত্যুষে ছয়খানি গরুর গাড়ীতে বিষ্ণুপুর ছাড়িয়া আট মাইল দূরে জয়পুরে আসিয়া তাঁহারা এক চটিতে রান্নার বন্দোবস্ত করিলেন। রান্না প্রায় শেষ হইয়াছে। পাচক ফেন গালিবার জন্য পাঁচসের চাউলের হাঁড়িটি উনান হইতে নামাইবে, এমন সময় হঠাৎ উহা ভাঙ্গিয়া গেল—ভাত ও ফেন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল আবার রান্না করিতে গেলে অত্যন্ত দেরী হইবে ভাবিয়া সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। শ্রীমা কিন্তু একটুও বিচলিত হইলেন না। তিনি খড়ের একটা নুড়া দ্বারা.........ফেন সরাইয়া ভাতগুলি

··· টানিয়া একত্র করিলেন। তারপর হাত ধুইয়া...বাকস হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবিখানি বাহির করিয়া ... বসাইলেন। অনন্তর একটি শালের কাঠি দিয়া কতকগুলি ভাত একখানা শালপাতায় তুলিয়া ও উহাতে ডাল তরকারি সাজাইয়া দিয়া, যুক্ত করে ঠাকুরকে বলিলেন, আজ এই রকম মেপেছ, শীগ্‌গির শীগ্‌গির গরম গরম দুটি খেয়ে নাও। মায়ের কাণ্ড দেখিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলে, তিনি বলিলেন। যখন যেমন, তখন তেমন ত করতে হবে। ৩৪০ পৃ

ভক্ত বলিলেন, যে, তিন চার দিন পরে তিনি দেশে ফিরিবেন; তাঁহার ইচ্ছা শ্রীমায়ের অন্ন প্রসাদ শুকাইয়া লইয়া যান। যথা সময়ে, শ্রীমা প্রসাদী অন্ন দেখাইয়া দিয়া ভক্তকে বলিলেন, ঐ গো, তোমার সেই জিনিস। একখানি রেকাবিতে অন্নপ্রসাদ ছিল। ভক্ত উহা লইয়া শ্রীমায়ের ঘরের সম্মুখে ঝুলানো একখানি টিনের উপর শুকাইতে দিলেন। মা সাবধান করিয়া দিলেন, দেখো যেন কাকে না মুখ দেয়। ভক্ত তখনই সেখানে ফিরিয়া আসিবেন বলিয়া বাহিরের ঘরে গিয়া তামাক খাইতে খাইতে প্রসাদের কথা ভুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন; প্রায় তিনটের সময় যখন ঘুম ভাঙ্গিলে, যখন 'ঐ কথা মনে পড়িল তখন ত্রস্তভাবে ভিতরে যাইয়া দেখেন, মা ঠিক একই জায়গায় একই ভাবে বসিয়া আছেন। লজ্জিত ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, মা আজ আপনার বিশ্রাম হয়নি? মা বলিলেন, না বাবা তোমার ওটিতে পাছে কাকে মুখ দেয়, তাই বসে আছি। ৪৪৫ পৃ

একবার একটি মেয়ে শ্রীমায়ের নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় তাঁহার পায়ের বুড়ো আঙ্গুল কামড়াইয়া ধরে। মা চীৎকার করিয়া বলিলেন, ওমা এ কি ভক্তি গো! পেন্নাম করবি কর! তা না আবার আঙ্গুল কামড়ে ধরেছে! সেই মেয়েটি কহিল, মনে রাখবেন বলে। মা কহিলেন, মনে রাখবার এমন উপায় ত কখনও দেখিনি। ৪৪৬ পৃ

উদ্বোধনেই এক ভক্ত শ্রীমাকে প্রণাম করিতে গিয়া তাঁহার পায়ের অঙ্গুষ্ঠের উপর এমন জোরে মাথা ঠুকিয়া দেন যে, ব্যথা পাইয়া মা 'উঃ' করিয়া উঠেন। উপস্থিত সকলে ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, একি করলে? ভক্ত উত্তর দিলেন, মার পায়ে প্রণাম করে ব্যথা রেখে গেলুম। যত দিন ব্যথা থাকবে, মা ততদিন আমায় মনে রাখবেন। ৪৪৭ পৃ

রাঁচির ··· আশুতোষ রায় ঠাকুরের দর্শন পাইয়াছেন। ঠাকুরের ডাকে রাত্রে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গায় ··· দরজা খুলিয়া দেখেন, ঠাকুর রাস্তায় দাঁড়াইয়া—গেরুয়া পরা, পায় খড়ম, হাতে চিমটা! ··· জয়রামবাটিতে শ্রীমাকে শুনাইয়া (২৯/১/১৩২০) ··· প্রশ্ন করিলেন, মা খড়ম পায়ে, চিমটা হাতে কেন? মা বলিলেন, সন্ন্যাসীর বেশ। তিনি যে বাউল বেশে আসবেন বলেছেন। বাউল বেশ—গায় আলখাল্লা, মাথায় ঝুঁটি, এতখানি দাড়ি। (ঠাকুর) বললেন, বর্ধমানের রাস্তা ধরে যাব, পথে কাদের ছেলে বাহে করবে, ভাঙ্গা পাথরের বাসন হাতে, ঝুলি বগলে, যাচ্ছেন তো যাচ্ছেন, খাচ্ছেন তো খাচ্ছেন, কোন দিকবিদিক খেয়াল নেই!—প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করিলেন, বর্ধমানের রাস্তা কেন? মা বলিলেন, এই দিকে দেশ। ··· প্রশ্ন হইল, তবে কি বাঙালী? মা বলিলেন, হ্যাঁ বাঙালী, আমি শুনে বললুম, ও কি গো তোমার কি সাধ? তিনি হেসে বললেন, হ্যাঁ তোমার হাতে হুঁকো কলকে থাকবে। ···মায়ের এ প্রস্তাব মনঃপুত হয় নাই বৃন্দাবনে ভক্ত সন্তানগণ রেল গাড়ি হইতে নামিয়াছেন, শ্রীমাও নামিয়াছেন; গোলাপ মা গাড়ী হইতে জিনিস পত্তর নামাইয়া দিতেছেন। লাটু মহারাজের হুকা-কলিকা গাড়িতে পড়িয়া ছিল; গোলাপ মা মায়ের হাতে দিলেন। অমনি লক্ষ্মীদিদি বলিয়া উঠিলেন, এই তোমার হুঁকো কলকে ধরা হয়ে গেল! শ্রীমাও, ঠাকুর ঠাকুর এই আমার হুঁকো কলকে ধরা হয়ে গেল। বলিয়া ঐগুলি ধূপ করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। ৫৩০ পৃ

শ্রীমা শেষবার জয়রামবাটিতে আছেন...এমন সময় একদিন অপ্রকৃতিস্থা সুরবালার খেয়াল হইল যে, তাঁহার জামাতা মন্মথ হারাইয়া গিয়াছে। বহু জায়গায় খুঁজিয়াও সন্ধান পাইলেন না। শেষে পুকুরে নামিয়াও অনেকক্ষণ খুঁজিলেন। অকস্মাৎ ভাবিলেন, এসব ঠাকুরঝির কাজ! তখনই ভিজা-কাপড়ে ছুটিয়া আসিয়া কাঁদিয়া বলিতেছেন, ও গো ঠাকুরঝি গো আমার জামাই বাঁড়ুজ্যে পুকুরে ডুবে গেছে গো, কি হবে গো! শ্রীমা ব্যস্ত হইয়া সকলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, একজন আসিয়া সব শুনিয়া বলিল, মন্মথ বেনেদের দোকানে তাস খেলছে—দেখে এলাম। ৩৮৭ পৃ

···শ্রীমাকে আহারের সময় দুধ আম ও সন্দেশ দেওয়া হইল, তিনি উহা

একত্রে মাখিয়া একটু খাইয়া বলিলেন, ছেলের জন্য রইল এবং আচমনের জন্য বাইরে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, জনৈক স্ত্রীভক্ত ঐ প্রসাদ খাইতেছেন আর আবদার করিয়া বলিতেছেন, সবই ওঁর ছেলেরা খাবে, আর আমরা শুকিয়ে মরব। ৫৪৯ পৃ

(শ্রীমার তখন অসুখ) একদিন ডাক্তার কাঞ্জিলাল আসিয়া দেখিলেন, ভাতের পরিমাণ একটু বেশী হইয়াছে। অমনি সেবিকাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, যে তাঁহার দ্বারা ঠিক সেবা হইবে না। সুতরাং পরদিন হইতে দুইজন নার্সের ব্যবস্থা করা হইবে। ডাক্তার চলিয়া গেলে মা সেবিকাকে বলিলেন, হ্যাঁ আমি সেই জুতোপরা মেয়েগুলোর সেবা নেব ও মনে করেছে? তা আমি পারব না…তুমি কাজ কর্ম্ম যেমন করছ করবে। ৫৪১ পৃ

কলিকাতায় প্রথম আগমনের সময় মাতাঠাকুরানী একবার কলঘরে ঢুকিয়া কল খুলিবামাত্র যেন ফোঁস ফোঁস শব্দ হইতে থাকে, ইহাতে তিনি ভয় পাইয়া তখনই বাহির হইয়া আসেন এবং বলিতে থাকেন যে কলে সাপ ঢুকিয়াছে। ৫৫৭ পৃ

জয়রাম বাটিতে মাতাঠাকুরানীর জ্বর হইয়াছে, তাই সাগু খাইতে খাইতে ভক্ত সন্তানদের লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, কি গো আজ যে প্রসাদে ভক্তি নাই!

একদিন প্রসন্ন মামার ঘরের ভিতরে মা পা ঝুলিয়া বসিয়া আছেন। প্রকাশ মহারাজ নিকটে পদ্মফুল দিয়া শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া বলিতেছেন, মা আমাকে আর ঘুরাবেন না।

শ্রীমা উত্তর দিতেছেন, আমাকে ছেড়ে এতদিন ঘুরতে পারলে, আমি একটু ঘুরাবো না। ৫৫৯ পৃ

শ্রীমা জয়রামবাটিতে যে হারিকেন লণ্ঠন রাখিতেন, তাহার চিমনির চারিদিকে তারের ঘের দেওয়া ছিল। লণ্ঠনটি শ্রীমা সযত্নে রাখিতেন বলিয়া দীর্ঘ স্থায়ী হইয়াছিল। কিন্তু তিনি চিমনি খুলিয়া পরিষ্কার করিতে পরিতেন না; বলিতেন, ওতে অনেক কলকব্জা আমি খুলতে পারি না। কলিকাতার একটি মেয়ের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন অমুকের বউ ঘড়িতে দম দিতে জানে। ৫৫৭ পৃ

শ্রীশ্রী (১০৮) রাম দাস কাঠিয়া বাবা । সন্ত দাস বাবাজী

একবার কলিকাতায় আমার জ্বর হইল। জ্বর ভোগ করিতে করিতে আমার মনে এইরূপ চিন্তা হইল যে শ্রীযুক্ত গুরু মহারাজজী সর্ব্বদা গাঁজা খাইয়া থাকেন। আমি এক চিলিম গাঁজা আনাইয়া নিজে সাজিয়া তাঁহার ভোগ দিব।...গাঁজার কল্কি ও কিছু গাঁজা বাজার হইতে আনাইলাম, এবং নিজের হাতে নিয়মিত রূপে গাঁজা সাজিয়া শ্রীযুক্ত গুরু মহারাজকে স্মরণ করিয়া তাঁহার পানার্থে ঐ গাঁজার চিলিম নিবেদন করিলাম, গাঁজা আপনা হইতে জ্বলিয়া.. ধূম অল্প অল্প করিয়া বাহির হইতে লাগিল...ধারণা হইল...যে তিনি ধূমপান করিয়াছেন। তৎপরে আমি ঐ কল্কিটি লইয়া অবশিষ্ট গাঁজার ধূমপান করিলাম।...আমার জ্বর ত্যাগ হইল।...কয়েক মাস পরে আমি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীযুক্তবাবাজী মহারাজের নিকট আসিলাম···শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কয়েকজন ব্রজবাসীর সঙ্গে একত্রে গাঁজা পান করিতেছিলেন সেই সময় আমাকে অন্য ঘর হইতে তাহার নিকট ডাকাইয়া নিলেন, এবং নিজে যে চিলিমে গাঁজা পান করিতেছিলেন, তাহা আমাকে দিয়া বলিলেন, তুমি এই প্রসাদী গাঁজা পান কর। তখন এক ব্রজবাসী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, বাবুও কি গাঁজা খায়? তখন তিনি হাসিয়া বলিলেন। না, বাবু গাঁজা খায় না, তবে জ্বর হইলে কখন কখন বাবাকে স্মরণ করিয়া গাঁজা ভোগ দেয় এবং প্রসাদ গ্রহণ করে। (অথচ কাঠিয়া বাবা কলিকাতার কথা জানিতেন না) ১৪৯ পৃ

একদিন এক ব্রজবাসী চাকর এক পদের উপর দণ্ডায়মান হইয়া কোন মন্ত্র জপ করিতেছিল। তাহা টের পাইয়া তাহাকে কোন কার্য্যে নিয়োগ করিবেন মনে করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি করিতেছ? সে বলিল, মহারাজ! আমি ভজন করিতেছি। তিনি হাসিয়া বলিলেন, আরে! ভজন কা ঘর বহোত দূর হায়, ভজন আব তেরিসে নেহি বনেগা, আব তু কাম করতা যা। ১২৬ পৃ

রামদাস কাঠিয়া বাবা তদীয় শিষ্য সহিত ভরতপুর হইতে বৃন্দাবনে ফিরিতেছেন উহাদের নিকট প্রায় ২ সের আন্দাজ গাঁজা ছিল; এতখানি গাঁজা রাখা আইনত দণ্ডনীয়। গুরুশিষ্যে পুলিশের হাতে পড়িলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট কহিল, এত গাঁজা লইয়া কি কর।

কাঠিয়া বাবা উত্তর করিলেন, ইহা তাঁহার দুই একদিনের খোরাক মাত্র!

ম্যাজিস্ট্রেট বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না, প্রমাণ চাহিলেন। তৎক্ষণাৎ মহারাজ পরপর চিলিমে প্রায় এক পোয়া মত গাঁজা নিঃশেষ করিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট অবাক্, কয়েক মিনিটের মধ্যে এমন কাজ তাহার ধারণাতীত! তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিয়া কহিলেন, তুমি খালাস হইলে, আর এইখানে তোমাকে গাঁজার জন্য আর কোথাও যাহাতে বিরক্ত না করে তাহার জন্য আমি হুকুমনামা দিতেছি। রামদাস কাঠিয়া বাবা কহিলেন, হুকুম নামার প্রয়োজন নাই, যদি কেহ অবিশ্বাস করে, আমাদের ধরে, আবার এমনই ভাবে চিলিম চড়াইয়া দেখাইয়া দিব। ৪৩ পৃ

একবার রামদাস কাঠিয়া বাবাকে সন্তদাস বাবাজী প্রশ্ন করেন এত নেশাতে ত ক্ষতি হইতে পারে? মহাপুরুষ উত্তর করিলেন, বাবা জিসপর ভগওয়ান কা অমল চড়্‌গিয়া উসপর অওর কোই অমল কভি চড়্‌তা নেহী! (বাবা যার সর্ব্বসত্তায় ভগবানের নেশা চড়ে গিয়েছে, সংসার কোন নেশাই তার উপর ভর করতে পারে না।) ৪৩ পৃ

মাঘোৎসবের উপদেশ। শিবনাথ শাস্ত্রী।

প্রথম যখন ব্রাহ্ম হইয়া পাড়াগাঁয়ে গেলাম, গ্রামের চাষা লোকেরা আসিয়া বলিল, এর বাই হয়েছে, একে ভূতে ধরেছে, একে মিছরির জল খাইতে দাও। ১১৫ পৃ

রেলওয়ে পিক্‌পকেট-এর মত ঈশ্বর তোমার সব কেড়ে নেবেন না। ২১০ পৃ

বৌদ্ধ মন্দিরে স্ত্রীলোক থাকে, তারা অপরের হয়ে নাম জপের চাকা ঘুরোয়—যে তাকে পয়সা দিচ্ছে সে হয়ত তখন বাজার করছে—চাকা ঘুরাচ্ছে সেই স্ত্রীলোক, পয়সা হচ্ছে তার, ধর্ম্ম সেই বাজারের লোকের। ২২৭ পৃ

...শোক নকল আসল আছে। পাঞ্জাবে কেউ মরে গেলে আত্মীয় স্ত্রীলোকেরা দল বেঁধে দিনের মধ্যে একবার ক'রে কাঁদতে আসে। খেয়ে দেয়ে পান চিবুতে চিবুতে যাচ্ছে, একে তাকে ডাকছে, ও ভাই আমি কেঁদে আসি এইরূপ সেজে গুজে দল বেঁধে এসে, ওরে আমার অমুক এমন ছিল তেমন

ছিল। এই রকম করে এক ঘণ্টা কেঁদে আপন আপন বাড়িতে চললেন…।
২৫৯ পৃ

দুই বন্ধু একবার থিয়েটারে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ দেখতে গিয়েছিল। থিয়েটার দেখতে দেখতে এমন মগ্ন হয়ে গেছে যে, একজন দুঃশাসন সেজে যখন দ্রৌপদীর কাপড় টানছে, অমনি সে বলে উঠেছে, মার মার লাগাও জুতো। বন্ধু বললে, থাম থাম—এ যে থিয়েটার তখন তার চেতনা হল। ২৮০ পৃ

মাঘোৎসবের বক্তৃতা | শিবনাথ শাস্ত্রী।

…কোন এক পল্লীগ্রামে একবার একটি শিশু বালিকাকে একটি মৃতদেহ দেখান হইয়াছিল। একটি তেঁতুলবৃক্ষতলে, একটি জলাশয়ে ঐ মুমূর্ষু ব্যক্তিকে অন্তর্জল করা হইয়াছিল। বালিকাটিকে বলা হইল দেখ ইনি মরিয়াছেন। বালিকাটি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দেখিল, মৃত শরীর হাঁ করিয়া পড়িয়া আছে। তাহার কিছুদিন পরে একদিন সেই গ্রামে ঝড় আরম্ভ হইল। সেই ঝড়ে এক বুড়ীর একখানি গৃহ ভূমিসাৎ হইল। একজন চীৎকার করিয়া বলিল, ও গো বুড়ী যে মরে তোমরা দেখ। তখন সেই বালিকা ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাহার জননীকে জিজ্ঞাসা করিল, মা মা তেঁতুলতলায় বুড়ী কি হাঁ হয়েছে…। সে জানে মরিতে হইলে তেঁতুলতলায় হাঁ করা চাই। ১০০ পৃ

…আমি এক সময়ে একটা গ্রাম্য স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলাম। একবার সেই গ্রামের কায়স্থদের ইচ্ছা হইল যে তাহারা সকলে পৈতা লইবে। তাহারা ত পৈতা লইল তখন তাহাদিগকে সকলে এক ঘরে করিল। আমি হইলাম পৈতা ফেলে একঘরে আর তারা হইল পৈতে নিয়ে একঘরে। ১৩৮ পৃ

এক গ্রাম্য স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলাম…যাহা হউক কিছুদিন ত কাটিয়া গেল। তারপর দেখি, তারা সব এক রকম ঠাকুর প্রস্তুত করিয়া বিসর্জ্জন দিতে লইয়া যাইতেছে। কানেকলম গোঁজা সবুজ রংএর ঠাকুর, তাহার পূর্ব্বে সে রকম ঠাকুর আমরা কখনও দেখি নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এ আবার কি। তাহারা বলিল, এ আমাদের ঠাকুর, এর নাম চিত্রগুপ্ত! তারা কোথায় পুরাণ খুঁজিয়া এক চিত্রগুপ্ত ঠাকুরের উল্লেখ পাইয়াছে, অমনই সকলে চিত্রগুপ্ত প্রস্তুত করিয়া পূজা করিল। কিছুদিনের মধ্যে দেখি, গ্রামের অন্ত

কোনও কোনও ভবনে চিত্রগুপ্ত পূজা আরম্ভ হইল। কি নিয়মে চিত্রগুপ্ত পূজা করিতে হয় তাহা কেহ জানে না। কেহ আবার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনিয়া জিজ্ঞাসা করে, তখন তারা আগে যাদের বাড়ীতে পূজা হইয়াছিল, তাহাদিগকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিরূপে চিত্রগুপ্ত পূজা করিতে হয়; তাহারা যে নিয়ম বলিয়া দিল, অমনই সকলে সেই নিয়মে পূজা আরম্ভ করিল। ১৩৯ পৃ

একদিন আমার মাতা ঠাকুরাণী আমাকে বলিয়াছিলেন, বাবা তারকেশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন। আমি বলিলাম, তোমার তারকনাথ ত তারকেশ্বরে। সেখান হইতে আমাকে কিরূপে রক্ষা করিবেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, বাছা তারকেশ্বর কি শুধু ঐ মন্দিরে বসিয়া আছেন। ৪০ পৃ

একবার রেলে যাচ্ছি, হঠাৎ এক পরমহংস সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই যে দুর্ভিক্ষ হয়েছে, এত লোক মারা যাচ্ছে, আপনি কেন এদের জন্য কিছু করেন না? আপনারা মনে করলে ত অনেক কাজ করতে পারেন। এই সব গরিবদের অনেককে বাঁচাতে পারেন, তা কেন করেন না?...শত শত লোক দুর্ভিক্ষে মারা যাচ্ছে এ দেখে কি আপনাদের ক্লেশ হয় না। তা শুনে তিনি বললেন, আরে যানে দেও, যাক! আমি বললাম, আচ্ছা না খাওয়ান, আপনারা ত লোককে উপদেশ দিতে পারেন। তিনি বললেন, উপদেশ দেব কাকে? ওরা সব অজ্ঞ লোক। ১৯৫ পৃ

একটি গল্প মনে পড়ছে। আমাদের বংশের একজন পূর্ব্ব পুরুষ, আমার প্রপিতামহ, তিনি আপনার স্ত্রীকে পাপ বলে ডাকতেন; লোককে বলতেন, এ আমার পাপ! পাপ, পাপ না হলে কি এমন হয়? কোন স্থান হতে এসে যদি আপনার স্ত্রীকে ঘরে না দেখতে পেতেন, ছেলেদের বলতেন, ও ছেলেরা তোরা আমার পাপকে দেখেছিস? ও নাৎনি, আমার পাপ কোথায় জানিস। তখন পাড়ার ছেলেরা বলত, ও ঠাকুরদাদা তোমার পাপ ও বাড়ি। ডেকে দেব? ও ঠাকুরদাদার পাপ, ও গো ঠাকুরদাদার পাপ, ঘরে এস। ২০০ পৃ

...একবার একজনদের বাড়িতে শ্রাদ্ধ হইতেছিল। সেই বাড়িতে একটা বিড়াল ছিল। সেটা বড় দুষ্ট, বড় উপদ্রব করিত। সেজন্য যেখানে শ্রাদ্ধ

হইতেছিল, তাহার এক পাশে তাহাকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। তাহার কিছুদিন পরে সেই বাড়ির নিকটবর্ত্তী আর একজনদের বাড়িতে শ্রাদ্ধ হইতেছিল। ঐ বাড়ির লোকেরা পূর্ব্ব বাড়ির বিড়াল বাঁধা দেখিয়াছিল এবং সেটা তাদের মনে ছিল। সে বাড়িতে বিড়াল ছিল না; শ্রাদ্ধের সময় দেখা গেল, তাহারা কোথা হইতে একটা বিড়াল ধরিয়া আনিয়া শ্রাদ্ধ স্থানের এক পার্শ্বে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তদবধি সে দেশের শ্রাদ্ধের সময় বিড়াল বাঁধা নিয়ম হইল। ১৩৯ পৃ

শ্রীমা কথা ১য় খণ্ড | স্বামী জগন্নাথানন্দ।

ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয়ের ভাইয়ের ছেলের পরিবার যে দিন মৃত্যু হয় সেই দিন সকালে সে চম্পট দিলে। তার পাঁচটি ছেলেমেয়ে ছিল। ছেলেদের যতদূর দুরাবস্থা হবার হ'ল। কন্যাকে অপাত্রে দান; তার বড় ছেলেটি একটি দোকানে পাকের কার্য্য করত। একজন বাবু (শ্রীম) গড়ের মাঠে বেড়াতে যেত; তার সঙ্গে সেই বড় ছেলেটির দেখা হয় এবং তার কাছে সমস্ত দুরাবস্থার কথা জানায়। তার কাছে বলে, আমার খুব পড়বার ইচ্ছে, আপনি একটু সাহায্য করুণ, শেষে এই (মর্টন) স্কুলে ফ্রি ভর্ত্তি করান হল। এইরূপে বি, এ, পাশ করে একজনের বাড়ীতে ছেলে পড়াত। সেই আবার দেড়শো টাকা মাইনেতে চাকরি পায়। এখন দুই হাজার টাকা জমিয়েছে। সেদিন এখানে এসেছিল। দু'হাজার টাকা জমিয়েছে শুনে আবার বাপ কাছে এসেছে, হুকা হাতে করে। পরিব্রাজক জীবন ত্যাগ করে। সেবা নিতে এসেছেন। ১৯৭ পৃ

...চণ্ডীর গান শুনেছেন? কালকেতু অত্যন্ত গরীব ও মায়ের ভক্ত ছিল। একদিন মাকে প্রার্থনা করে বললে, মা আমাকে কিছু ধন দাও। মা তার কাতরোক্তি শুনে বললেন, ঐখানে সাত কলসী মোহর পোঁতা আছে, নিয়ে যাও। কালকেতু সেইগুলি বার করে একত্রে রেখে মাকে বললে, মা দেখো, কেউ যেন এই মোহর না নেয়, তুমি এখানে পাহারা দিও। এই বলে বাঁকে করে, এক এক বারে দু কলসী করে মোহর নিয়ে যেতে লাগল। শেষে রইল এক কলসী (নিজে দু কলসী নেবার পর) ও ভাবছে, মা যদি এ ঘড়াটা

নিয়ে পালায়। সেই জন্যে তাঁকে বললে, মা, কাঁখে করে এ ঘড়াটা নিয়ে আমার সঙ্গে এস। তার কথা শুনে মা হাঁসতে লাগলেন। (কালকেতু) আবার বলছে, কাউকে বিশ্বাস নেই! মায়ের নূপুর শুনতে শুনতে চলল। আবার মাঝে মাঝে পিছনে ফিরে ফিরে দেখে। ২২২ পৃ

একবার একজন বৈষ্ণবদের আশ্রমে গিয়েছিল। তাকে ঠাকুর ঘরে শুতে দেয়, রাত্রে সে তার মশারি চৈতন্যদেবের হাতে বেঁধে শুয়েছিল। সকালে আশ্রমের লোকেরা যখন দেখলে, তখন সেই লোকটি হাত জোড় করে বলতে লাগল, প্রভু আপনার ভক্তের ওপর কি কৃপা! আপনি নিজ হাতে মশারি ধরে আছেন। ১৯১ পৃ

…হৃদয় ঠাকুরকে গালাগাল দিচ্ছে, ঠাকুর নিজের বেটুয়া থেকে কাবাব চিনি নিয়ে মুখে ফেলচেন। একদিন হৃদয় খড়ের ব্যবসা করবার জন্য খড় কিনতে গেছে। কালীবাড়ীর লোকের কাছে বলে গেছে, মামা আছে মা কালীর পূজো করবে। ঠাকুর দেখলেন অনেক বেলা হয়েছে অথচ মা কালীর পূজা হয়নি। তাই তাড়াতাড়ি রামলালদাদাকে নিয়ে মায়ের পূজো করলেন। হৃদয় এলে তাকে খুব মারলেন। বললেন, শালা, আমি পূজা করব।

হৃদয় বললে, মার মামা আরও মার!

ঠাকুর বললেন, দেখ্ আমি যখন রাগব, তুই কিছু বলবিনি। আর তুমি যখন রাগবি, আমি কিছু বলব না। ১৪৯ পৃ

শিবুদা বললেন দক্ষিণেশ্বর থেকে হৃদয়কে বার করে দিয়েছে। তার পাঁচ ছয়দিন পর এই ঘটনার কথা বলছি। সেই সময় নূতন কামারপুকুর থেকে এসেছি। চারজন গুণ্ডা ঠাকুরকে পরীক্ষা করবার জন্যে রাত্রে এসেছে। সেইদিন কার্ত্তিক পূর্ণিমা। ঠাকুর তাদের দেখেই বল্লেন, আয় আয় জল খাবার খেয়ে যা। এই বলে তাদের নিয়ে হাঁস পুকুরের ধারে কাঁঠাল গাছ থেকে ২৫ সের আন্দাজ পাকা কাঁঠাল পাড়লেন। সেই কাঁঠাল ঘরের কিছু সন্দেশ রসগোল্লা যা ছিল তাদের খাইয়ে বিদায় করলেন। ১১৬ পৃ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ঃ ২য় ভাগ। শ্রীম কথিত।

বরানগরের মঠ। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ ও নরেন্দ্রাদির সাধনা ও তীব্র বৈরাগ্য।

একজন ভাই শুইয়া শুইয়া রহস্যভাবে বলিতেছেন—যেন ঈশ্বরের অদর্শনে বড় কাতর হয়েছেন, ওরে আমায় একখানা ছুরি এনে দেবে আর কাজ নাই, আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না।

নরেন্দ্র (গম্ভীরভাবে) ঐ খানে আছে হাত বাড়িয়ে নে। ৩৩৭ পৃ

ভবনাথের কথা পড়িল। ভবনাথের স্ত্রীর সঙ্কটাপন্ন পীড়া হয়ছিল।

নরেন্দ্র রাখালের প্রতি—ভবনাথের মাগটা বুঝি বেঁচেছে! তাই সে স্ফূর্ত্তি করে দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে গিছিল।

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী ঃ ২য় ভাগ | মহেন্দ্র দত্ত

একদিন ভবনাথ বৈকালে আসিয়াছেন কিছু পরে যাইতে ইচ্ছে করলেন। সকলে কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন যে, তাহার অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে সেজন্য বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছেন। সকলে বলিল, উনুন ধরছে, দু খানা রুটি খেয়ে যাও না। ভবনাথ রান্নাঘরের উত্তর দিকের দালানের কোণে অর্থাৎ ভিতর কার সিঁড়ি দিয়ে নামিয়া ডান দিকের দালানের প্রথম স্থানটিতে কালী-কৃষ্ণের সঙ্গে বসিয়া একটু তরকারী দিয়া গরম রুটি এক একখানা করিয়া মহানন্দে খাইতে লাগিলেন। দু একখানা গরম রুটি খাইয়া ভবনাথের ভক্তি-ভাব প্রবল হইয়া উঠিল, তিনি মেরুদণ্ড লম্বা করিয়া ধ্যান করার ভাবে বসিয়া ভক্তি গদগদভাবে বলিলেন, man can not live on bread alone অর্থাৎ যীশু উক্ত কথাটি, অন্নের উপরেই নির্ভর করিয়া কেবল মানুষের জীবন চলিতে পারে না—কিন্তু বাইবেলের এই কথাটার অপর অংশ বলিবার পূর্ব্বেই সম্মুখে দণ্ডায়মান কালী বেদান্তী হাস্যচ্ছলে বলিলেন, But upon bread and mutton! ৪১ পৃ

শ্রীম কথা | ২য় খণ্ড।

শ্রীম—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী গল্প করতেন। নবদ্বীপে পাগলাদের সেবা শুশ্রূষা করবার জন্য এক প্রতিষ্ঠান ছিল। সেখানে বহু পাগল আসত। প্রতিষ্ঠানের যিনি অধ্যক্ষ, প্রকৃত পাগলকে পরীক্ষা করবার জন্য সকলের হাতে একটি করে টাকা দিলেন। সকলেই নিজের নিজের টাকা ট্যাঁকে গুঁজল তাদের মধ্যে কেবল একজন টাকাটি হাতে নিয়ে থুথু করে ফেলে দিল। তাইতে তারা বুঝলেন, এইটি হচ্ছে যথার্থ পাগল! ২৬৮ পৃ

শ্রীমৎ বিজী ঘটনাবলী। ২য় খণ্ড।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোভাবের পর যোগেনমহারাজ শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরানীকে লইয়া বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরানীর সঙ্গে সেই সময় কয়েকটি স্ত্রীলোকও গিয়াছিল। যোগেনমহারাজ ও অপর সকলে বলরামবাবুর কুঞ্জে বাস করিতেন। যোগেনমহারাজ অতীব কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। চোবে ও পাণ্ডা ভোজন প্রথানুযায়ী ··· শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরানী গুটি কতক চোবে ও পাণ্ডা নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশের লোকেরা তরিতরকারি অতি আহ্লাদ করিয়া আহার করে সেই জন্ম (চোবেদের) ··· ছোলার ডাল ও আলুরদম করিয়া ভোজন করাইতে আরম্ভ করেন। তারা চোবে লোক, লাড্ডু, পেঁড়া বরফি বোঝে—তরকারির তত ধার ধারে না। প্রথমতঃ তরকারি দিয়াছে, ··· চোবে বাবাজীরা ত হাপ্‌রে দুগালেই তা মেরে দিয়েছে। গোলাপ মা পরিবেশন করিতেছিলেন। তিনি মনে করিলেন, তরকারি ছোলার ডাল এরা ত কখন খেতে পায় না, সেই জন্ম অত চেটেপুটে খাইতেছে। গোলাপ মা সেইজন্য আহ্লাদ করে জিজ্ঞাসা করলেন, আর একটু ডাল দেব বাবাজী। এইকথা শুনিয়া এক চোবে বাবাজী অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে বলে উঠলেন, হাম কেয়াবয়েলহ্যায়যে বয়েলকে (বলদ) খোরাক খিলাতা ? অর্থাৎ ছোলা বয়েল খায় সেইজন্য ছোলার ডাল বয়েলের খোরাক ! ইহা শুনিয়া সকলেই ত অপ্রতিভ হইয়া হাসিতে হাসিতে সেস্থান হইতে পালাইয়া আসিলেন। অবশেষে সেই দেশের আচার অভিজ্ঞ ব্যক্তি আঁচলা আঁচলা করে লাড্ডু পেঁড়া প্রভৃতি ··· তাদের পাতে ঢেলে দিলে, তবে চোবে বাবাজীরা একটু ঠাণ্ডা হয় ও মুখে হাসি আসে। ১১৩ পৃ

শ্রীশ্রীমা ও সপ্ত সাধিকা। তেজসানন্দ।

লক্ষ্মীদিদি একবার একজন সাধুকে স্ত্রীমহলে বেশী ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, ছিঃ ছিঃ মেয়েমানুষের পেছু পেছু ছোটা! দাদা তুমি সিংহের শাবক হয়ে শৃগালের আচরণ করছ। ১৬৫ পৃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহাবসানেরপর গোলাপমা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীরসেবা ওদেখা-শুনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।...শ্রীশ্রীমাকে ভাবপ্রবণ ভক্তগণের নানা প্রকার অন্যায় আবদারের হাত হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেন। একদিন জনৈক ভক্ত

শ্রীশ্রীমায়ের শয়নঘরে ধূপধূনাদি দ্বারা শ্রীশ্রীমায়ের আরতি করিতেছিল ; ঘরটি ধোঁয়ায় ভরিয়া অন্ধকার হইয়া গেল, এদিকে মায়ের দেহ ঘর্ম্মাক্ত ও শ্বাসরোধের উপক্রম হইল। গোলাপমা ছুটিয়া আসিয়া ভক্তর কাণ্ড দেখিয়া স্তম্ভিত, ধমকাইয়া কহিলেন, তোমরা কি কাঠ পাথরের ঠাকুর পেয়েছ গা। ১২৬ পৃ

দুর্গামা। সুব্রতাপুরী।

দুর্গামার গল্প—ভক্তিমান এক শিষ্য নানা উপচারে গুরু সেবা করেন। গুরু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, কিন্তু অর্থলোভী, ভোগবিলাসী ; তাঁর প্রেম আর ভক্তির খুবই অভাব। গুরুর সেবায় শিষ্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেছেন, একেবারে কপর্দ্দকহীন হয়ে পড়েছেন। এমন অবস্থায়ও গুরু কিছু পরিমাণ সোনা চাইলেন···। শিষ্য নিরুপায়, গুরুর মনস্কামনা কিভাবে পূর্ণ করা যায় ! তিনি শুনেছেন পঞ্চগব্যে দেবতার পূজা হয়, গোময় স্বর্ণতুল্য। তাই, একটু গোময় এনে ভক্তিভরে গুরুর চরণ প্রান্তে রাখলেন।

শিষ্যের প্রণামীর ঘটা দেখে গুরু মহারুষ্ট হয়ে বললেন, যা ব্যাটা, যা নদীতে ডুবে মরগে যা। যে আজ্ঞে, বলে গুরুদেবকে প্রণাম করে ভক্তশিষ্য প্রশান্তমনে চললেন মৃত্যুবরণ করতে। যেতে যেতে অনেক দূরে গিয়ে দেখেন, সামনে নদী। গুরু আজ্ঞা পালনে নদীর জলে নাবলেন ডুবে মরতে। কিন্তু নদীর জল কমে যায়···ডোবা যায় না। বিফল মনে শিষ্য আবার চলেন, নদীর পর নদী খোঁজেন, সর্বত্রই সেই হাঁটুজল।

···অবশেষে এক নদীর পরপারে গিয়ে দেখেন...এক চমৎকার অরণ্য তার মধ্যে খুব সুন্দর একটি মন্দিরে বিরাজ করছেন, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুর্জ নারায়ণ।...পরম ভক্তি ভরে দণ্ডবৎ করে উঠে দেখেন, পেছনে রয়েছে দুটি সোনার পাহাড় !

প্রসন্ন হাসিতে দেবতা জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাই তোর !

গুরুর প্রসন্নতা ছাড়া ভক্তিমান শিষ্যের আর কোন চিন্তা নেই, কামনা নেই ; করজোড়ে নিবেদন করেন—আমার গুরুদেবের জন্যে কিছু সোনা পেলে কৃতার্থ হব !

দেবতা বলেন, তথাস্তুঃ এ সোনার পাহাড় দুটো তোর ! তোর জন্তই আমি চৌকী দিচ্ছি।

গুরুদত্ত মন্ত্রকে বিশ্বাস করেছেন শিষ্য...জপাৎসিদ্ধিঃ ইষ্টলাভ হয়েছে। আদিত্যবর্ণং পুরুষমহান্ত'কে দর্শন করলে কিছুরই আর অপ্রাপ্তি অপূর্ণতা থাকে না। শিষ্য এখন আপ্তকাম, পূর্ণ।

ওদিকে গুরু বসে আছেন তাঁর অহঙ্কারের আসনে, হঠাৎ দেখেন শিষ্য আসছে ছুটতে ছুটতে। সেই ব্যাটা, যে গোবর দান করেছিল, যাকে তিনি ডুবে মরতে বলেছিলেন। কিন্তু মনে হচ্ছে, এ যেন নূতন মানুষ, অশ্রুপুলকাদি অষ্ট সাত্ত্বিকের লক্ষণ যেন প্রকাশ পাচ্ছে ওর সারা দেহে? গুরু অবাক।

ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে শিষ্য বলেন, গুরুদেব আপনার কৃপায় আমার ইষ্টদর্শন হয়েছে, সোনার পাহাড়ও পেয়েছি!

গুরুর ভাবের পরিবর্ত্তন হয় শিষ্যকে দেখে, বলেন, বাবা আমাকে দেখাতে পারবি সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষকে?

হ্যাঁ পারব আপনি আসুন।

ঈশ্বরদর্শী শিষ্য পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেন গুরুকে, ভবনদী পার হতে হবে। শিষ্যের যেখানে হাঁটুজল, অনায়াসে এগিয়ে চলেন, গুরুর সেখানে অথৈ জল, ডুবে যাচ্ছেন। বিপন্নগুরু বলেন, তুই কি করে এগোচ্ছিস বাপ? আমি ত ডুবে যাচ্ছি!

শিষ্য বলেন, কেন? আমি ত আপনার নামের বলেই—জয়গুরু জয়গুরু স্মরণ করে এগিয়ে যাচ্ছি!

গুরু ভাবেন—এই ব্যাপার, গুরু ত আমি, আমার নামের গুণেই ও এগিয়ে যাচ্ছে; তখন তিনি উচ্চকণ্ঠে ... জয় আমি জয় আমি বলে যত এগুতে যাচ্ছেন, তত জলে ডুবে যাচ্ছেন। গুরুর দুরবস্থা দেখে শিষ্যের কান্নাকাটি—তাঁকে পিঠে তুলে জয়গুরু জয়গুরু বলতে বলতে এগিয়ে চললেন। শেষ পর্য্যন্ত সেই দেবস্থানে গিয়ে উপস্থিত হলেন গুরুশিষ্য। কিন্তু শঙ্খচক্রগদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণ কেউ আর দেখতে পাচ্ছেন না! না গুরু না শিষ্য! গুরুভক্ত শিষ্য কাঁদেন দেবতার কাছে গুরুর জন্য—প্রভু দয়া করে আমায় দর্শন যদি দিয়েছেন, আমার গুরুকেও দর্শন দিতে হবে। আমার যদি কিছু পুণ্য থেকে থাকে তার বিনিময়ে আমার গুরুকে দর্শন দিন। সাধন শিষ্যের পুণ্যে দেবতার দয়া হল! ৪০২ পৃ

একদিন গৌরী মা তাঁহাকে, (দুর্গামাকে), দেবী প্রণামের মন্ত্র শিখাইতেছিলেন, শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি ! নারায়ণি নমোহস্তুতে। সরল শিশু ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, মামনি এই গৌলিও তোমাল মত বকে !

প্রশ্ন শুনিয়া গৌরী মা উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। ১৪ পৃ

এক গুরুর ছিল এক কুড়ে শিষ্য। গুরু একদিন তাকে বললেন, বাবা এবার ভিক্ষায় বের হও। কিছু খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করে নিয়ে এসো, ঠাকুরকে ভোগ দিতে হবে।

শিষ্য বলেন, আমি এখন জপে আছি।

কিন্তু, ঠাকুরের নিত্য ভোগের ব্যবস্থা তো করতেই হবে। অগত্যা গুরু নিজেই ভিক্ষেয় বার হলেন। ভিক্ষে করে ফিরে এসে শিষ্যকে বলেন, আমি তো খেটেখুটে নিয়ে এলুম, তুমি এবার রান্না কর।

শিষ্য জবাব দেন, আজ্ঞে আমার জপ তো এখনও শেষ হয় নি, দেরী হবে।

গুরু আর কি করেন ! নিজেই রান্না ক'রে, ভোগ নিবেদন ক'রে শিষ্যকে ডাকলেন, এবার পেসাদ পেতে এসো।

শিষ্য তৎক্ষণাৎ ভক্তিভরে বলেন, গুরুদেব, দু-দুবার গুরুবাক্য লঙ্ঘন করেছি, এবার আর নয়। বলেই পেসাদ পেতে বসলেন। ৪০০ পৃ

আশুতোষ চৌধুরী ছিলেন, গৌরীমাতার ভক্তসন্তান, দুর্গামা তাঁহাকে আশৈশবাবধি আশুদা বলিয়া ডাকিতেন এবং শ্রদ্ধা করিতেন। মায়ের বাল্য প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, জগন্নাথের হাত নেই, পা নেই চকোলোচন' বলে। আমি মাঝে মাঝে দুর্গার সঙ্গে তামাসা করতুম। দুর্গামায়ের বিবাহ হয় পুরী জগন্নাথ দেবের সঙ্গে—পতিনিন্দায় তার মনে খুব দুঃখ হত, আর সঙ্গে সঙ্গে চোখের জলে গাল ভেসে যেত। ওর দুঃখ আর চোখের জল দেখে আমার বড়ই কৌতুক বোধ হত, আর ভালও লাগত খুব। তখন তার মনটাকে পরীক্ষাচ্ছলে আবার বলতুম, আরে কি মুশকিল তোমার দেবতার রূপবর্ণনা করছি বলে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছ। তবে কি করে খাঁটি সন্ন্যিসী হবে···। ১০১ পৃ

আশ্রম গোয়াবাগানে অবস্থানকালে এক অশীতিপরা বৃদ্ধা প্রায়ই তাঁহার ছেলে বা নাতিদের সঙ্গে আশ্রমে আসতেন।···তাঁর আসনটা কিন্তু পূজনীয়া গৌরীমা পছন্দ করতেন না! গৌরীমার পছন্দ না হলে কি হবে? বুড়োমা

এলেই (ঐ বৃদ্ধা) আমরা মহাউল্লসিত হয়ে উঠতুম ?···শুধু রঙ্গ তামাসা নয়, পুরাণ ভাগবত চণ্ডীর কথা এমন কি আজব গল্পও এমন সুন্দরভাবে বলতেন, যে শ্রোতাদের ভীড় বৃদ্ধার চারপাশে জমেই থাকতো। ..আবার মনে থাকতো কখন গৌরীমা এসে পড়বেন আমাদের সভায় কি বলবেন বা রাগ করবেন। বুড়োমাও এ বিষয়ে সতর্ক থাকতেন, বলতেন, দাদারা দামুর বৌ আসছে (শ্রী শ্রী দামোদরজীর পত্নী গৌরীমা। তোরা যে যার কাজে যা ...।

স্মৃতিকথা ঃ স্বামী অখণ্ডানন্দ

তখন আমার বয়স ১৫/১৬ হবে...

ঠাকুরের কাছে যেদিন আমি প্রথম যাই, সেদিন তিনি হাসতে হাসতে আমাকে বড় যত্ন করে নিজের কাছে বসালেন। প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুই আমাকে আগে দেখেছিলি ? উত্তরে আমি বলেছিলাম, হাঁ একেবারে খুব ছেলেবেলায় আপনাকে একবার দীন বোসের বাড়ীতে দেখেছিলাম।

স্বামী অদ্বৈতানন্দ (গোপালদাদা) ঠাকুরের কাছে ছিলেন। তাঁকে ডেকে ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, ওহে বোস শোন এ বলছে কিনা খুব ছেলেবেলায় দেখেছিল ! উঃ এর আবার ছেলেবেলা ! ৩ পৃ

পূর্ব্বে আমি শুনেছিলাম একটি গায়িকার মুখে—

এস মা বস মা ও হৃদয় রমা
পরাণ পুতলী গো।
হৃদয় আসনে হও মা আসীনা
নিরিখি তোমারে গো ॥

এই গানটি শুনলে ঠাকুর বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে যান। বিজয় গোস্বামী এলে ঐ গায়িকাটি যদি না আসত তবে ঠাকুর বলতেন, ওগো ঐ মেয়েটিকে এনো ! সেই মেয়েটিকে সেদিন দেখলাম। কালো, বিধবা, নাদুস নুদুস চেহারা, সুকণ্ঠ। গানের এস মা এস মা ! অংশটি গাইতেই ঠাকুর ভাবে মাতোয়ারা হয়ে উঠলেন। সে যে কি ভাব—বর্ণনাতীত। অশ্রুজলে সমস্ত বুক ভাসিয়ে গভীর সমাধি মগ্ন হলেন।

কয়েকদিন পরেই আবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে দেখি সেই মেয়েটি ঐখানে

রয়েছে। আমি ঠাকুরের কাছে গিয়ে বসলাম। আরও দুই তিন জন ভদ্রলোক এবং রামলাল দাদাও ছিলেন।

ঠাকুর বলছেন, দেখ গো এই মেয়েটির মুখে এস মা এস মা গানটি শুনতে আমার বড় ভাল লাগে। তাই বিজয় এলে এ মেয়েটি যদি না আসত, তো বলতাম ওগো সেই মেয়েটিকে আনলে না? এবার ও রয়ে গেল। সেদিন দেখি আমাকে দেখে ঘোমটা টানছে। আমি বললাম, সে কি গো তুমি আমাকে দেখে ঘোমটা টানছ কেন? ও দেখি গা নেড়ে নেড়ে বলছে, তা কি তুমি জান না? আর একদিন দেখি ঘোমটার ভেতর কাঁদছে! আমি বললাম, সে কি গো? তুমি আমাকে দেখলে ঘোমটা দাও, আবার কাঁদ, কি ব্যাপার? সে বললে, তোমার সঙ্গে আমার মধুর ভাব। আমি বললাম, সে কি গো আমার যে মাতৃভাব।

এই না বলে ঠাকুর উঠে পড়লেন। রাগে শরীরটা ফুলে উঠল। কাপড় খসে পড়ল। একবার ঘরের এমাথা ওমাথা সিংহের মত যাওয়া আসা করতে লাগলেন, রামলাল রামলাল বেটি বেটি বলে কিনা মধুর ভাব। আরও কত গালাগাল করতে লাগলেন। ১৫ পৃ

গদাশঙ্কর বাবু একটু ব্রাহ্মভাবাপন্ন লোক, কেশব বাবুর ভক্ত। ঠাকুর পূর্ব্বদিকের বারান্দার দু'তিনটি দরজার পরে তার সঙ্গে কথা কইতে লাগলেন। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে।

ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন, তুমি সন্ধ্যা আহ্নিক কর? তিনি গতর নেড়ে বললেন, আমার ও সব অস্থার ফট্ ফুট্—ও ভাল লাগেনা। ঠাকুর বললেন দেখ, জোর করে ছাড়তে নেই। যেমন কুমড়ো লাউ ইত্যাদির ফুল ছিঁড়ে দিলে পড়ে যায়। কিন্তু ফল পাকলে ফুল আপনি ঝরে যায়। ৩১ পৃ

রাজপুতনোর (মাড়োয়ারী) অনেক ভক্ত পঞ্চবটি তলায় বনভোজনের আয়োজন করছে। বাট্টী, চুরমা আর ডাল—এই তাদের বনভোজনের খাদ্য।

প্রকাণ্ড ঘুঁটের পাঁজার আগুনে আটার তাল পাকিয়ে দেয়। তারপর যখন ওপরটা ফেটে যায়, তখন ওপরের অংশটি দিয়ে বাট্টী তৈরী হয়। জল দিয়ে খায়। আর ভিতরের নরম ভাগটিতে যথেষ্ট পরিমাণে ঘি চিনি পেস্তা বাদাম

কিসমিস এলাচ ইত্যাদি মিলিয়ে দস্তুর মত বড় বড় লাড্ডু পাকায়। তাকেই চুরমা বলে। তাহা অতি উপাদেয় এবং উহাদের বড় প্রিয় খাদ্য দ্রব্য। ঐ রকম লাড্ডু পরাত ভরে তারা ঠাকুরকে এনে দিলে। তিনি তা পেয়ে বড় আনন্দ করতে লাগলেন।

তারা চলে গেলে তখনি ঠাকুর বললেন, নরেনকে ডাকিয়ে এনে খাওয়াতে হবে। এ জিনিস এক নরেন ভিন্ন কেউ হজম করতে পারবে না। এ সব নরেন না খেলে হজম করবে কে? নরেন যেন জলন্ত অগ্নি। কলা গাছ ফেলে দিলেও পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। ৩৭ পৃ

একদিন আমি একজন খুব আনন্দময় সাধু দেখেছিলাম। ...সেই সাধু দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করতে করতে ভগবদ্দর্শনের জন্য অতিশয় ব্যাকুল হন। সেতুবন্ধ রামেশ্বরের মন্দিরের মধ্যে ঢুকে বাবার অনাদি স্বয়ম্ভূলিঙ্গ দুই হাত দিয়ে ধরে বলেছিলেন, আমি ব্রহ্মজ্ঞান না পেলে তোমায় ছাড়ব না। বলতেই মন্দিরের পাণ্ডাদের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেছল। কারণ, মন্দিরের মধ্য গিয়ে বাবাকে স্পর্শ করতে কেউ পারত না। পূজারী পাণ্ডারা তাঁকে ধাক্কা মেরে মন্দির থেকে বার করে দিলে। সেই অবধি বাবার কাছে আনন্দ পেয়ে সাধু আনন্দময় পুরুষ হয়ে ভ্রমণ করছেন। ৩৮ পৃ

ঠাকুর একবার বাগবাজারে নেবুবাগানে যোগেন মাদের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। যোগেন মা দক্ষিণেশ্বরে যেতেন, তা তার ভাই হীরালালের ভাল লাগত না। ঠাকুরকে যখন যোগেন মা বাড়ীতে এনেছিলেন, তখন হীরালাল (যেমন শুনেছি) তাঁকে ভয় দেখাবার জন্য বাগবাজার গোঁসাই পাড়ার বিখ্যাত মল্ল, তদানীন্তন সকল রকম ব্যায়ামেপটু মন্মথকে এনেছিল। কিন্তু মন্মথ ঠাকুরকে দেখে এবং তাঁর দুচার কথা শুনে দণ্ডবৎ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে তাকে বলতে লাগল, প্রভু আমি বড় অপরাধী, আমায় ক্ষমা করুন। ঠাকুর তাকে বললেন, তুমি দক্ষিণেশ্বরে যেও। ৪৩ পৃ

এখানে মন্মথের একটু পরিচয় দিলে বোধ হয় অপ্রাসাঙ্গিক হবে না। আগেই বলেছি, সে সকল ব্যয়ামেই পারদর্শী ছিল। সে একাই একশ' লোকের মওড়া রাখতে পারত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্যামবাজার ব্রাঞ্চ স্কুলে প্রতি

শনিবারে দুই দলের ছেলের ভীষণ মারামারি হত। একদিন মন্মথকে বাগবাজারের ছেলের দল নিয়ে যায়। শ্যামপুকুরের দল খুব ভারী ছিল। তার মধ্যে অনেকেই বড় বড় কুস্তিগির। মারামারি যখন আরম্ভ হল, তখন মন্মথ একা অতগুলো বিখ্যাত কুস্তিগিরের সঙ্গে না পেরে উপুড় হয়ে পড়ল; আর তারা প্যারালাল বারের খুঁটি তুলে এনে পিঠে দমাদম মারতে লাগল। মেরে মনের সাধ যখন মিটল, তখন শ্যামপুকুরের দল বললে, মন্মথ সাবাস! তুই মার খেয়ে আমাদের মেরে গেলি! এত মারখেয়ে ধূলো ঝেড়ে উঠতে পারে, এমন বীর বোধ হয় কলকাতায় নেই। ৪০ পৃ

(হিমালয়) পথে কোন গ্রামে সন্ধ্যায় উপস্থিত হওয়ার পর গ্রামের চত্বরে আড্ডা করিয়া স্বামীজিকে তামাক খাওয়াইবার জন্য আগুনের অন্বেষণে যাই। কোন পাহাড়ী আগুন দিল না। চত্বরে ফিরিয়া সকলে চিন্তাকুল হইলেন। আমি বলিলাম, একটি প্রবাদ আছে; গাড়োয়াল সরীখা দাতা নহীঁ। লাট্টা বগর দেতা নহীঁ॥

এই প্রবাদবাক্য অনুসারে বিকট চীৎকারে ধমক দিয়া সকলে বলিতে লাগিলাম, লকড়ী লে আও, আগ লে আও বলিতে বলিতে গাড়োয়ালবাসিগণ রুটি তরকারী কাঠ আগুন তামাক প্রভৃতি লইয়া আগমন করিল ও আমাদিগকে শান্ত হইবার জন্য মিনতি করিতে লাগিল। ৬৯ পৃ (এই প্রসঙ্গ অন্যত্রও আছে)

সর্দ্দার চতুর সিং একজন বৃদ্ধ আত্মীয়কে আমার সঙ্গে দিয়া আজমীরে পাঠান। ট্রেনে বৃদ্ধ একটি বেটুয়া হইতে আফিমের টুকরা খাইতে খাইতে চক্ষু বুজিয়া ঝিমাইতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বেটুয়ায় কি উত্তর পাইলাম, 'আমল—(আফিম)। আমি বলিলাম, আপনি আমল এত খান, এর গুণ কি? বৃদ্ধ চক্ষু বুজিয়াই উত্তর দিলেন, আমলকে চারগুণ হ্যায়, মহারাজ। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কি? তিনি বলিলেন, আম্‌লীকো কভী কুত্তা কাটে নহীঁ, ওহ কভী জল মে ডুবে নহীঁ, উসকো ঘরমে চোর আওয়ে নহীঁ, ঔর উসপর কামিনীকো নজর লাগে নহীঁ। কারণ আফিমখোর লাঠি ছাড়া চলে না, জল ব্যবহার করে না, সারারাত জাগিয়া থাকে—তাই চোর আসিতে পারে না ইত্যাদি।

তারপর আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, মহারাজ ব্রিটিশরাজ্যে আমি বড় ভাল নেই। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, দেখুন জমিদারী যা ছিল, বাঁটোয়ারা হতে হতে শূন্য বখরা পেলুম। এদিকে খরচপত্র ত চালান চাই। তখনকার কালে তলোয়ারখানা নিয়ে বেরুলুম, কিছু রোজগার করে আনলুম। জিজ্ঞাসা করিলাম, কেমন করে? বলিলেন, এই রাহাজানি করে। তাইতে কিছুদিন চলল। তারপর আবার বেরুলুম। এমনি করে চলত মহারাজ! ব্রিটিশ রাজ্যে এখন তা হবার জো নেই। ৬২ পৃ

সারদার সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং তাহার সহিত আজমীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। তারপর সারদা অসুস্থ হইয়া পড়ায় আমাকে তাহার সেবা করিতে হইল।...আরোগ্য লাভ করিয়া সারদা খাণ্ডোয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। কিন্তু উভয়েই কপর্দ্দক শূন্য। আমি নিজের জন্য চিন্তিত ছিলাম না, কিন্তু সারদা অসুস্থ পদব্রজে যাইতে অক্ষম। লজ্জায় অর্থ ভিক্ষা করিতে না পারিয়া বাঙ্গালী বাবুদিগকে বলিলাম, মশায় আমরা পরশু রওনা হইব। ভাবিয়াছিলাম ইহারা রওনা হইবার কথা শুনিয়া আপনা হইতে ভাড়াটা দিতে চাহিবে। কিন্তু সকলেই বলিতে লাগিল, বেশ, মশায় বেশ। কেহ এক কপর্দ্দকও দিবার নাম করিতে চাহে না। অথচ পরশু সন্নিকট, ক্রমে আসিয়াও উপস্থিত হইল। তখন আমি বলিতে লাগিলাম মশায় আমরা কাল যাব। এবারও সকলে বলিলেন, তা বেশ তা বেশ। ৬৪ পৃ

নর্ম্মদা সঙ্গমে এক গ্রামে এক গৃহস্থ চাষার বাড়ীতে অতিথি হই। আহারাদির পর গৃহস্থ তাদের ভাঙ্গা একখানি ঘরে আমাকে বসাইয়া সগোষ্ঠী ক্ষেত্রে শস্য আনিতে গেল। বাড়ীর সমস্ত ঘর খোলা রহিল। গৃহস্থ সমস্ত দিন ফিরিতেছে না দেখিয়া ভাবিলাম, ইহাদের কি বিশ্বাস, একজন অপরিচিত সাধুর হস্তে ঘর সংসার অর্পণ করিয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় তাহারা ফিরিলে বাড়ীর প্রাচীনা গৃহিণীকে বলি, মা আমি অপরিচিত লোক, আমাকে এত বিশ্বাস করে, একেলা কেমন করে সমস্ত দিন ঘর সংসার ফেলে গেলে?

উত্তরে বৃদ্ধা বলিল, বাবা কিছুদিন পূর্ব্বে তোমারই মত এক সাধুকে ঘরে রেখে আমরা এই রকম ক্ষেতে যাই। পরে ফিরে এসে দেখি, সাধু নেই।

অনেক খুঁজে দেখলাম, কোথাও পেলাম না। শেষে মনে পড়ল, যে খাটিয়ায় সাধু বসেছিলেন তার গদির নীচে প্রায় ৩০্ টাকা দামের একগাছি রূপোর অনন্ত ছিল। খুঁজে দেখলাম সাধুর সঙ্গে রূপোর অনন্তও গেছে। সাধুর ভেক দেখলে সাধু বলে গ্রহণ করাই গৃহস্থের ধর্ম্ম, কপট ভাবলে অধর্ম্ম হয়। আমি তাঁকে বিশ্বাস করে গৃহস্থের ধর্ম্ম রক্ষা করেছি। কিন্তু সাধু সাধুর ধর্ম্ম রক্ষা করেন নি। আমার ৩০ টাকার অনন্ত গিয়েছে, আমি তো তার জন্যে কাঙ্গাল হইনি। ৬৬/৬৭ পৃ

মাস্তবী হইতে নারায়ণ সরোবর॥ আমাকে সেই পথে গমনোন্মুখ দেখিয়া এক দোকানী বলিল, এ পথে লোকালয় পাবে না। মধ্যাহ্নে তুমি জমনওয়ারা তলাও (সরোবর) পাবে, সেইখানে স্নান করিও। তোমার জলযোগের জন্য একটু গুড় ও চালভাজা দিতেছি এই থানে. পশ্চিম দেশবাসী এক তৈর্থিক 'ভকত' আমার অনুসরণ করিল, বলিলাম, তুমি কেন এই ডাকাতের পথে আসছ। ভকত বলিল, তোমার সৎসঙ্গে বড় আমোদ পেয়েছি। ভকত পশ্চিমদেশবাসী হইলেও অতিশয় ক্ষীণজীবী—সঙ্গে দুমুখো এক ছেঁড়া-খোঁড়া থলি। উভয় চলিতে লাগিলাম॥ দুই পাশে মাঠ। জনমানব নাই, লোকালয়ের চিহ্নও নাই। মধ্যাহ্নে অর্দ্ধপথে দুইজনে পূর্ব্বোক্ত সরোবরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। উভয়ে স্নান করিলাম ও দোকানী প্রদত্ত চালভাজা ও গুড় দুইজনে ভাগ করিয়া খাইলাম। চালভাজা খাইয়া ভকত বলিল, মহারাজ দো টিক্কড় (মোটা রুটি) লাগা লুঁ। আমি ত অবাক এখানে টিক্কড় কোথায়? বলিলাম, ময়দা কোথা পাবে যে টিক্কড় লাগাবে, ভকত তখন ভোজবিদ্যা বলে সেই ছিন্ন থলির ভিতর হইতে অর্দ্ধ আটা, তাওয়া (চাটু) লবণ ইত্যাদি বাহির করিয়া ফেলিল এবং একটু এদিক ওদিক ঘুরিয়া শুষ্ক গোময়ও সংগ্রহ করিল। অবিলম্বে সিদ্ধহস্ত ভকতের টিক্কড় বানান হইয়া গেল। উভয়ে গুড় দিয়া রুটি খাইতেছি। এমন সময় কতকগুলি ছাগল ভেড়া লইয়া এক রাখাল বালক উপস্থিত। ভকত বলিল, মহারাজকে একটু দুধ দে না, শুকনো রুটি খাচ্ছেন। রাখাল বালক বলিল, বেশ ত, দুধ দুয়ে যদি নিতে পার, নাও। ৭১ পৃ

(নারায়ণ সরোবরের পথে) ডাকাতরা তন্ন তন্ন করিয়া আমার বস্ত্র ও

আলখাল্লার পকেট খুঁজিতে লাগিল। ইত্যাবসরে ভকত আসিয়া উপস্থিত। সেই ভীষণ দৃশ্য, মুক্ত অসি প্রভৃতি দেখিয়া কাতর স্বরে বলিয়া উঠিল, হায় তো গয়ে...তাহার ভীত বিকৃত মুখের ভাব দেখিয়া সে ঘোর বিপন্ন অবস্থায়ও না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ডাকাতদিগকে বলিলাম, আমাকে যে জোরে ধাক্কা দিয়েছিল এ ক্ষীণজীবীকে সে রকম করলে মরে যাবে, তোরা ওর গায়ে হাত দিস্‌নি। ভকতকে বলিলাম, তোমার যা আছে ওদের সব দাও আমি তোমার বাসন কোসন সব করিয়ে দেব। সে কথা শোনেই বা কে, আর বিশ্বাস করেই বা কে। ভকত জোড় হস্তে ডাকাতদের বলিতে লাগিল, বাবারা আমার এ সকল জিনিসে হাত দিও না, আমি গরীব, আমার গেলে আর হবে না। দেখিলাম বেচারীর প্রাণের অপেক্ষা ছেঁড়া ঝুলির মায়া অধিক। ৭৪ পৃ

...এইরূপে কোনরূপে কোন এক গ্রামে উপস্থিত হইলে, সেই গ্রামের জমিদারের দেওয়ান বলিলেন, রাত্রে জ্যোৎস্না, দিনে বড় গরম। সুতরাং রাত্রে রাত্রে পথ চলা ভাল। তিনি ঘোড়া ও সিপাহী সঙ্গে দিলেন। সেই গ্রাম ও পরবর্তী গ্রামের মাঝখানে বিস্তীর্ণ মাঠ। সেখানে ডাকাতের ভয়। একমাস পূর্বে একটি কন্যা পিত্রালয় হইতে শ্বশুর বাড়ী যাইতেছিল, ডাকাতরা সেই মাঠে তাহাকে খুন করিয়া সব কাড়িয়া লয়। মধ্যরাতে আসিয়াছি, এমন সময় সিপাহী হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক দেখিল। প্রশ্ন করায় বলে, একটা বদলোক গাছের আড়ালে লুকুল। আমার ভয় হইল। কিন্তু সিপাহী আশ্বাস দিল, ভয় নাই আমিও ওদের দলের; আমি থাকতে কেহ কিছু করবে না। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি ওদের দলের কি রকম। সে বলিল, তা নয়ত কি ঠাকুর জমিদারের কাছারীতে যা মাইনে পাই তাতে কি চলে? আমাদেরও ডাকাতের সঙ্গে মাঝে মাঝে মিশতে হয়। আমি ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ইষ্ট দেবতার নাম জপিতে লাগিলাম। ডাকাতই রক্ষক কিন্তু সিপাহী অভয় দিতে লাগিল। শেষরাত্রে এক গ্রামে পৌছিয়া ধরমশালায় বাস করিলাম।

সিপাহী আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, সাধুর সঙ্গে পথ চলা বড়ই খারাপ। আপনি সাধু রয়েছেন, তা না হলে আমার ঘোড়া উপবাসী থাকে?'

ঐ বাড়ীর ভিতরে ঘাস আছে, আপনি না থাকলে আমি অনায়াসে পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে চুরি করতাম। ৭৮ পৃ

মাদুরাবাসী জনৈক বেদজ্ঞ দ্রাবিড় পণ্ডিত ব্রাহ্মণ—তিনি যখন শতমুখে বঙ্গদেশের এইরূপ প্রশংসা করিতেন, তখন একদিন আমি তাঁহাকে বলিলাম, মহারাজ, বাঙ্গালীরা অতিশয় মাছ খায় তা আপনি কি জানেন না?··· ···এই কথা শুনিয়া তিনি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের একটি মন্ত্র শুনাইলেন। মন্ত্রটি সম্পূর্ণ মনে না থাকিলেও তাহার আরম্ভ—অগ্নে স্ত্রয়ো জ্যায়াষাংশো ভ্রাতরাসন, —তে দেবেভ্যো হব্যং বহন্তঃ প্রমীয়ন্ত···এবং তাহার শেষে আছে, ধিয়া ধিয়া ত্বা বধ্যঃ স্যুঃ।...গল্পটি এই। অগ্নির একটি নাম হব্যবাহন। দেবতাদিগের হবিবহনের ভার অগ্নির তিনজন বড় ভাই হবি বহন করিতে করিতে মারা পড়েন। অগ্নি সেই ভয়ে ভীত হইয়া একটি জলাশয়ে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন। তিনি ভাবিলেন, তিন ভাই-এর যখন এই পরিণাম হইল তখন একা আমি আর কতদিন হবি বহন করব। অচিরে আমার পরিণামও ঐ রকম হবে। ওদিকে দেবতারা কয়েকদিন যাবৎ অভুক্ত থাকিয়া দলবদ্ধ হইয়া মর্ত্ত্যে অগ্নিকে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দেবতাদের ভয়ে অগ্নি যে জলাশয়ে লুকাইয়া ছিলেন, দেবগণ সেইখানে উপস্থিত হইলে, কতকগুলো মাছ জলের উপর মুখ বাড়াইয়া লুক্কায়িত অগ্নির কথা দেবগণকে বলিয়া দিল। মাছগুলা উপযাচক হইয়া অগ্নিকে ধরাইয়া দেওয়ায় অগ্নি একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া এই অভিশাপ দিলেন, তোরা যেমন উপযাচক হয়ে আমাকে ধরিয়ে দিলি তেমনি তোরা মর্ত্ত্যে নানাপ্রকারে বধ্য হয়ে থাকবি, লোকে খুঁজে খুঁজে কৌশল করে তোদের মারবে। তারপর বলিলেন, বঙ্গবাসীরা ত বৈদিক অনুশাসন মেনেই চলে। ৮৫ পৃ

(খেতড়ি) রাজসভায় নিত্য সন্ধ্যায় বেদান্ত আলোচনা করিতাম। রাজার এক মোসাহেব একদিন বেদান্ত আলোচনার সময় রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, আপ তো জানতে হী হ্যাঁয়। অর্থাৎ আমি বেদান্ত সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিতেছি, রাজা সে সবই অবগত। এইরূপ নির্লজ্জ তোষামোদ আমার সহ্য হইল না। হিন্দীতে বলিয়া উঠিলাম, ইনি সব জানেন কি বলছ? রাজা কি জানতে পারেন? একজন সন্ন্যাসী আশী বছর

সারা জীবন, দিনরাত চর্চ্চা করেও যে বেদান্ত জানতে পারে না তোমাদের রাজা দিনরাত খেলাধূলা, রঙ্গ তামসায় মত্ত থেকে তা জেনে ফেলেছেন। আমাদের দেশের বড় লোকদের এই রকম খোসামোদ করে করেই তোমরা জাহান্নামে দিয়েছ। এ বেদান্ত ঠাট্টার কথা নয়। এর এক প্রমেয় গ্রন্থই তিন লক্ষ। যদি তোমরা এঁর সামনে ইনি কিছু জানেন না, কিছুই জানেন না, এই রকম বল, তাহলে এঁর মনে ধিক্কার আসবে, তখন কিছু জ্ঞানলাভ করবার যত্ন হবে। সমস্ত সভা স্তব্ধ। রাজা বলিতে লাগিলেন দুরুস্ত দুরুস্ত (ঠিক)। ১১০ পৃ

ট্রেনে উদয়পুরের মহারাজার প্রধানমন্ত্রীর ভাইপোর সহিত পরিচয় হয়। ভাইপো বাংলা জানেন, বলিলেন টড সাহেবের রাজস্থান অবলম্বন করে বাংলায় যে সকল নাটক লেখা হয়েছে মহারাণার সেই সকল শুনতে ইচ্ছা হওয়ায় আমি বাংলা শিখে রাণাকে সে সকল পড়ে ও অনুবাদ করে শোনাতাম। শুনতে শুনতে রাণা উচ্চহাস্য করে বলতেন, বাঙ্গালী বাবুরা আমাদের বাপ দাদাদের একেবারে বাঙ্গালী বানিয়েছে। রাণাপ্রতাপের প্রিয় অশ্ব চেঠখ—তাহার নাম দিয়েছে কিনা চৈতক। ১১৬ পৃ

...এক সময় এক নাগা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ লঙ্কায় এখন কার রাজ্য? বলিলাম, কেন ইংরেজের! নাগা চক্ষু লাল করিয়া বলিল, কখনও না। বিস্মিত হইয়া বলিলাম, সে কি। শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি অযোধ্যা যদি ইংরেজ রাজত্ব হয়, তা হলে রাবণের রাজ্য লঙ্কা সেরূপ হওয়া বিচিত্র কি? নাগা দৃঢ়স্বরে বলিলেন, কভী নহী। ওহ্ বিভীখন কা রাজ্য হ্যায়। আর বলিল, তোমার খ্রীষ্টানী মত আমরা শুনতে চাই না। ১১৯ পৃ

আলম বাজারে মঠ।। মঠে আমরা প্রায় ডাল, ভাত চচ্চড়ী মাত্র খাইতাম। ... একদিন কোন ভদ্রলোক ঠাকুর সেবার জন্য খানিকটা দুধ পাঠাইয়াছিলেন। ইহা যে বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়ার মতন হইল। আহারে বসিবার পূর্ব্বে আমরা বলাবলি করিতে লাগিলাম আজ ঠাকুরের দুধ প্রসাদ আছে। দুধ খেলে বল হয়। আমাদের পাতে এক হাতা

ভুখ পড়িতে না পড়িতেই চারিদিকে রব উঠিল। কি হে বল পাচ্ছ ও হে বল পাচ্ছ ত? ১৩৩ পৃ

...গাড়ী দেখিয়া আমার উদ্দেশে সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন আমি ব্যারাকপুর ষ্টেশনে যাব, আপনি আমার সঙ্গে চলুন, ভাটপাড়ার পথে আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাব। ...যাইতে যাইতে অনেক কথাই হইল। তিনি বলিলেন আপনারাও কংগ্রেসের প্রচার কাজে যোগদান করুন। তাঁহার সেই কথার উত্তরে আমি বলিলাম, (১৩৮ পৃ) আপনাদের কংগ্রেস একটা মনস্ট্রাস হুজুগ বলেই আমার মনে হয়। বছরে তিনদিন খুব হৈ চৈ ভারী সমারোহ তারপর সব ঠাণ্ডা। দেশে সর্ব্বত্র কত নিরন্ন, বিপন্ন অসহায় লোক পড়ে রয়েছে। কই আপনারা তাদের কোন তো খোঁজ নেন না? আপনাদের কোন প্রচারককে চাষীর কুঁড়ে ঘরে দেখতে পাই না। আমার কথায় বিরক্ত হইয়া তিনি বলিলেন আপনি কি ভগবানের মত একা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র থাকতে পারেন। ১৩৭ পৃ

মহোৎসব॥ এই বৎসর ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের উৎসবে আর একটা বড় মজার ব্যাপার ঘটিয়াছিল। কলিকাতা শহরের অনেকেই প্রতি বৎসর মহোৎসবের দিন দক্ষিণেশ্বরে যান। সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগকে দলবদ্ধ হইয়া ঠাকুরের উৎসবে আসিতে দেখিয়া সাধারণে বলিতে লাগিল যে, এ মহোৎসবও আর একটি 'দ্বাদশ গোপাল' হইয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া স্বামী ত্রিগুণাতীত কয়েকজন ভক্ত ছেলেদের সাহায্যে ইহা নিবারণ করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইলেন। মেসার্স হোর মিলার কোম্পানির কয়েকখানি স্টীমার বেলা আটটা হইতে রাত্র দশটা পর্য্যন্ত হাটখোলা ঘাট হইতে যাত্রিগণকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিত। গৃহী ভক্ত রামদয়াল চক্রবর্তী ঐ কোম্পানীর একজন ঠিকাদার ছিলেন। উহার তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহার উপর থাকিত। ত্রিগুণাতীত তাঁহাকে বলিয়া দিল যে স্ত্রীলোকদিগকে যেন টিকিট দেওয়া না হয়। পরে চিৎপুর রোডের জোড়াসাঁকো পর্য্যন্ত কিছুদূর অন্তর অন্তর রাস্তার এপার ওপার সালুর উপর সাদা কাপড়ে বড়বড় অক্ষরে দক্ষিণেশ্বরের মহোৎসবে স্ত্রীলোক মাত্রই কেহ যাইবে না। এইরূপ তৈয়ারী করাইয়া—বড়দিনে যেমন হয় বড় বড় গাঁদার মালায় কমলা নেবু, লুচি, জিলাপী প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য ও শাক-শব্জীর সহিত

মুড়ো খ্যাংরা, ছেঁড়া জুতা, ফুটা হুঁকো প্রভৃতি রাস্তার এধার হইতে ওধার পর্য্যন্ত টাঙ্গাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি ও তাঁহার সহকর্মিগণ শহরের স্থানে স্থানে স্ত্রীলোকদের উৎসবে আসিতে নিষেধ করিয়া বড় বড় প্লাকার্ড ও দেওয়ালে আঁটিয়া দিয়াছিলেন। তাহারা এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন যে, এইবার স্ত্রীলোকের দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার পথ বন্ধ হইল।

...দলে দলে স্ত্রীলোকদের পদব্রজে আসিতে দেখিয়া ত্রিগুণাতীত সহকর্মিগণের উপর ফটক বন্ধ করিবার আদেশ দিল। এদিকে দলে দলে মেয়েরা স্টীমার হইতে নামিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে যথেচ্ছা বিচরণ করিতে লাগিল... তখন গিরিশবাবুর অনুরোধে প্রধান ফটক খুলিয়া দিবা মাত্র হুড় হুড় করিয়া বাঁধভাঙ্গা জলস্রোতের মত মেয়েরা আসিয়া কালীবাড়ী ভরিয়া ফেলিল। ১৫৭ পৃ

ভূতের বাড়ী ॥ আর এক দিনকার এক মজার কথা। আমি তখন এ দেশেই ছিলাম না। শুনিয়াছি, সেদিন মঠে বাগবাজার হইতে স্বামী যোগানন্দ, প্রেমানন্দ, সারদানন্দ প্রভৃতি অনেকেই আসেন এবং মঠে রাত্রি-বাস করেন। ভিতরে পশ্চিম দিককার কুঠরিতে বোধ হয় পাঁচজন ছিলেন। বাহিরে বড় ঘরে সারদানন্দ ও সদানন্দ (স্বামীজীর প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য) ছিলেন। গভীর রাত্রে, ছাদের উপর গড়্ গড়্ গড়্ গড়্ শব্দ হইতে লাগিল। সেই শব্দ শুনিয়া শুইয়া শুইয়া সকলে বলাবলি করিতে লাগিলেন, ওহে, এ যে সেই ভূতের ভাঁটা খেলার মত। ও দাদা! ও রামকৃষ্ণানন্দ বলি ভাঁটার খেলা দেখাতে আনলে নাকি হে? প্রেমানন্দ বলিলেন, ও দাদা! ও যোগেন! ইত্যাদি। তখন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া একটা বড় লাঠি লইয়া তোর ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ কচ্ছি। বলিয়া মার মার শব্দে দুপ দুপ করিয়া একেবারে ছাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখেন, এক জোড়া ভাম্বেল আর একটা হারিকেন লণ্ঠন জ্বলিতেছে। তিনি বলিয়া উঠিলেন, আরে ভূত হারিকেন নিয়ে ভাঁটা খেলে নাকি। এই বলিয়াই তিনি সদর বাড়ীতে সারদানন্দের ঘরে গিয়া তাঁহাদের ধরিলেন। অনর্থক ভয় পাইবার জন্ত প্রেমানন্দ সেবানন্দ তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি অপ্রস্তুত হইলেন। ১৬৫ পৃ

আচ্ছা মহাশয়, আপনি মহা প্রতিভাশালী দিগগজ পণ্ডিত, স্বদেশের

উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ না করে হাইকোর্টের সামান্য উকিলের কাজে আত্মনিয়োগ করছেন কেন? ইহা শুনিয়া তিনি (স্যার আশুতোষ) উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ চিত্তে বলিলেন, একশ বছরের মধ্যে এদেশের কোন উন্নতি হতে পারে না? আমার হাইকোর্টের জজ হবার সম্ভাবনায় দেশের একজন নেতা প্রতি সপ্তাহে তাঁহার সংবাদপত্রে আমার নামে কুৎসা রটনা করে থাকেন। যে দেশের নেতা স্বদেশবাসীদের উন্নতির পথে কণ্টক রোপন করেন, সে দেশের ভাল হাওয়া কি কখনও সম্ভব। তাহার সঙ্গে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এই পর্য্যন্ত আলাপ হইয়াছিল। ১৭৩ পৃ

আমাকে তেতলায় যাইতে বলিলেন। তেতলায় যাইতে যাইতে দেখিলাম সিঁড়ির দুই ধারে স্তরে স্তরে গাদা করা কত পুস্তক যে রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নেই। প্রত্যেক টেবিলের উপর পুস্তকের স্তূপ। তেতলার ঘরে গিয়া বসিতেই অন্দর হইতে আশুবাবু আসিলেন। কথা প্রসঙ্গে আমি বলিলাম পাটনায় খোদাবক্সের গ্রন্থাগারের মত তিনি একটি সাধারণ গ্রন্থাগার করিলে উহা বঙ্গে তাঁহার গৌরব স্বরূপ হইতে পারে। ইহা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন ছেলেরা যে বেচে খাবে মশায়। ১৭৩ পৃ

একদিন আহারাদির পর রামকৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি আমরা কয়জন বাহিরের ঘরটায় বসিয়া গল্প-গুজব করিতেছি। এমন সময় কাশীর শালগ্রাম-গেলা গৈরিকধারী একদল যাদুকর আসিয়া উপস্থিত। তাহাদের গায় কাঁথার মত মোটা বুকচেরা গৈরিক আলখাল্লা, হাতে দরিয়াই নারিকেলে'র কমণ্ডলু। তাহারা আসিয়া ডান হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বলিতে আরম্ভ করিল, ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, প্রেমানন্দ, অখণ্ডানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ। আমি উহা-দিগকে চিনিতে পারিয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম, বলি নাম কটা কোথায় জানলে... এখানে ছুচ গলিবেনা ভাবিয়া তাহারা প্রস্থান করিল। এই শ্রেণীর সাধুবেশ-ধারীদের একটু পরিচয় দিয়া রাখি। ইহাদের প্রধান আড্ডা বারাণসী। উহারা গলার মধ্যে ছোট নুড়ি রাখিতে রাখিতে ক্রমে শালগ্রাম রাখার উপযুক্ত গর্ত তৈয়ার করে। ঐ স্থান হইতেই প্রয়োজন মত বাহির করিয়া দেখায়, আবার গিলিয়া গলার মধ্যে রাখে। গৃহস্থদের বাড়ী গিয়া মুখ হইতে শালগ্রাম বাহির করিয়া দেখায়। ভোগ লাগাইবার অছিলা ভাল ভাল

জিনিস খুব পেট ভরিয়া খায়। বাহির হইতে কোন গৃহস্থের তিনপুরুষের নাম জানিয়া, সেই গৃহস্থকে উহা শুনাইয়া বিস্মিত করে। পরে হয়ত গৃহস্থকে বলিয়া বসিল, একমাসের মধ্যে সর্পাঘাতে তোমার জীবন সংশয় ইহা শুনিয়া সে ভড়কাইয়া যায়। তখন, ভয় নাই দশ বিশ টাকা আমাকে দাও···পরে শুনিলাম, মঠে যাহারা আসিয়াছিল তাহারাই নাকি স্বামীজির বাড়ীতে গিয়া তাঁহার মাকে ঐরূপ অনেক কথা শুনাইয়া দশটি টাকা আদায় করে। ১৮৬ পৃ

(মিঃ টার্নবুল) টার্নবুলের একদিনকার একটা মজার গল্প বলি। আমেরিকার দুইজন ভদ্রলোক তাহাদের ধনী বন্ধুর আহ্বানে লণ্ডনে বেড়াইতে আসে। বন্ধু তাহাদিগকে লইয়া প্রথমেই লণ্ডনের পার্লামেণ্ট হাউস দেখায়। তাহা দেখিয়া তাহারা বলিল, ওঃ এর চেয়েও আমাদের ওয়াশিংটনের কংগ্রেস হাউস অনেক বড় ও ভাল। সেণ্ট পলস গীর্জা দেখিয়া তাহারা বলিল, এ আমাদের দেশের গীর্জার কাছে দাঁড়াইতে পারে না। এইরূপে লণ্ডনে যেখানে যায়, যাহা দেখে, কিছুতেই তাহারা আমেরিকার বড়াই করিতে ছাড়ে না। তখন লণ্ডনের ভদ্রলোক তাহাদিগকে ইটালীতে বেড়াইতে লইয়া গেল। ইটালীতে যাইয়া, এক রাত্রে মধুর সুরা পানে যখন তাহারা বেহুঁস, সেই অবস্থায় দুইখানি খাটিয়ায় করিয়া তাহাদিগকে লইয়া গিয়া এক নির্জ্জন সমাধি ভূমিতে রাখিয়া, একটু দূর হইতে তাহারা কি করে দেখিবার জন্য বিলাতী ভদ্রলোকটি বসিয়া রহিল। একটা টিমটিমে আলোতে সমাধি ভূমির বিজনতা পরিস্ফুট হইতেছিল। হুঁস হইতেই দুই জনে জাগিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে চারিদিক দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, Here is the day of Judgement! Hurrah for the Stars and Stripes! America is the first to wake up অর্থাৎ এই ত মহাবিচারের দিন সমাগত। আমেরিকার পতাকা জয়যুক্ত হউক। আমেরিকাই সর্ব্ব প্রথম জাগ্রত হইল। দেখিয়া শুনিয়া লণ্ডনবাসী ভদ্রলোক হার মানিলেন। ১৯০ পৃ

জ্ঞান মহারাজের সান্নিধ্যে। প্রকাশক প্রকাশচন্দ্র ঘোষ শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির। হাওড়া।

একবার এক ভক্ত জ্ঞান মহারাজকে প্রশ্ন করেছিলেন, মহারাজ এতো কষ্ট করে যে গেলেন এতে কী enjoy করলেন? তাতে মহারাজ হালকাভাবে

উত্তর দিয়েছিলেন। এই কষ্টটাই enjoy করলুম। ১১ পৃ

একজন আর একজনকে প্রশ্ন করছেন, এতো দেখাশোনা হল কিন্তু কিছুই ত হল না। এর কী উত্তর দেওয়া হল জানেন ?…এই জন্যেই ত হল না। ৫ পৃ

মহারাজ বললেন, স্বামীজী স্বামী বিবেকানন্দ হয়েছিলেন আমেরিকা যাবার সময়। তার আগে ত নরেন্দ্রনাথই ছিলেন। আর একটা নাম নিয়েছিলেন—বিবিদিষানন্দ। তারপর বিবেকানন্দ। ৪৮ পৃ

মহারাজের ঘরে খুব মশার উপদ্রব হয়েছে। আজ কেষ্টবাবু মশা মারার 'বোমশেল' এনে ঘরের মধ্যে ছেড়ে দিলেন। বললেন যে এর কোন খারাপ প্রতিক্রিয়া হবে না। শুনে মহারাজ বললেন, কিছু হবে না বললেই হলো, দম আটকে যাবার উপক্রম হয়েছে। এই বলে মহারাজ একটি দৃষ্টান্ত দিলেন, বললেন, এক বাড়ীতে হাঁপানি রুগী, সে বাড়ীতে আবার এক জনের কলেরা হয়েছে।

কলেরা তাড়াবার জন্য খুব গন্ধক জালালে। এদিকে গন্ধকের ধোঁয়ায় হাঁপানি রুগীর প্রাণ যায় আর কি কলেরা ত তাড়ান হচ্ছে। মহারাজ বিরক্তির স্বরে বলতে লাগলেন, ঐ (Spray) দিয়ে আমায় চান করিয়ে দাও, আমি দম আটকে মরি, কিন্তু মশা ত মারা হবে। ৫৬ পৃ

মহারাজ মন্তব্য করলেন, পূর্ণবাবু এখন বড় লোক হয়ে গেছেন হাতে টাকা রয়েছে, কী করবে, টাকা ঢালছে Contract দিচ্ছে। এসব কাজে জচ্চুরি এমনিই হয়। এমনি করেই এ কাজ হয়। কথায় আছে না দেখ (দেখিস) ত তোর না হলে মোর। ৬১ পৃ

কথা প্রসঙ্গে কেষ্টবাবু মহারাজকে বললেন, মহারাজ শম্ভুবাবু এখানে এলে ঘুমোন। ওর আবার নূতন থিয়োরি হয়েছে, বলেন মহাপুরুষের কাছে গেলে তাঁরা ঘুম পাড়িয়ে দেন। মহারাজ বললেন, আবার ভাঙিয়েও দেন বলেন না ? ৬১ পৃ

কেষ্টবাবু বললেন, মহারাজ আমার মনে একটা প্রশ্ন উঠেছে। মহারাজ সস্মিত মুখে বললেন, তোমার নিকুচি করেছে। ৮৭ পৃ

শক্তি যার ভেতর প্রকাশ পাবে সে ত আধার হিসেবে হবে। সীতা রামও ভগবান হতে পারেন, কেষ্টও হতে পারেন। সীতা রামও কি ছিল ? সে-ও ত হয়েছে। পাঁচ রকম হতে পারে। আপত্তি কি আপনাদের উল্লাসবাবু বললেন, আপত্তি আর কী যতক্ষণ আমাদের না হয় ততক্ষণ আপত্তি। ৮৯ পৃ

আজ মহারাজ সমবেত ভক্তদেরকে এক বিশেষ আম খাওয়ালেন, যেমন মিষ্টি তেমন সুস্বাদ। মহারাজ বললেন, এ আমের বিশেষত্ব হচ্ছে, এ আম মিষ্টি taste ভাল, ওর নাম এ্যালফানসো অটল মহারাজ বললেন, এ বুড়োর প্রসাদ মহারাজ বললেন, না মহাশয় ও আমি ছুঁইওনি। ৯১ পৃ

আগের এক রবিবারে পিঁপড়ের উপদ্রবের কথা হয়েছিল। আজও পিঁপড়ের প্রসঙ্গ এসে গেল। মহারাজ প্রশ্ন করলেন, হ্যাঁ মশায় আপনাদের কলকাতায় কি পিঁপড়ে নেই ? আমি ত পিঁপড়ের উপদ্রবে অস্থির হয়ে পড়েছি। পিঁপড়ে হয় কেন ? আমি বললাম, যেখানে মিষ্টি-টিষ্টি থাকে সেখানে পিঁপড়ে হয়। মহারাজ আমার কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করে বললেন, তাহলে ত খাবারের দোকানে পিঁপড়ে হবার কথা। খাবারের দোকানে পিঁপড়ে হয় ? যা হোক বাবা একটা ঝেড়ে দিলেন। 'কেষ্টবাবুর দৃঢ় অভিমত যে সন্দেশ পিঁপড়ের কারণ নয়,—এই কথা শশাঙ্কবাবু মহারাজকে জানাতে গিয়ে বললেন, উনি সন্দেশে পিঁপড়ে থাকার প্রশ্ন হেসেই উড়িয়ে দিচ্ছেন। মহারাজ বললেন, যাই হোক উনি হাসছেন ত ?...ওই ভাগ্যি ! ১০২ পৃ

কেষ্টবাবুর বন্ধু এক প্রবীণ ভদ্রলোক এসেছেন। তিনি মহারাজের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে চান। মহারাজ সে অনুমতি দিলেন না। ভদ্রলোক বললেন, আমার মনে দুঃখ রয়ে গেল। আপনি অনুমতি দিন চরণ স্পর্শ করব। মহারাজ বললেন, ঐ দুঃখ ছাড়া আর দুঃখ কি আপনার নেই ? তিনি কিন্তু মহারাজকে আরো অনুনয় করতে লাগলেন। বললেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে স্বামীজীর ইলেকট্রিসিটি আপনার মধ্যে রয়েছে। মহারাজ প্রশ্ন করলেন, তাতে কী হবে তিনি বললেন, আপনার চরণ স্পর্শ করলে ঐ ইলেকট্রিসিটি আমার মধ্যে প্রবেশ করবে, আমার উপকার হবে, আমার জীবন সার্থক হবে। ১০৪ পৃ

আবার কেষ্টবাবুর বন্ধু মহারাজকে বললেন, কেষ্টবাবুর সঙ্গতে আমার

উপকার হয়। এ কথায় মহারাজ বললেন, আমারও হয়। পর পরের সঙ্গতে পরকারের উপকার হয়। ১০৫ পৃ

মহারাজের বাবা একবার মঠে এসে দেখেন যে মহারাজ কুটনো কুটছেন। তাই দেখে তার বাবা বললেন, 'এই করতে এসেছিস তো বাড়ীতে গিয়ে করবি।' ১০৯ পৃ

১১৮ কেউ কেউ নিজেদের জনক ঋষির সঙ্গে তুলনা করেন। স্বামীজী (বিবেকানন্দ) বলতেন জনক ঋষির ঋষি বাদ দিয়ে অনেক জনক হতে পারেন।

গৌরীমা। দুর্গাপুরী

নদীয়া-বল্লভ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে গৌরীমা পতিভাবে ভজনা করিতেন। এই কারণেই নবদ্বীপ ছিল গৌরীমার অতি প্রিয় তীর্থ। তিনি বলতেন, 'ন'দে আমার শ্বশুর বাড়ী। এই সম্পর্ক লইয়াই তিনি সেখানে চলাফেরা করিতেন। পথে চলিতে চলিতে কোথাও নিত্যানন্দ প্রভুর মূর্তি নয়নগোচর হইল, লোকাচার মতে আপন ভাসুর ঠাকুর বোধে সেই স্থানে মুখে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিতেন।

শ্রীশ্রীমা যখন বৃন্দাবনে ছিলেন সেই সময় তাঁহার অনুমতি লইয়া যোগেন মা এবং স্বামী যোগানন্দ গৌরীমার সহিত কড়োলীর মদনমোহন দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। কড়োলী পৌঁছিবার পূর্ব্বে সন্ধ্যা হইয়া গেল। রাত্রিতে তাঁহারা পথিমধ্যে এক স্থানে বিশ্রাম করিতেছিলেন। রাত্র অধিক হইলে একটা লোক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। গৌরীমা এবং যোগেন মার মধ্যভাগে তাঁহাদের জিনিসপত্র ছিল; লোকটার উদ্দেশ্য ছিল চুরি করা। সে নিকটেই আনাগোনা করিতে লাগিল। গৌরীমা তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলেন। গৌরীমার গায়ে একটা আলখাল্লা ছিল। তিনি আস্তে আস্তে আলখাল্লার মধ্য হইতে দিয়াশলাই বাহির করিলেন। ইতিমধ্যে লোকটা তাঁহাকে নিদ্রিত মনে করিয়া তাঁহার মাথার নিকটে আসিয়া ঝুঁকিয়া পুঁটলিতে হাত দিবার উপক্রম করিতেছে ঠিক এমন সময় শায়িত থাকিয়াই গৌরীমা দিয়াশলাই জ্বালিলেন। লোকটার ছিল লম্বা দাড়ি, দিয়াশলাই জ্বলিতে সেই আগুন গিয়া ধরিল সেই দাড়িতে। গৌরীমা মার মার বলিয়া উঠিয়া

দাঁড়াইলেন। চোরটা ততক্ষণে চীৎকার করিয়া দুই হাত দাড়িতে চাপড়াইতে চাপড়াইতে দৌড়িয়া পালাইল। ১২১ পৃ

গোলমাল শুনিয়া সঙ্গিদ্বয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দাড়িতে আগুন লইয়া চোরকে পালাইতে দেখিয়া যোগেনমা এবং যোগানন্দ স্বামী হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। ১২১ পৃ

কলিকাতায় আর একবার তাঁহার প্রবল জ্বর হয়। সহোদর অবিনাশচন্দ্র তাঁহার সেবাশুশ্রূষার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করেন।…কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া গৌরীমা সহোদরের অল্পবয়স্ক এক পুত্রের সহিত ভাব করিয়া পলায়ন সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। বালক প্রথমত এই কার্য্যে সহায়তা করিতে অক্ষমতা জানাইয়া বলিল, আরে বাপরে বাপন জানতে পারলে মেরে হাড় গুড়ো করে দেবে।……অবশেষে পাঁচ টাকা পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইলেন, ইহাতে কার্য্য সিদ্ধি হইল।……সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার পূর্বেই বাড়ীর অন্য সকলের অজ্ঞাতে, গৌরীমা কলিকাতা ত্যাগ করিলেন। কিন্তু বালককে তখনই টাকা দিতে পারিলেন না, টাকা বাকি রহিল। পাঁচ টাকা পুরস্কার তখনই না পাইয়া বালক অসন্তুষ্ট হইল এবং পিতা আসিলে সকল কথা বলিয়া দিল। কিন্তু এই পুরস্কারের কথা সরল বালক অনেক দিন পর্য্যন্ত ভুলিতে পারে নাই। গৌরীমা যখন মহারাষ্ট্র দেশে ছিলেন, তাঁহার ঠিকানা জানিতে পারিয়া এক চিঠি লিখিয়া জানাইল, যোগিনীমা তুমি পাঁচ টাকা দিবে বলিয়াই আমি তোমাকে গাড়ী আনিয়া দিয়াছিলাম বাপনের গালমন্দ খাইলাম, অথচ টাকাও পাইলাম না। সেই টাকা পাঁচটা আমাকে না দিলে আর কখনও তোমার কথা আমি শুনিব না। ১৩২ পৃ

গৌরীমা

একদিন গৌরীমা বাহিরে গিয়াছেন, এমন সময় এক ভিখারী আসিয়া উপস্থিত হইল। গিরিবালা তাহাকে দান করিবার মত ঘরে কিছুই পাইলেন না। কতকগুলি আম গৌরীমা পৃথক করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন দামোদরের ভোগের জন্য। ঠাকুর দেবতার উদ্দেশে রক্ষিত কোন দ্রব্যের অগ্রভাগ ভোগের পূর্বে তিনি কাহাকে কখনও দিতেন না। গিরিবালাও তাহা জানিতেন। স্বামিজী সেই আমগুলি দেখাইয়া বলিলেন দিদিমা আঁব ত রয়েছে

কতকগুলো, দুটো ওকে দাও না। দিদিমা কন্যাকে ভালরূপে চিনিতেন, বলিলেন, আরে বাপরে, এক্ষুনি এসে প্রলয় ঘটাবে। গৌরীমার আচার-নিষ্ঠার বিষয় স্বামীজীও জানিতেন। তথাপি সরল প্রকৃতি দিদিমাকে একটু রঙ্গ করিবার জন্যে বলিলেন, তা বলে গরীব ভিকিরীকে শুধু হাতে ফিরিয়ে দেবে, দিদিমা? তাঁহার কথায় বৃদ্ধা দুই-তিনটি আম আনিয়া ভিকিরীকে দিলেন।

এদিকে গৌরীমা আসিবামাত্র, নিতান্ত ছেলেমানুষের মত তাঁহার নিকট স্বামিজী অভিযোগ করিলেন, ও গৌরীমা দেখেছ কাণ্ডটা! দিদিমা তোমার দামুর ভোগের ঐ আঁব ভিকিরীকে দিয়ে দিয়েছেন। দামুর ভোগ ওতে আর হবে না। ইহা শুনিয়া গৌরীমা গর্ভধারিণীর উপর অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁহার দোষে দামোদরের ভোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, বৃদ্ধা সেই জন্য কন্যার কথার কোন প্রতিবাদ করিলেন না। কিন্তু স্বামিজীর আচরণে তিনি অবাক হইলেন। তাঁহার মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারিয়া স্বামিজী মনে মনে কৌতুক বোধ করিতেছিলেন এবং এক সময় তাঁহাকে নিরালায় পাইয়া খুব সহানুভূতির সুরে বলেন, দেখলে ত দিদিমা, তোমার মেয়ের কাণ্ডটা! সামান্য দুটো আমের জন্য কি বকাটাই না ব'কলে! ১৬৭ পৃ

একবার গৌরীমা ও স্বামিজী তারকেশ্বর গিয়াছিলেন, সঙ্গে ছিলেন স্বামী যোগানন্দ এবং স্বামী অদ্বৈতানন্দ (বুড়ো গোপাল) তাঁহারা পদব্রজে গমন করেন। পথিমধ্যে একটি পুকুরের সিঁড়িতে বসিয়া গৌরীমা দামোদরের পূজা এবং ভোগ সম্পন্ন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পল্লীর কয়েকটি মহিলা আসিয়া তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় করিতে লাগিলেন। এ-কথা সে-কথার পর তাঁহারা গৌরীমাকে প্রশ্ন করেন, ওরা আপনার কে হন? তিনি উত্তর করিলেন, ওরা আমার ছেলে। স্বামী অদ্বৈতানন্দের বয়স ছিল বেশী। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া একজন মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁ মা, ঐ বুড়ো সাধুটিও আপনার ছেলে? গৌরীমা গম্ভীরভাবে বলিলেন, ওটি আমার সতীনপো। রাস্তা চলিতে চলিতে স্বামী অদ্বৈতানন্দকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বামিজী কৌতুকচ্ছলে বলিতে লাগিলেন, ভাগ্যিস বুড়ো হইনি, তা'হলে আমাকেও আজ সতীন পো হ'তে হতো। ১৬৭ পৃ

...স্বামী ব্রহ্মানন্দকেও একটি কোট দেওয়া হইয়াছিল। কোটটি দেখাইয়া

তিনি অনেকের নিকট আশ্রমকুমারীদিগের সুখ্যাতি করিয়াছেন। কোটের জন্য গায়ের মাপ আনিতে যে ব্যক্তি গিয়াছিলেন, তাহার নিকট রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন চৌধুরীর মেয়েকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দের পূর্ব্বাশ্রমের এক আত্মীয়া) বলো—আমার কোটে যেন অনেকগুলো পকেট থাকে, শিষ্যেরা প্রণামী দিলে তাতে রাখা যাবে। ২২৬ পৃ

একবার গৌরীমা শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। ষ্টেশনে আসিয়া দেখেন, বহুলোকের ভিড়। একস্থানে দেখা গেল, দুই দল লোকের মধ্যে তুমুল তর্ক আরম্ভ হইয়া গিয়াছে—কালী বড় না কৃষ্ণ বড়। ...সেখানে বসিয়াই তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবাজীরা আগমেশ্বরীতলার সেই কলার গল্প শুনেছ তোমরা ? গৌরীমা গল্প আরম্ভ করিলেন—

অনেক কাল আগেকার কথা। আগমেশ্বরীতলায় দুই ভাই বাস করতেন। বড় ভাই ছিলেন—গোপাল সাধক, ছোট ভাই ছিলেন—কালী সাধক। দুজনেরই খুব নিষ্ঠা আর ভক্তি , কিন্তু উভয়েই নিজ নিজ ইষ্ট দেবতাকে অন্যের ইষ্টদেবতা হতে বড় বলে মনে করতেন। এই নিয়ে ভায়ে ভায়ে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। মাঝে মাঝে তর্কও চলে। কিন্তু কে বড় কে ছোট তার আর কোন মীমাংসা হয় না। তাঁদের বাগানে নূতন একটা গাছে এক কাঁদি কলা শীগ্‌গিরই পাকবে, এই অবস্থা। দু'ভাই দু'বেলা লুকিয়ে লুকিয়ে তা দেখে যান, আর ভাবেন—কলার কাঁদি পাকলে ইষ্টদেবতাকে তা দিয়ে আগে ভাগে দেবেন। বড়ভাই একদিন দেখলেন, সেই কলাগাছের উপর একটা কাক বসেছে। তিনি মনে করলেন কলা পেকেছে, তাই কাক এসে বসেছে। কলার কাঁদিটা কেটে ঠাকুর ঘরে নিয়ে গিয়ে ঝুলিয়ে রেখে দিলেন। ছোটভাই বাইরে গিয়েছিলেন কি কাজে, ফেরার পথে দেখেন, গাছে কলা নেই। আর কোথায় যায়! বাড়ীতে ঢুকেই তিনি দাদার সঙ্গে কোঁদল সুরু করে দিলেন, আমি এদ্দিন ধরে কলার কাঁদি পাহারা দিচ্ছিলুম, পাকলে মাকে ভোগ দেবো, তুমি একবার আমায় জিজ্ঞেস না করে, সবই তোমার গোপালকে দিয়ে দিলে। বড় ভাই তাকে বুঝিয়ে বললেন, না ভাই, ভুল বুঝেছ। কাকে ঠুকরে এঁটো করলে, তাতে দেবতার ভোগ হয় না, তাই আমি কাঁদিটা কেটে এনেছি। গোপালকে ভোগ দিইনি এখনো। তা তুমি

তোমার মাকেই ভোগ দাও। ছোট ভাই চটেই আগুন, বলেন, চাইনে তোমার দান। তুমি গোপালের নাম করে এনেছ, তাঁকেই ভোগ দাও। আমার মায়ের ভোগ ওতে চলবে না। কলার মীমাংসা তাঁদের আর হলো না। তারপর দিন বড় ভাই ঠাকুরঘরে পূজো কচ্ছিলেন। অনেক দেরী দেখে ছোট ভাই ভাবলেন, দাদা নিশ্চয়ই গোপালকে আজ কলা ভোগ দিচ্ছেন। এজন্ম তার দুঃখুও হচ্ছিল, হিংসেও হচ্ছিল। তবু দাদা কি ভাবে গোপালকে নূতন গাছের কলা ভোগ দিচ্ছেন, সে দৃশ্য দেখবার লোভ সামলাতে না পেরে তিনি বাইরে থেকেই দরজাটা ফাঁক করে ভেতরে তাকালেন। ভেতরে যা দেখলেন, তাতে স্তম্ভিত হলেন, দেহ তাঁর কাঁপতে লাগলো। দেখলেন, তাঁর আরাধ্যাদেবী মা কালী দাদার গোপালকে কোলে বসিয়ে পরমস্নেহে কলা খাইয়ে দিচ্ছেন। এই না দেখে ছোট ভাই দাদা দাদা—মা মা বলে চীৎকার করে ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। ৩০০-৩০২ পৃ

গৌরীমা একবার বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত বাঘনাপাড়া গ্রামে গিয়াছিলেন, বলদেবজীর মন্দিরের সন্নিকটে একটা গাছতলায় তিনি থাকিতেন। নিকটেই ছিল একটা পুকুর। একদিন পুকুরের ধারে তিনি বসিয়া আছেন, কণ্ঠে দামোদর-লালজী। জনৈকা পল্লীবধূ সেই পুকুর হইতে তাঁহার সমক্ষে কিছু শাক তুলিয়া বাড়ী লইয়া গেলেন। রাত্রিতে বধূ স্বপ্ন দেখেন, একটি কৃষ্ণকায় বালক বলিতেছে, হ্যাগা তুমি কেমন লোক! অতগুলো শাক তুলে আনলে, আর আমি পুকুর ধারে বসে, আমায় চারটি খানি দিলে না। বধূ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই কে রে বাপু? বালক বলিল, বাঃ রে আমায় বুঝি আর দেখনি! আমি ত তোমাদের যোগিনী-মার কাছেই থাকি। বধূর দুঃখ হয়, আহা, ছেলেমানুষ চারটি শাক খেতে ইচ্ছে হয়েছিল, যোগিনীমার ভয়ে তখন বলতে সাহস পায় নি! পরদিন বধূটি কিছু শাক লইয়া গিয়া বলেন, হ্যাঁ যোগিনী মা আপনার এখানে কে একটি কালো ছেলে থাকে? আমার কাছে কাল চারটি শাক খেতে চেয়েছে। গৌরমা বলিলেন, নাঃ কৈ, এখানে আর কে থাকে। একজন বর্ষীয়সী মহিলা সেখানে বসিয়াছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন, তা আছে বৈ কি! ভারী দুষ্টু ছেলেটি। তাহার পর সেই মহিলা একটু রঙ্গ করিয়া গৌরী মাকে বলেন, যা হোক বেশ লোক ত তুমি! এতকাল ঘর কচ্ছ। আর কালো ছেলেটি কে বুঝতে পারলে না?"

সকলের চমক ভাঙ্গিল তাঁহার কথায়। বধূটিও বুঝিতে পারিলেন, যোগিনী মার দামোদর ঠাকুরই বালকবেশে তাঁহার নিকট শাক চাহিয়াছেন। তিনি তখন দামোদরের সম্মুখে শাক রাখিয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন।

বিস্ময় ও অভিমানে গৌরী মা দামোদরকে বলেন, কেন ঠাকুর আমি কি তোমায় চারটি শাক খাওয়াতে পারতুম না, যে পরের কাছে চাইতে গেলে।

যোগিনী মার দামোদর ঠাকুর এক বধূর নিকট শাক চাহিয়া খাইয়াছেন, এই কথা লোকের মুখে মুখে গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইয়া গেল। দামোদরকে দর্শন করিবার জন্য দূর দূরান্তর হইতে লোকে শাক লইয়া আসিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে গাছতলায় শাক স্তূপীকৃত হইল। শাকের সঙ্গে অন্যান্য উপকরণও আসিল। বাঘনাপাড়ায় কয়েকদিন ধরিয়া দামোদরের শাকের উৎসব চলিল। ৩৩৪ পৃ

শৈলবালা চৌধুরী : ১৩১৫ সালের দোলের দিন মা অনেককে প্রসাদ পাইতে বলিয়াছিলেন। দামোদরের ভোগ সমাপ্ত হইলে কয়েকজন প্রসাদ পাইয়া গিয়াছেন, এমন সময় মা আমায় বলিলেন, শৈল সকলের পাতা করে দে আমি তখন পাতা করিলাম না, অন্য কাজে গেলাম। তাহাতে মা একটু জোরে আবার পাতা করিতে বলিলেন। পূর্বে পাতা করি নাই, ভাবিয়াছিলাম, এত লোক—ঐ হাঁড়ির খিচুড়িতে কি প্রকারে হইবে? আর এক হাঁড়ি খিচুড়ি বসান হইলে তারপর পাতা করিব। তখন আমার মনে অভিমান হইল, কারণ মা জোরে বলিয়াছেন। এই অভিমানবশতঃ যেখানে যত জায়গা ছিল সমস্ত পাতা করিয়া দিলাম। আর মনে মনে ভাবিতেছি, বেশ তো, আমায় পাতা করিতে বলিলেন, করিয়া দিলাম; এত লোকের ঐ এক হাঁড়ির খিচুড়িতে কি প্রকারে হইবে, দেখিব। আমার দৃষ্টি সেই দিকেই রহিল।

যখন সকল লোকের খাওয়া হইয়া গেল, তখন মা আমায় বলিলেন, শৈল তুই বোস, আর ঝিকেও পাতা করে দে আমায় প্রসাদ দিলেন···মা আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আর নিবি? আমি বলিলাম 'না' ভাবিলাম মার হাঁড়িতে বোধ হয় আর নাই, কম পড়িবে, আর লইব না। আমার খাওয়া হইয়া গেলে মা আমায় ডাকিলেন, বলিলেন, "এই ছাখ, এখনও খিচুড়ি হাঁড়িতে

আছে।" তখনও হাঁড়িতে খিচুড়ি দেখিয়া আমি অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহা দেখিয়া মা আমায় বলিলেন, উনানে আগুন থাকলে কম পুড়ে না, যখন উনানের আগুন নিভে যায় তখন আর হয় না। ৩৩৩—৩৬ পৃ

জগা খিচুড়ি সম্বন্ধে গৌরীমা এক গল্প করিতেন। জগা নামে এক পাগলা ছিল। কালীঘাটে মায়ের মন্দিরের এক পাশে সে থাকিত। সারাদিন পাগলামি করিয়া বেড়াইত, রাত্রিতে সাধনভজন করিত। দিনের বেলায় ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইত, দিনান্তে তাহা একত্রে সিদ্ধ করিত। চাল ডাল তরকারী, ঘি তেল লবণ লঙ্কা সবই এক সঙ্গে সিদ্ধ হইত। রান্না করিয়া মন্দিরের দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া মায়ের উদ্দেশে তাহা নিবেদন করিত। তারপর রাস্তার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ডাকিয়া সকলে পরম আনন্দে সেই প্রসাদ গ্রহণ করিত। একদিন সকালবেলা জগা সৈনিকের বেশ ধারণ করিয়া পাড়ার ছেলেদের জড় করিল। তারপর গলায় একটা টিন বাঁধিয়া বাজাইতে লাগিল, আর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, 'যম জিনিতে যায় রে জগা, যম জিনিতে যায়। সেই দিন মায়ের সমক্ষে জগা নশ্বর দেহ ত্যাগ করিল। বৃদ্ধরা বলিতেন, জগা পাগল ছদ্মবেশে সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন। ১২৮ পৃ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। শ্রীম কথিত।

ঠাকুর শ্রীমকে বলিলেন, দেখ তোমার লক্ষণ ছিল ভাল, আমি কপাল চোখে এসব দেখলে বুঝতে পারি—আচ্ছা তোমার পরিবার কেমন? বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি!

মাষ্টার, আজ্ঞা ভাল তবে অজ্ঞান

ঠাকুর, আর তুমি খুব জ্ঞানী

ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান।

মাষ্টার, যারা মাটির প্রতিমা পূজা করে তাদের বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নয়।

ঠাকুর, তোমাদের কলকাতার লোকের ওই এক, কেবল লেকচার দাও, আর বুঝিয়ে দাও।—২৪ পৃ

ঠাকুর, ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, তবে ভাল লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে, মন্দ লোকের কাছ থেকে তফাৎ থাকতে হয়। বাঘের ভিতরেও নারায়ণ আছেন তা বলে বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে না। ৩০ পৃ।

বদ্ধজীব যখন মরে তার পরিবার বলে, তুমি ত চল্লে আমার কি করে গেলে! আবার এমনই মায়া যে প্রদীপটিতে বেশী সলতে জ্বললে, বদ্ধজীব বলে, তেল পুড়ে যাবে সলতে কমিয়ে দাও। এদিকে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছে। ৩৫ পৃ

বদ্ধজীবেরা ঈশ্বর চিন্তা করে না। যদি অবসর হয় তাহলে হয় আবোল তাবোল ফালতো গল্প করে, নয় মিছে কাজ করে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, আমি চুপ করে থাকতে পারি না, তাই বেড়া বাঁধছি। হয়ত সময় কাটে না দেখে, তাস খেলতে আরম্ভ করে। ৩৫ পৃ

বিভীষণ একটি খাতায় নাম লিখে, পাতাটি একটি লোকের কাপড়ের খুঁটে বেঁধে দিছল—লোকটি সমুদ্র পারে যাবে। বিভীষণ বল্লেন তোমার কোন ভয় নেই, তুমি বিশ্বাস করে জলের উপর দিয়ে চলে যাও। লোকটিও বেশ সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল। এমন সময় তার ভারী ইচ্ছে গেল যে কাপড়ের খুঁটে কি বাঁধা আছে একবার খ্যাখে, খুলে খ্যাখে যে কেবল রামনাম লেখা রয়েছে।

তখন ভাবলো এ কি! শুধু রাম নাম একটি লেখা রয়েছে। যেই অবিশ্বাস, অমনি সে ডুবে গেল। ৩৬ পৃ

মাষ্টার ঘরে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়াই ঠাকুর উচ্চহাস্য করিয়া ছোকরাদের বলিয়া উঠিলেন, ঐ রে আবার এসেছে! বলিয়াই হাস্য। সকলে হাসিতে লাগিল। মাষ্টার আসিয়া ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন, আগে হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইয়া প্রণাম করিতেন—ইংরাজি পড়া লোকেরা যেমন করে।

মাষ্টারের আগমনে ঠাকুর কহিলেন, খ্যাখ একটা ময়ূরকে বেলা চারটের সময় আফিম খাইয়ে দিছিল, তারপর দিন ঠিক চারটের সময় ময়ূরটা উপস্থিত আফিমের মৌতাত ধরেছিল—ঠিক সময়ে আফিম খেতে এসেছে। ৪০ পৃ

ঠাকুর এদিকে ছোকরাগুলির সহিত অনেক ফষ্টিনষ্টি করিতে লাগিলেন, যেন তাহারা সমবয়স্ক...ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দ করিতেছেন ও মাষ্টারকে এক একবার দেখিতেছেন, দেখিলেন তিনি অবাক হইয়া বসিয়া আছেন, তখন

রামলালকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দ্যাখ এর একটু উমের বেশী কিনা, তাই একটু গম্ভীর, এরা এত হাসিখুসী করছে, কিন্তু এ চুপ করে বসে আছে। মাষ্টারের বয়স তখন সাতাশ বৎসর। ৪১ পৃ

ঠাকুর এই গান গাহিতেছেন। আবার সেই সমাধি, আবার নিস্পন্দ দেহ, স্তিমিত লোচন, দেহস্থির। বসিয়া আছেন, ফটোগ্রাফে যেরূপ ছবি দেখা যায়, ভক্তেরা এইমাত্র এত হাসিখুসী করিতেছিলেন, এখন সকলেই একদৃষ্টি হইয়া ঠাকুরের সেই অদ্ভুত অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছেন।...অনেকক্ষণ পরে ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে···চক্ষের কোণ দিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ঠাকুর রাম রাম এই নাম উচ্চারণ করিতেছেন। মাষ্টার ভাবিতে লাগিলেন, এই মহাপুরুষই কি ছেলেদের সঙ্গে ফচ্‌কিমি করিতেছিলেন? ৪২ পৃ

মাষ্টার ও নরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া ঠাকুর বলিলেন, তোমরা দুজনে ইংরাজীতে কথা ক'ও ও বিচার করো, আমি শুনবো। মাষ্টার ও নরেন্দ্র উভয়ে এই কথা শুনিয়া হাসিতেছেন। দুজনে কিছু কিছু আলাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাঙ্গলাতে।...ঠাকুর আর একবার জিদ করিলেন, কিন্তু ইংরাজীতে তর্ক করা হইল না। ৪২ পৃ

আরতি হইয়া গেল। মাষ্টার অনেকক্ষণ পরে চাঁদনীর পশ্চিম ধারে নরেন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। পরস্পর আলাপ হইতে লাগিল নরেন্দ্র বলিলেন, আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের। কলেজে পড়িতেছি ইত্যাদি। ৪৪ পৃ

কেশব জিজ্ঞাসা করিলেন, কালী কত ভাবে লীলা করছেন, সেই কথাগুলি একবার বলুন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, তিনি নানাভাবে লীলা করছেন। তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী···শ্যামাকালীর অনেকটা কোমল ভাব—বরাভয়দায়িনী। গৃহস্থ বাড়ীতে তাঁর পূজা হয়...যখন মহামারী ···তখন রক্ষাকালী পূজা করতে হয়। শ্মশানকালীর সংহারমূর্ত্তি শব শিবা ডাকিনী যোগিনী মধ্যে শ্মশানের উপর থাকেন রুধির ধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কটিতে নরহস্তের কোমর বন্ধ, যখন জগৎ নাশ হয় মহাপ্রলয় হয় তখন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন। গিন্নীর কাছে যেমন একটা ন্যাতাক্যাতার হাঁড়ি থাকে, আর সেই হাঁড়িতে গিন্নী পাঁচ রকম জিনিষ তুলে রাখে! (কেশব ও সকলের হাস্য) হ্যা গো গিন্নীদের ঐ রকম একটা হাঁড়ি

থাকে। তাহার ভিতরে সমুদ্রের ফেনা, নীল বড়ি ছোট ছোট পুটলি বাঁধা শশা বীচি,, কুমড়া বীচি, লাউ বীচি এই সব রাখে। দরকার হ'লে বার করবে। মা ব্রহ্মময়ী সৃষ্টি নাশের পর ঐ রকম সব বীজ কুড়িয়ে রাখেন। ৫৩ পৃ

কালী কি কালো? দূরে তাই কালো, জানতে পারলে কালো নয়। ৫৩ পৃ

কৃষ্ণকিশোর পরম হিন্দু সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, সে বৃন্দাবন গিছিল! একদিন ভ্রমণ করতে করতে তার জলতৃষ্ণা পেয়েছিল, একটা কুয়োর কাছে গিয়ে দেখ্‌লে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, তাকে বললে, ওরে তুই এক ঘটি আমায় জল দিতে পারিস্! তুই কি জাত! সে বললে, ঠাকুর মহাশয়, আমি হীন জাত, মুচি।

কৃষ্ণকিশোর বললে, তুই বল শিব, নে এখন জল তুলে দে।

মন নিয়ে কথা। মনেতেই বদ্ধ, মনেই মুক্ত। মন যে রঙ্গে ছোপাবে সেই রঙ্গে ছুপবে। যেন ধোপা ঘরের কাপড়।...দেখনা যদি একটু ইংরাজী পড়, তো অমনি মুখে ইংরাজী কথা এসে পড়ে। ফুটফাট ইটামিট (সকলের হাস্য) আবার পায়ে বুটজুতো, শিস দিয়ে গান করা; এই সব এসে জুটবে। আবার যদি পণ্ডিত সংস্কৃত এসে পড়ে অমনি শোলক ঝাড়িবে। ৫৬ পৃ

মন নিয়েই সব। একপাশে পরিবার, এক পাশে সন্তান। একজনকে একভাবে সন্তানকে আর একভাবে আদর করে কিন্তু একই মন। ৫৩ পৃ

বিজয়কে ঠাকুর তাহার সহিত লইয়া আসেন, কেশব ও বিজয় মন-মালিন্য ছিল।...এই অবসরে ঠাকুর দেখিলেন বিজয় ও কেশব দুজনেই সঙ্কুচিত ভাবে বসিয়া আছেন।...ঠাকুর কেশবকে বলিলেন, ও গো এই বিজয় এসছেন, তোমাদের ঝগড়া বিবাদ যেন শিব ও রামের যুদ্ধ, রামের গুরু শিব, (শিবের গুরু রাম) যুদ্ধও হ'ল, দুজনে ভাবও হল। কিন্তু শিবের ভূতপ্রেতগুলো আর রামের বানরগুলো ওদের ঝগড়া কিচকিচি আর মেটে না (উচ্চহাস্য) আপনার লোক—তা এরূপ হয়ে থাকে। লবকুশ যে রামের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন আবার জানো মায়ে ঝিয়ে আলাদা মঙ্গলবার ক'রে। মার মঙ্গল আর মেয়ের মঙ্গল যেন আলাদা।...যদি বল ভগবান লীলা করছেন, সেখানে জটিলে কুটিলের কি দরকার। জটিল কুটিলে না থাকলে লীলা পোষ্টাই হয় না ... জটিলে কুটিলে না থাকলে রগড় হয় না। ৬১ পৃ

আদেশ না হলে কে তোমার কথা শুনবে। কলকাতার হুজুগ ত জানো। যতক্ষণ কাঠ জ্বলে, দুধ ফোঁস করে ফোলে। কাঠ টেনে নিলে কোথাও কিছু নেই। কলকাতার লোক হুজুগে। ৬২ পৃ

শম্ভু মল্লিক হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, স্কুল রাস্তা পুষ্করিণী করার কথা বলছিল। আমি বললাম, সম্মুখে যেটা পড়ল, না করলে নয়, সেটাই নিষ্কাম ভাবে করতে হয়। ইচ্ছে করে বেশী কাজ জুড়ানো ভাল নয়; ঈশ্বরকে ভুলে যেতে হয়; কালীঘাটে দানই করতে লাগল—কালী দর্শন আব হ'ল না! আগে যো সো করে ধাক্কাধুক্কি খেয়েও কালীদর্শন করতে হবে, তারপর দান যত করো, আর না কর। ইচ্ছা হয় খুব কর! ঈশ্বর লাভের জন্যই কর্ম্ম! শম্ভুকে তাই বললাম, যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হন, তাঁকে কি বলবে কতকগুলো হাসপাতাল ডেস্পেনসারি করে দাও। ভক্ত কখনও তা বলে না বরং বলবে ঠাকুর তোমার পাদপদ্মে স্থান দাও। ৬৫ পৃ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য গাড়ী আনিতে দেওয়া হইল···কেশবের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দলাল নামিলেন। ঠাকুরের গাড়ী সিমুলিয়া স্ট্রিটে শ্রীযুক্ত সুরেশ মিত্রের বাড়ীতে আসিয়া লাগিল। ঠাকুর তাঁহাকে সুরেন্দ্র বলিতেন। সুরেন্দ্র বাড়ীতে নাই।...বাড়ীর লোকেরা বসিতে নীচের ঘর খুলিয়া দিলেন। গাড়ী ভাড়া দিতে হবে। কে দিবে? সুরেন্দ্র থাকিলে সেই দিত; ঠাকুর একজন ভক্তকে বল্লেন, ভাড়াটা মেয়েদের কাছে চেয়ে নে না। ওরা কি জানে না ওদের ভাতাররা আসে যায়। ৬৬ পৃ

ঠাকুর বসিয়া সহাস্যে গল্প করিতেছেন এমন সময় নরেন্দ্র আসিয়া পৌছিলেন, তখন ঠাকুরের আনন্দ যেন দ্বিগুণ হইল। তিনি বলিলেন, আজ কেশব সেনের সঙ্গে কেমন জাহাজে করে বেড়াতে গিছলাম। বিজয় ছিল, এরা সব ছিল। মাষ্টারকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, একে জিজ্ঞাসা কর কেমন বিজয় আর কেশবকে বল্লুম, মায়ে ঝিয়ে মঙ্গলবার আর জটিলে কুটিলে না থাকলে লীলা পোষ্টাই হয় না এইসব কথা—কেমন গা! ৬৭ পৃ

যাঁদের দেখি ঈশ্বরে মন নাই, তাদের আমি বলি তোমরা একটু এখানে বস অথবা বলি যাও বেশ বিল্ডিং দেখগে (রাসমণির কালীবাড়ী)। ৭০ পৃ

আবার দেখেছি যে, ভক্তদের সঙ্গে হাবাতে লোক এসেছে। তাদের ভারী

বিষয় বুদ্ধি। ঈশ্বরীয় কথা ভাল লাগে না। ওরা হয়ত আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধ'রে ঈশ্বরীয় কথা বলছে। এদিকে এরা আর বসে থাকতে পারে না, ছটফট করছে। বার বার কানে কানে ফিস ফিস করে বলছে কখন যাবে কখন যাবে তারা হয়ত বল্লে, দাঁড়াও না হে, আর একটু পরে যাব। তখন এরা বিরক্ত হয়ে বলে, তবে তোমরা কথা কও, আমরা নৌকোয় গিয়ে বসি। ৭১ পৃ

সহাস্য বদনে ঠাকুর শিবনাথ আদি ভক্তগণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, বলিতেছেন, এই যে শিবনাথ দেখ তোমরা ভক্ত, তোমাদের দেখে বড় আনন্দ হয়, গাঁজাখোরের স্বভাব আর একজন গাঁজাখোরকে দেখলে ভারি খুসী হয়। হয়ত তার সঙ্গে কোলাকুলি করে। (শিবনাথের ও সকলের হাস্য) ৭০ পৃ

সংসারী লোকদের যদি বল যে সব ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও, তা তারা কখনও শুনবে না। তাই বিষয়ী লোকদের টানবার জন্য গৌর নিতাই দুই ভাই মিলে পরামর্শ করে এই ব্যবস্থা করেছিলেন। মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল বল হরিবোল প্রথম দুইটির লোভে অনেকে হরি বোল বলতে যেতো। হরিনাম সুধার একটু আস্বাদ পেলে বুঝতে পারত যে, মাগুর মাছের ঝোল আর কিছুই নয় হরি প্রেমে যে অশ্রু পড়ে তাই, যুবতী মেয়ে কিনা-পৃথিবী যুবতী মেয়ের কোল কিনা—ধূলায় হরিপ্রেমে গড়াগড়ি। ৭১ পৃ

ঠাকুর শিবনাথের প্রতি, যতক্ষণ তুমি সভায় আসনি তোমার নাম গুণকথা অনেক হয়েছে। যাই এসে পড়েছ অমনি সে সব কথা বন্ধ·· তখন তোমার দর্শনেতেই আনন্দ...যেমন ব্রাহ্মণ ভোজনে প্রথমে খুব হৈ চৈ, যখন পাতা সম্মুখে করে বসলো তখন অনেক হৈ চৈ কমে গেল, কেবল লুচি আন লুচি আন শব্দ হতে থাকে! যখন লুচি তরকারী খেতে আরম্ভ করে তখন বারো আনা শব্দ ক'মে গেছে যখন দই এলো তখন 'সুপ সুপ' শব্দ নাই বললেই হয়। খাবার পর নিদ্রা। তখন সব চুপ! ৮০ পৃ

সংসারী রজোগুণের লক্ষণ আবার আছে। ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হাতে দুই তিনটি আংটি বাড়ীর আসবাব খুব ফিটফাট। দেওয়ালে (Queen's) কুইনের ছবি রাজপুত্রের ছবি, কোন বড় মানুষের ছবি। বাড়ী চূণকাম করা, যেন

কোনখানে একটু দাগ নাই নানা রকমের ভাল পোষাক চাকরদেরও পোষাক এমন সব। ৭২ পৃ

ঠাকুর কেশবকে—আমি তোমরা কি রকম লেকচার দাও,আমি শুনবো তা গঙ্গার ঘাটে চাঁদনীতে সভা হল। আর কেশব বলতে লাগল…কেশবকে বললুম তুমি এত বল কেন! হে ঈশ্বর তুমি কি সুন্দর ফুল করিয়াছ এই সব! যারা নিজেরা ঐশ্বর্য্য ভালবাসে তারা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করতে ভালবাসে! যখন রাধাকান্তের গয়না চুরি গেল সেজবাবু (মথুর) রাধাকান্তের মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে বলতে লাগল, ছি ঠাকুর তুমি তোমার গয়না রক্ষে করতে পারলে না। আমি সেজবাবুকে বললাম, ও তোমার কি বুদ্ধি স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁর দাসী পদ সেবা করেন তাঁর কি ঐশ্বর্য্যের অভাব এ গয়না তোমার পক্ষেই ভারী একটা জিনিষ কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে কতকগুলো মাটির ঢ্যালা। অমন হীন বুদ্ধির কথা বলতে নেই। ৮২ পৃ

রামচন্দ্র রাবণ বধের পর রাক্ষস পুরীতে প্রবেশ কল্লেন, বুড়ী নিকষা দৌড়ে পালাতে লাগল। লক্ষ্মণ বল্লেন, রাম একি বলুন দেখি, নিকষা এত বুড়ি কত পুত্র শোক পেয়েছে তার এত প্রাণের ভয়, পালাচ্ছে। রামচন্দ্র নিকষাকে অভয়দান করে সম্মুখে আনিয়ে জিজ্ঞাসা করাতে নিকষা বললে, রাম এত দিন বেঁচে আছি বলে তোমার এত লীলা দেখলাম তাই আরও বাঁচবার সাধ, তোমার আরও কত লীলা দেখব। ৮৩ পৃ

মহাপুরুষ জীবের দুঃখে কাতর হন। এরা স্বার্থপর নয় যে আপনাদের জ্ঞান হলেই হল। স্বার্থপর লোকের কথা ত জান। এখানে মোৎ বললে মুৎবে না পাছে তোমার উপকার হয়। ৮১ পৃ

পূর্বজন্মের সংস্কার মানতে হয়। শুনেছি একজন শব সাধন করছিল, গভীর বনে ভগবতীর আরাধনা করছিল। সে অনেক বিভীষিকা দেখতে লাগল—শেষে তাকে বাঘে নিয়ে গেল। আর একজন বাঘের ভয়ে নিকটে একটা গাছের উপর উঠেছিল। শব আর অন্যান্য পূজার উপকরণ তৈয়ারী দেখে, সে নেমে এসে আচমন ক'রে শবের উপর বসে গে'ল। একটু জপ করতে মা সাক্ষাৎকার হলেন ও বল্লেন, আমি তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি, তুমি বর নাও। মার পাদপদ্মে প্রণত হয়ে সে বললে, মা একটা কথা জিজ্ঞাসা

করি, তোমার কাণ্ড দেখে অবাক হয়েছি! সে ব্যক্তি এত খেটে, এত আয়োজন করে, এতদিন ধরে তোমার সাধনা করছিল, তাকে তোমার দয়া হল না! আর আমি কিছুই জানি না, শুনি না, ভজনহীন আমার উপর এত কৃপা! ভগবতী হাসতে হাসতে বল্লেন, বাছা তোমার জন্মান্তরের কথা স্মরণ নাই। তুমি জন্ম জন্ম আমার তপস্যা করেছিলে, সেই সাধন বলে তোমার এরূপ জোটপাট হয়েছে, তাই আমার দর্শন পেলে। ৮৭ পৃ

বদ্ধজীবের—সংসারী জীবের কোন মতে হুঁস আর হয় না...উট কাটা ঘাস বড় ভালোবাসে। কিন্তু যত খায় মুখ দিয়ে দর দর করে রক্ত পড়ে। তবুও সে কাঁটা ঘাসই খাবে ছাড়বে না। সংসারী লোক এত শোক তাপ পায়, তবু কিছুদিনের পর যেমন তেমনি। স্ত্রী মরে গেল, কি অসতী হলো আবার বিয়ে করবে। ছেলে মরে গেল কত শোক পেলে, কিছুদিন পরেই সবভুলে গেল, সেই ছেলের মা যে শোকে অধীর হয়েছিল, আবার কিছুদিন পর চুল বাঁধলো গয়না পরলো।...৮৯ পৃ

এক দেশে অনাবৃষ্টি। একজন চাষার খুব রোক প্রতিজ্ঞা করলে যতক্ষণ না জল আসে যতক্ষণ নদীর সঙ্গে যোগ না হয় ততক্ষণ খানা খুড়ে যাব। বেলা হতে তার গৃহিণী মেয়ে সাধ্য সাধনা করলে, স্নান কর ভাত খাবে এসো সে গালাগালি দিয়ে কোদাল হাতে করে তাড়া করে।...আর একজন চাষা সেও মাঠে জল আনছিল। তার স্ত্রী যখন এসে বললে, অনেক বেলা হয়েছে। এখন এস, এত বাড়াবাড়িতে কাজ নেই। সে তখন কোদাল রেখে স্ত্রীকে বললে—তুই যখন বলছিস ত চল। ঐ রোক তীব্র বৈরাগ্যের উপমা। ৯১ পৃ

জয়পুরের গোবিন্দজীর পূজারীরা প্রথম প্রথম বিবাহ করে নাই। তখন খুব তেজস্বী ছিল। রাজা একবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তা তারা যায় নাই বলেছিল, রাজাকে আসতে বল। তারপর রাজা আর পাঁচজনে তাদের বিয়ে দিয়ে দিলেন। তখন রাজার সঙ্গে দেখা করবার জন্য আর কাহাকেও ডাকতে হ'ল না। নিজে নিজেই গিয়ে উপস্থিত। মহারাজ আশীর্ব্বাদ করতে এসেছি, এই নির্ম্মাল্য এনেছি, ধারণ করুন! কাজে কাজেই আসতে হয়, আজ ঘর তুলতে হবে, আজ ছেলের অন্নপ্রাশন, আজ হাত খড়ি···৯২ পৃ

বারশো নেড়া আর তেরশো নেড়ী তার সাক্ষী উদম সাঁড়ী! এ গল্প ত

জানো, নিত্যানন্দ গোস্বামীর ছেলে বীরভদ্রের তেরশো ন্যাড়া শিষ্য ছিল। তারা যখন সিদ্ধ হয়ে গেল, তখন বীরভদ্রের ভয় হলো। তিনি ভাবতে লাগলেন এরা সিদ্ধ হলো। লোককে যা বলবে তাই ফলবে, যে দিক দিয়ে যাবে সে দিকে ভয়! লোকে জেনে যদি অপরাধ করে তাদের অনিষ্ট হবে। এই ভেবে বীরভদ্র তাদের ডেকে বল্লেন—তোমরা গঙ্গায় গিয়ে সন্ধ্যা আহ্নিক করে এস। ন্যাড়াদের এত তেজ যে ধ্যান করতে করতে সমাধি সমাধি হলো। কখন জোয়ার মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে হঁস নাই। আবার ভাটা পড়েছে তবু ধ্যান ভাঙ্গে না। তেরোশোর মধ্যে একশো বুঝেছিল-বীরভদ্র কি বলবেন। গুরুবাক্য লঙ্ঘন করতে নেই তাই তারা সরে পড়লো, আর বীরভদ্রর সঙ্গে দেখা করলে না। বাকি বারোশো দেখা করলে, বীরভদ্র বল্লেন, এই তেরশো নেড়ী তোমাদের সেবা করবে। তোমরা এদের বিয়ে কর। তারা বললে যে আজ্ঞে, ঐ বারোশো এখন প্রত্যেকে সেবাদাসীর সঙ্গে থাকতে লাগল। তখন আর সে তেজ নেই সে তপস্যার বল নেই! ৯২ পৃ

আর তোমরা ত নিজে নিজে ত দেখছো, পরের কর্ম্ম স্বীকার করে কি হয়ে রয়েছ? আর দেখ, অত পাশ করা, কত ইংরাজী পড়া পণ্ডিত, মনিবের চাকরী স্বীকার করে, তাদের বুট জুতোর গোঁজা দুবেলা খায়, তার কারণ কেবল কামিনী বিয়ে করে নদের হাট বসিয়ে আর হাট তোলবার যো নেই। তাই এত অপমান বোধ, অত দাসত্ব যন্ত্রণা! ৯৩ পৃ

এক একটি উপাধি হয়, আর জীবে স্বভাব বদলে যায়। যে কালা পেড়ে কাপড় পরে আছে, অমনি দেখবে, তার নিধুর টপ্পার তান এসে জোটে, আর তাস খেলা, বেড়াতে যাবার সময় হাতে ছাড় (stick); এই সব এসে জোটে। রোগা লোকও যদি বুট পরে সে অমনি শিশ দিতে আরম্ভ করে, সিঁড়ি উঠবার সময় সাহেবদের মত লাফিয়ে উঠতে থাকে। মানুষে হাতে যদি কলম থাকে, এমনি কলমের গুণ. যে সে অমনি একটা কাগজ টাগজ পেলেই তার উপর ফ্যাস ফ্যাস করে টান দিতে থাকে।—৯৬ পৃ

টাকা একটা বিলক্ষণ উপাধি; টাকা হলেই মানুষ আর এক রকম হয়ে যায়, সে মানুষ থাকে না। এখানে একজন ব্রাহ্মণ আসা যাওয়া করত, সে বাহিরে বেশ বিনয়ী ছিল। কিছুদিন পরে (একদিন) আমরা কোন্নগরে গেছলুম,

হৃদে সঙ্গে ছিল। নৌকা থেকে যেই নামছি, দেখি সেই ব্রাহ্মণ গঙ্গার ধারে বসে আছে—বোধ হয় হাওয়া খাচ্ছিল। আমাদের দেখে বলছে, কি ঠাকুর বলি আছ কেমন! তার কথা শুনে আমি হৃদেকে বললাম, ওরে হৃদে, এ লোকটার টাকা হয়েছে, তাই এই রকম কথা! ৯৭ পৃ

বজ্জাৎ আমি কে! যে আমি বলে—আমায় জানেনা! আমার এত টাকা, আমার চেয়ে বড় লোক আছে! যদি চোর দশটাকা চুরি করে থাকে প্রথমে টাকা কেড়ে লয়, তারপর চোরকে খুব মারে; তাতেও ছাড়ে না, পাহারাওয়ালা ডেকে পুলিশে দেয় ও ম্যাদ খাটায়! বজ্জাৎ আমি বলে, জানে না—আমার দশ টাকা নিয়েছে এত বড় আস্পর্দ্ধা! ৯৮ পৃ

এই সময় গেরুয়া কাপড় পরা অপরিচিত একটি বাঙ্গালী আসিয়া উপস্থিত হইলেন—শ্রীরামকৃষ্ণে গেরুয়া দৃষ্টে আবার গেরুয়া কেন? একটা পরলেই হল। একজন বলেছিল, চণ্ডী ছেড়ে হলুম ঢাকী! আগে চণ্ডীর গান গাইত, এখন ঢাক বাজায়! (মিথ্যা ভেক ভাল নয়) ১০৬ পৃ

আর একদিন নিমাই সন্ন্যাস, কেশবের বাড়ীতে দেখতে গিয়েছিলাম। যাত্রাটি কেশবের কতগুলো খোসামুদে শিষ্য জুটে খারাপ করছিল। একজন কেশবকে বল্লে, কলির চৈতন্য হচ্ছেন আপনি। কেশব আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বল্লে, তা হলে ইনি কে হলেন? আমি বল্লাম, আমি তোমাদের দাসের দাস রেণুর রেণু। কেশবের লোকমান্য হবার ইচ্ছা ছিল। ১০৭ পৃ

তুমি দল দল করছো তোমার দল থেকে লোক ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে! কেশব বললে, মহাশয়, তিনবৎসর এ দলে থেকে আবার ও দলে গেল। যাবার সময় আবার গালাগালি দিয়ে গেল! আমি বল্লাম তুমি লক্ষণ দেখ না কেন? যাকে তাকে চেলা কি করলে হয়! ১১৫পৃ

জীব মায়ার রাজ্যে বাস করে এই মায়া মানুষকে অজ্ঞান করে রেখেছে! হৃদে একটা এঁড়ে বাছুর এনে ছিল একদিন দেখি সেটাকে বাগানে বেঁধে দিয়েছে, ঘাস খাওয়াবার জন্যে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হৃদে ওটাকে রোজ ওখানে বেঁধে রাখিস কেন? হৃদে বল্লে, মামা এঁড়েটাকে দেশে পাঠিয়ে দিব। বড় হলে লাঙ্গল টানবে। যাই এ কথা বলেছে; আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলাম; মনে হয়েছিল, কি মায়ার খেলা! কোথায় কামার-পুকুর সিওড় কোথায়

কলিকাতা। এ বাছুরটি যাবে ওই পথে! সেখানে বড় হবে। তারপর কতদিন পরে লাঙ্গল টানবে এরই নাম সংসার—এরই নাম মায়া! ১১৬ পৃ

পদ্মলোচন বর্দ্ধমান রাজার সভাপণ্ডিত ছিল, ... একটা সভায় বিচার হয়েছিল।—শিব বড় না ব্রহ্মা বড়। শেষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পদ্মলোচনকে জিজ্ঞাসা করলে। পদ্মলোচনকে জিজ্ঞাসা করলে। পদ্মলোচন এমনি সরল সে বললে, আমার চৌদ্দ পুরুষ শিবও দেখে নাই ব্রহ্মাও দেখে নাই। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ শুনে আমায় একদিন বল্লে, ওসব ত্যাগ করছ কেন? এটা টাকা এটা মাটি এ ভেদ বুদ্ধি তো অজ্ঞান থেকে হয়। আমি কি বলবো, বললাম, কে জানে বাপু আমার টাকাকড়ি ওসব ভাল লাগে না। ১১২ পৃ

কাপ্তেন: কেশব সেন ভ্রষ্টাচার, স্বেচ্ছাচার, তিনি বাবু সাধু নন...ঠাকুর ভক্তের প্রতি: কাপ্তেন আমায় বারণ করে কেশব সেনের ওখানে যেতে। কাপ্তেন: মহাশয় আপনি যাবেন তা আর কি করব। ঠাকুর বিরক্ত হইয়া—তুমি লাটসাহেবের কাছে যেতে পার টাকার জন্যে আর আমি কেশব সেনের কাছে যেতে পারি না। সে ঈশ্বর চিন্তা করে, হরিনাম করে। ১২৮ পৃ

একদিন কেশব শিষ্যদের সঙ্গে এখানে এসেছিল...খাটে বসে অনেক কথাবার্ত্তা হল। আমি বল্লাম, যিনিই ভগবান তিনিই একরূপে ভক্ত। তিনিই একরূপে ভগবত। তোমরা বল ভগবত ভক্ত ভগবান। কেশব বল্লে, আর শিষ্যরাও সব এক সঙ্গে বল্লে, ভগবত ভক্ত ভগবান। যখন বল্লাম বলো, গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব, তখন কেশব বল্লে, মহাশয় অতদূর নয়, তা হলে লোকে গোঁড়া বলবে। ১১৬ পৃ

দেখ বিজয় সাধুর সঙ্গে যদি পুটলী পুটলা থাকে, পনেরটা গাঁটওয়ালা যদি কাপড়ের বুঁচকি থাকে তাহলে তাদের বিশ্বাস কর না। আমি বটতলায় ঐ রকম সাধু দেখেছিলাম! দু তিন জন বসে আছে, কেউ ডাল বাচ্চে, কেউ কেউ কাপড় সেলাই করছে আর বড়মানুষের বাড়ীর ভাণ্ডারার গল্প করছে। বলছে, আরে ও বাবুনে লাখো রূপেয়া খরচ কিয়া, সাধু লোককো বহুৎ খিলায়া—পুরী জিলেবী পেঁড়া বরফী মালপুয়া বহুৎ চিজ তৈয়ারী কিয়া। বিজয় কহিলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ গয়ায় ঐ রকম সাধু দেখেছি? গয়ার লোটাওয়ালা সাধু। ১৩৭ পৃ

শ্যামা পুরুষ না প্রকৃতি? একজন ভক্ত পূজা করছিল। একজন দর্শন

করতে এসে দেখে ঠাকুরের (মায়ের) গলায় পৈতে। সে বল্লে, তুমি মা'র গলায় পৈতে পরিয়েছ ? ভক্তটি বল্লে, ভাই তুমিই চিনেছ। আমি এখনও চিনতে পারি নাই তিনি পুরুষ কি প্রকৃতি তাই পৈতে পরিয়েছি। ১১৮ পৃ

সমাধ্যায়ী বল্লে এক পণ্ডিত বলেছিলেন ঈশ্বর নীরস !···আর এতে বোধ হচ্ছে সে ব্যক্তি ঈশ্বর কি বস্তু—কখনও জানে নাই। তাই এরূপ গোলমেলে কথা। একজন বলেছিল আমার মামার বাড়ী এক গোয়াল ঘোড়া আছে। একথায় বুঝতে হবে ঘোড়া আদবেই নেই। কেন না গোয়ালে ঘোড়া থাকে না। ১৩৯ পৃ

তাঁকে জেনে সংসার করলে বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ঐহিক সম্পর্ক থাকে না। দুজনেই ভক্ত দুজনেই ঈশ্বরের কথা কয়। প্রতিবেশী—মহাশয়, এরূপ স্ত্রী পুরুষ ত দেখা যায় না। ঠাকুর,আছে...অতি বিরল বিষয়ী লোকেরা তাদের চিনতে পারে না···ভগবানের কৃপা চাই। না হলে, সর্ব্বদা অমিল হয়। স্ত্রী হয়ত রাত দিন বকে বাবা, কেন এখানে বিয়ে দিলে, না খেতে পেলুম, না বাছাদের খাওয়াতে পারলুম ; না পরতে পেলুম, না বাছাদের পরাতে পেলুম, একখানা গয়না। তুমি আমায় কি সুখে রেখেছ। চক্ষু বুজে ঈশ্বর ঈশ্বর করছেন। ও সব পাগলামী ছাড়। ১৪৪ পৃ

মহিমাচরণ কাশীপুরবাসী···কিছু পাণ্ডিত্যও আছে...ইংরাজী সংস্কৃত অনেক গ্রন্থ পড়িয়াছেন। (শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে মহিমার প্রতি)-একি এখানে জাহাজ এসে উপস্থিত এমন জায়গায় ডিঙ্গিটিঙ্গি আসতে পারে—এযে একেবারে জাহাজ। ১৫৭ পৃ

(সুরেন্দ্রের বাগানে মহোৎসব) এই বার পাতা হইতেছে। দক্ষিণের বারাণ্ডায়, ঠাকুর মহিমাচরণকে বলিতেছেন, আপনি একবার যাও, দেখো ওরা সব কি করছে, আর আপনাকে আমি বলতে পারি না, না হয় একটু পরিবেশন করলে ? মহিমাচরণ বলিতেছেন, নিয়ে আসুক না তারপর দেখা যাবে, এই বলিয়া হুঁ হুঁ করিয়া একটু দালানের দিকে গেলেন, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই-ফিরিয়া আসিলেন। ১৫৮ পৃ

একজন লোকের পাহাড়ের উপর ঘর ছিল। কুঁড়ে ঘর। অনেক মেহনত করে ঘরখানি করেছিল। একদিন ঝড় এলো। কুঁড়ে ঘর টলমল করতে

লাগলো—তখন ঘর রক্ষার জন্যে সে ভারী চিন্তিত হল। বল্লে, হে পবনদেব দেখো ঘর খানি ভেঙ্গো না বাবা। পবনদেব কিন্তু শুনছেন না। ঘর মড় মড় করতে লাগলো ; তখন লোকটা একটা ফিকির ঠাওরালে—তার মনে পড়লো যে, হনুমান পবনের ছেলে। যাই মনে পড়া অমনি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো বাবা ঘর ভেঙ্গো না, হনুমানের ঘর, দোহাই তোমার। ঘর তবুও মড় মড় করে। কেবা তার কথা শুনে। অনেকবার হনুমানের ঘর হনুমানের ঘর করার পর দেখলে যে কিছুই হল না তখন বলতে লাগলো, বাবা লক্ষ্মণের ঘর লক্ষ্মণের ঘর তাতেও হলো না। তখন বলতে লাগলো, বাবা রামের ঘর রামের ঘর দেখো বাবা ভেঙ্গো-না দোহাই তোমার। তাতেও কিছু হলো না ; ঘর মড় মড় করে ভাঙ্গতে আরম্ভ হলো। তখন প্রাণ বাঁচাতে হবে, লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় বলছে—যা শালার ঘর। ১৬৬ পৃ

ঈশান ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন।…গান হইবে। পাখোয়াজ বাঁয়া তবলা ও তানপুরার আয়োজন হইয়াছে। বাড়ীর একজন একটি পাত্র করিয়া পাখোয়াজের জন্য ময়দা আনিয়া দিল। বেলা ১১টা হইবে।…শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি) এখনও ময়দা। তবে বুঝি (খাবার) অনেক দেরী। ঈশান (সহাসে) আজ্ঞে না—তত দেরী নাই।—ভক্তেরা কেহ কেহ হাসিতেছেন। ভগবতের পণ্ডিতও হাসিয়া একটি উদ্ভট শ্লোক বলিতেছেন। শ্লোক আবৃত্তির পর ব্যাখ্যা করিতেছেন।

দর্শনাদি শাস্ত্র অপেক্ষা কাব্য মনোহর। যখন কাব্য পাঠ হয় বা লোকে শ্রবণ করে তখন বেদান্ত সাংখ্য ন্যায় পাতঞ্জল এই সব দর্শন শুষ্ক বোধ হয়। কাব্য অপেক্ষা গীত মনোহর। সঙ্গীতে পাষাণ হৃদয় লোকও গলে যায়। কিন্তু যদিও গীতের এত আকর্ষণ যদি. সুন্দরী নারী কাছ দিয়ে চলে যায়, কাব্যও পড়ে থাকে, গীত পর্য্যন্ত ভাল লাগে না। সব মন ঐ নারীর দিকে চলে যায়। আবার যখন বুভুক্ষা হয়, ক্ষুধা পায়, কাব্য গীত নারী কিছুই ভাল লাগে না। অন্নচিন্তা চমৎকার। শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে—এনি রসিক। ১৭২।৭৩ পৃ

আমি আর আমার এইটির নাম অজ্ঞান। রাসমণি কালীবাড়ী করেছেন এই কথাই লোকে বলে, কেউ বলে না যে ঈশ্বর করেছেন। ব্রাহ্ম সমাজ

অমুক লোক করে গেছেন, একথা আর কেউ বলে না যে ঈশ্বরের ইচ্ছায় এটি হয়েছে।...১৬৭ পৃ

একজন ভক্ত শক্তির উপাসক আসিয়াছেন! কপালে সিন্দুর ফোঁটা। ঠাকুর আনন্দময় সিন্দুরের টিপ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন—উনি ত মার্কামারা। ১৭১ পৃ

নারদীয় ভক্তি) আজকালকার জ্বরে দশমূলের পাঁচন চলে না। দশমূল পাঁচন দিতে গেলে রোগীর এদিকে হয়ে যায়। আজকাল ফিবার মিক্শ্চার। কর্ম্ম যদি করতে বল—তো নেজামুড়া বাদ দিয়ে বলবে। ১৭৫ পৃ

ঠাকুর...মাস্টার তুমি আগে অত যেতে, এখন তত যাও না কেন? বুঝি পরিবারের সঙ্গে বেশী ভাব হয়েছে। ১৭৪ পৃ

একজন (ব্রাহ্ম) লেকচার দিতে দিতে বলছিল, ভাইরে আমি কত মদ খেতুম, হেন করতাম তেন করতাম এ কথা শুনে লোকগুলো বলাবলি করতে লাগলো, শালা বলে কিরে! মদ খেতো। এই কথা বলতে উল্টো বিপত্তি হল। তাই ভাল লোক না হলে লেকচারের কোন উপকার হয় না। ১৭৮ পৃ

পণ্ডিতকে (শশধর) ঠাকুর—আজ আমার খুব দিন। আমি দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখলাম! দ্বিতীয়ার চাঁদ কেন বললুম জান। সীতা রাবণকে বলেছিলেন, রাবণ পূর্ণচন্দ্র আর রামচন্দ্র আমার দ্বিতীয়ার চাঁদ। রাবণ মানে বুঝতে পারে নাই তাই ভারী খুসী। সীতার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, রাবণের সম্পদ যতদূর হবার হয়েছে, এইবার দিনে দিনে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় হ্রাস পাবে। রামচন্দ্র দ্বিতীয়ার চাঁদ, দিন দিন বৃদ্ধি হবে। ১৮৫।৮৬ পৃ

...দৃঢ় হয়ে ডাকতে হবে। ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হবে। বিষয়ীর ঈশ্বর কিরূপ জ্ঞান? যেমন খুড়ী জেটির কোদল শুনে ছেলেরা খেলা করবার সময় পরস্পর বলে, ঈশ্বরের দিব্যি। আর যেমন ফিটবাবু পান চিবুতে চিবুতে ষ্টিক (stick) হাতে করে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে একটি ফুল তুলে বন্ধুকে বলে, ঈশ্বর কি beautitul ফুল করেছেন। কিন্তু বিষয়ীর এই ভাব ক্ষণিক, যেন তপ্ত লোহার উপর জলের ছিটে।—১৯৩ পৃ

কেশব সেন প্রতাপ এরা সব বলছিল, মহাশয় আমাদের জনকরাজার মত। আমি বল্লুম জনক রাজা এমনি মুখে বল্লেই হওয়া যায় না। জনক রাজা

হেট মুণ্ড হয়ে আগে নির্জ্জনে বসে কত তপস্যা করেছিল। তোমরা কিছু কর তবে তো জনক রাজা হবে। অমুক খুব তর তর করে ইংরেজী লিখতে পারে, তা কি একেবারেই লিখতে পেরেছিল? সে গরীবের ছেলে, আগে একজনের বাড়ীতে থেকে তাদের রেঁধে দিতো, আর দুটি দুটি খেতো অনেক কষ্টে লেখাপড়া শিখেছিলো—তাই এখন তর্ তর্ করে লিখতে পারে।—১৯৬ পৃ

শ্রীরামকৃষ্ণ—ত্যাগ তোমাদের কেন করতে হবে। যেকালে যুদ্ধ করতেই হবে, কেল্লা থেকেই যুদ্ধ ভাল।···আবার কলিতে অন্নগতপ্রাণ হয়ত খেতেই পেলে না। তখন ঈশ্বর টিশ্বর সব ঘুচে যাবে। একজন তার মাগকে বলেছিল, আমি সংসার ত্যাগ করে চল্লুম। মাগটি একটু জ্ঞানী ছিল। সে বল্ল, কেন তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াবে? যদি পেটের ভাতের জন্য দশ ঘরে যেতে না হয়, তবে যাও। তা যদি হয়, এই এক ঘরই ভাল!—তোমরা ত্যাগ কেন করবে? বাড়ীতে বরং সুবিধা। আহারের জন্য ভাবতে হবে না। সহবাস স্বদারার সঙ্গে তাতে দোষ নাই। শরীরের যখন যেটি দরকার কাছেই পাবে।...১৯৮ পৃ

···মার কাছে আব্দার কর। ছেলে ঘুড়ি কিনবার জন্য মার আঁচল ধরে পয়সা চায়—মা হয়ত আর মেয়েদের সঙ্গে গল্প ক'রছে। প্রথমে কোন মতে দিতে চায় না, বলে, না তিনি বারণ করে গেছেন, তিনি এলে বলে দিব, এক্ষণই ঘুড়ি নিয়ে একটা কাণ্ড করবি। যখন ছেলে কাঁদতে সুরু করে, কোন মতে ছাড়ে না, মা অন্য মেয়েদের বলে, রোস মা, এ ছেলেটাকে একবার শান্ত করে আসি। বলে, চাবিটা নিয়ে কড়াৎ করে বাক্স খুলে একটা পয়সা ফেলে দেয়। ২০১ পৃ

সংসারাসক্ত বদ্ধজীব মৃত্যুকালে সংসারের কথাই বলে। বাহিরে মালা জপলে গঙ্গাস্নান করলে, তীর্থ গেলে—কি হবে? সংসার আসক্তি ভিতরে থাকলে মৃত্যুকালে সেটা দেখা দেয়। কত আবল তাবল বকে হয়ত। বিকারের খেয়ালে হলুদ পাঁচফোড়ন তেজপাতা বলে চেঁচিয়ে উঠলো। ২০৪ পৃ

শুকপাখী সহজ বেলা রাধাকৃষ্ণ বলে, বিল্লে ধরলে নিজের বুলি বেরোয় ক্যাক্যা করে—

ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই তাই এত কর্ম্মভোগে লোক বলে যে, গঙ্গা স্নানের সময় তোমার পাপগুলো তোমায় ছেড়ে গঙ্গার তীরের গাছের উপর বসে।

যাই তুমি গঙ্গাস্নান ক'রে তীরে উঠেছ অমনি পাপগুলো তোমার ঘাড়ে আবার চেপে বসে। ২০৫ পৃ

ঠাকুর—আমি পঞ্চবটির কাছে গঙ্গার ধারে টাকা মাটি মাটিই টাকা টাকাই মাটি এই বিচার করতে করতে যখন টাকা গঙ্গার জলে ফেলে দিলুম, তখন একটু ভয় হল। ভাবলুম আমি কি লক্ষ্মীছাড়া হলুম! মা লক্ষ্মী যদি খঁ্যাট বন্ধ করে দেন তা হলে কি হবে। তখন হাজরার মত পাটোয়ারী করলুম। বল্লুম, মা তুমি যেন হৃদয়ে থাকো। একজন তপস্যা করাতে ভগবতী সন্তুষ্ট হয়ে বল্লেন, তুমি বর লও। সে বল্লে, মা যদি বর দিবে, তবে এই কর যেন নাতির সঙ্গে সোনার থালায় ভাত খাই; এক বরেতে নাতি ঐশ্বর্য্য সোনার থাল সব হ'ল। ২২৪ পৃ

এক কেরানী জেলে গিছিল। জেল খাটা শেষ হ'য়ে সে জেল থেকে বেরিয়ে এলো, এখন জেল থেকে এসে সে কি কেবল ধেই ধেই করে নাচবে, না কেরানীগিরি করবে। ২২৭ পৃ

সেজবাবুকে বল্লুম, আমি শুনেছি দেবন্দ্রঠাকুর ঈশ্বর চিন্তা করে আমার তাকে দেখবার ইচ্ছা······(সেজবাবু নিয়ে গেল) অনেক কথাবার্ত্তার পর দেবেন্দ্র খুসী হয়ে বল্লে, আপনাকে উৎসবে (ব্রাহ্মোৎসবে) আসতে হবে। আমি বল্লাম সে ঈশ্বরের ইচ্ছা—আমার ত এই অবস্থা দেখছো। কখন কি ভাবে রাখেন। দেবেন্দ্র বল্লে, না আসতে হবে তবে ধুতি আর উড়ানি পরে এসো—তোমাকে এলোমেলো দেখে কেউ কিছু বললে, আমার কষ্ট হবে। আমি বললাম তা পারবোনা। আমি বাবু হতে পারবো না। দেবেন্দ্র সেজবাবু সব হাসতে লাগল। তারপর দিনই সেজবাবুর কাছে দেবেন্দ্রর চিঠি এলো আমাকে উৎসব দেখতে যেতে বারণ করেছে, বলে অসভ্যতা হবে গায়ে উড়ানি থাকবে না। ২৩১ পৃ

চাষার ছেলে মরে যেতে স্ত্রী বল্লে; ছেলেটার জন্যে একবারও কাঁদলেও না, চাষা তখন স্থির হয়ে বললে, কেন কাঁদছি না বলবো? আমি কাল একটা ভারী স্বপ্ন দেখেছি; দেখলাম যে রাজা হয়েছি আর আট ছেলের বাপ হয়েছি—খুব সুখে আছি। তারপর ঘুম ভেঙ্গে গেল। এখন মহা ভাবনায় পড়েছি, আমার সেই আট ছেলের শোক করব না, না তোমার এই এক

ছেলে হারুর জন্য শোক করবো। ২৩৩ পৃ

জ্ঞানীরা দেখে সব স্বপ্নবৎ। ভক্তেরা সব অবস্থা লয়। জ্ঞানী দুধ দেয় ছিড়িক ছিড়িক করে। এক একটা গরু আছে বেছে বেছে খায়, তাই ছিড়িক ছিড়িক দুধ। যারা অত বাছে না আর সব খায়, তারা হুড় হুড় করে দুধ দেয়। ২৩৪ পৃ

রাবণকে বলেছিল, তুমি সীতার জন্য মায়ায় নানা রূপ ধরছো, একবার রামরূপ ধরে সীতার কাছে যাও না কেন রাবণ বললে, তুচ্ছ ব্রহ্মপদং পরবধূবসঙ্গঃ কুতঃ—যখন রামকে চিন্তা করি, তখন ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়, পর স্ত্রী তো সামান্য কথা। তা রামরূপ কি ধরবো। ২৩৬ পৃ

গিরিশ—মহাশয় আমরা সব হল হল করে কথা কচ্ছি মাস্টার ঠোঁট চেপে বসে আছে।

ঠাকুর হাসিতে হাসিতে—মুখ হলসা, ভেতর বুঁদে, কান তুলসে, দীঘল ঘোমটা নারী। পানা পুকুরের শীতল জল বড় মন্দকারী॥ এই ক'টি লোকের কাছ থেকে সাবধান থাকবে। প্রথম, মুখ হলসা—হল হল করে কথা কয়। তারপর ভেতর বুঁদে—মনের ভিতর ডুবুরি নামালেও অন্ত পাবে না। তার পর কান তুলসে—কানে তুলসী দেয় ভক্তি জানাবার জন্য; দীঘল ঘোমটা নারী—লম্বা ঘোমটা লোকে মনে করে ভারী সতী তা নয়; আর পানা পুকুরের জল—নাইলে সান্নিপাতিক হয়। ২৪৯ পৃ

বলরাম—বামুনরা বলে, অন্নদা গুহ লোকটার বড় অহঙ্কার।

ঠাকুর—ও সব কথা শুনো না। তাদের ত জানো, না দিলেই খারাপ লোক দিলেই ভাল লোক। অন্নদাকে আমি জানি ভাল লোক। ২৫০ পৃ

গিরিশ, মহাশয় মাস্টার কোন মতে গান গাইছে না।

ঠাকুর—ও স্কুলে দাঁত বার করবে, গান গাইতে যত লজ্জা। ২৫২ পৃ

শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? অনেক শ্লোক অনেক শাস্ত্র, পণ্ডিতের জানা থাকতে পারে কিন্তু যার সংসারে আসক্তি আছে, যার কামিনী কাঞ্চনে মনে মনে ভালবাসা আছে তার শাস্ত্র ধারণাই হয় নাই—পাঁজীতে লিখেছে, বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজী টিপলে এক ফোঁটাও জল পড়ে না। এক ফোঁটাই পড়ুক কিন্তু এক ফোঁটাও পড়ে না। ২৫৩ পৃ

পণ্ডিত খুব লম্বা লম্বা কথা বলে, কিন্তু নজর কোথায়? না, কামিনী আর কাঞ্চনে দেহের সুখ আর টাকায়। শকুনি খুব উঁচুতে উড়ে, নজর ভাগাড়ে। কেবল খুঁজছে কোথায় মরা জানোয়ার, কোথায় ভাগাড় কোথায় মড়া। ২৫৪ পৃ

(গিরিশের বাড়ী) ঠাকুর আসন গ্রহণ করিতে গিয়া দেখিলেন, একখানা খবরের কাগজ রহিয়াছে। খবরের কাগজে বিষয়ীদের কথা পরচর্চা, পর নিন্দা। তাই অপবিত্র তাঁহার চক্ষে। তিনি ইসারা করিলেন ওখানা যাতে স্থানান্তরিত করা হয়। ২৬০ পৃ

তবে সংসারে জ্ঞানীর ভয় আছে। কামিনী কাঞ্চনের ভিতর গেলেই একটু না একটু ভয় আছে। কাজলের ঘরে থাকতে গেলে যত সেয়ানাই হও না কেন, কাল দাগ একটু না একটু গায়ে লাগবেই।......এই যখন ভাজা খই খোলা থেকে টপ্ টপ্ করে লাফিয়ে পড়ে—সে গুলি যেন মল্লিকা ফুলের মত গায়ে একটু দাগ থাকে না। খোলার উপর সে সব খই থাকে, সেও বেশ খই, তবে অত ফুলের মত হয় না—একটু গায়ে দাগ থাকে। ২৭৪ পৃ

জনক রাজার সভায় একটি ভৈরবী এসেছিল। স্ত্রীলোক দেখে জনক রাজা হেঁট মুখ হয়ে চোখ নীচু করেছিলেন। ভৈরবী তাই দেখে বলেছিলেন, হে জনক, তোমার এখনও স্ত্রীলোক দেখে ভয়। পূর্ণজ্ঞান হলে পাঁচবছর ছেলের স্বভাব হয়—তখন স্ত্রীপুরুষ বলে ভেদবুদ্ধি থাকে না। ২৭০ পৃ

নারদাদি বাহাদুরি কাঠের মত steam boat এর মত!

কেউ খেয়ে গামছা দিয়ে মুখ মুছে বসে থাকে, পাছে কেউ টের পায়! আবার কেউ একটা আম পেলে কেটে একটু একটু সকলকে দেয়! আর আপানও খায়। ২৭৫ পৃ

ঈশ্বর লাভ হলে পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয়।...এই খেলাঘর পাতলো কত বন্দোবস্ত, কিছুক্ষণ পরেই সব পড়ে রইল। মার কাছে ছুটেছে। হয়ত সুন্দর একখানি সুন্দর কাপড় পরে বের হচ্ছে—খানিক্ষণ পরে কাপড় খুলে পড়ে গেছে—হয় কাপড়ের কথা একেবারে ভুলে গেল—নয় বগলদাবা করে বেড়াচ্ছে। যদি ছেলেটাকে বল, বেশ কাপড়খানি কার কাপড়রে? সে বলবে আমার

কাপড় আমার বাবা আমাকে দিয়েছে। যদি বল লক্ষ্মী ছেলে আমাকে কাপড় খানি দাও না! সে বলে, না আমার কাপড় আমার বাবা দিয়েছে, না আমি দেব না! তারপর ভুলিয়ে একটি পুতুল কি আর একটি বাঁশী যদি হাতে দাও তা হলে পাঁচ টাকা দামের কাপড় খানা তোমায় দিয়ে চলে যাবে আবার পাঁচ বছরের ছেলের সত্ত্বগুণের আঁট নেই! এই পাড়ার খেলুড়েদের সঙ্গে কত ভালবাসা, এক দণ্ড না দেখলে থাকতে পারে না। কিন্তু বাপ মার সঙ্গে যখন অন্য যায়গায় চলে গেল, তখন নূতন খেলুড়ে হল। তাদের উপর সব ভালবাসা পড়লো। পুরনো খেলুড়েদের একরকম একেবারে ভুলে গেল। তারপর জাত অভিমান নাই। মা বলে দিয়েছে, ও তোর দাদা হয়, তা সে ষোল আনা জানে, এ আমার ঠিক দাদা! তা একজন যদি বামুনের ছেলে হয় আর একজন যদি কামারের ছেলে হয় তো এক পাতে বসে ভাত খাবে। আর শুচি অশুচি নাই, হেগো পোঁদ খাবে। আবার লোক ছোঁচাবার পর যাকে তাকে পেছন ফিরে বলে, দেখ দেখি আমার ছোঁচান হয়েছে কি না। ২৭০ পৃ

আমি বইটই কিছুই পড়িনি, কিন্তু দেখ মার নাম করি বলে আমায় সবাই মানে। শম্ভুমল্লিক আমায় বলেছিল, ঢাল নেই, তরোয়াল নাই শান্তিরাম সিং! ২৮৪ পৃ

ঠাকুর—ঈশ্বর অবতার হতে পারেন, একথা যে ওঁর Scienceএ নাই। তবে কেমন করে বিশ্বাস হয়!···একটা গল্প শোন—একজন এসে বল্লে, ওহে, ও পাড়ায় দেখে এলুম অমুকের বাড়ী হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে গেছে। যাকে ও কথা বললে, সে ইংরাজী লেখা পড়া জানে, সে বল্লে, দাঁড়াও, একবার খপরের কাগজখানা দেখি! খপরের কাগজ পড়ে দেখে, যে বাড়ীভাঙ্গার কথা কিছুই নেই; তখন সে ব্যক্তি বল্লে, ওহে তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করি না, কই বাড়ীভাঙ্গার কথা ত খপরের কাগজে লেখা নাই। ও সব মিছে কথা। ২৮৬পৃ

বালকের মত বিশ্বাস না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।...মা বলেছেন, জুজু আছে। ষোল আনা বিশ্বাস যে ও ঘরে জুজু আছে। ২৮০ পৃ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। ১ম ভাগ

আবার বুড়ো আমি আছে, বুড়োর অনেকগুলি পাশ—জাতি, অভিমান, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, বিষয়বুদ্ধি পাটোয়ারী কপটতা। যদি কারুর উপর আক্রোশ

হয় তো সহজে যায় না ; হয়ত যতদিন বাঁচে ততদিন পর্য্যন্ত যায় না ; তারপর পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার। বুড়োর আমি কাঁচা আমি। ২৮১ পৃ

যার বিদ্যার অহঙ্কার, যার পাণ্ডিত্যের অহংকার, যার ধনের অহঙ্কার তার জ্ঞান হয় না। এসব লোককে যদি বলা যায় যে, অমুক জায়গায় বেশ একটি সাধু আছে।—দেখতে যাবে ? তারা অমনি নানা ওজর করে বলে, যাব না। আর মনে মনে বলে, আমি এত বড় লোক, আমি যাব। ২৮১ পৃ

বিশ্বাস যত বাড়বে, জ্ঞানও তত বাড়বে। যে গরু বেছে বেছে খায়, সে ছিড়িক ছিড়িক করে দুধ দেয়। যে গরু শাক পাতা, খোসা ভূষী, যা দাও গব গব করে খায়, সে গরু হুড় হুড় করে দুধ দেয়।······

ডাক্তার—গরুর কিন্তু যা তা খেয়ে খুব দুধ হওয়া ভাল নয়, আমার একটা গরুকে ঐ রকম যা তা খেতে দিত—শেষে আমার ভারী ব্যারাম! তখন ভাবলুম এর কারণ কি। অনেক অনুসন্ধান করে টের পেলুম, গরু খুদ আর কি কি খেয়েছিল, মহা মুস্কিল। লক্ষ্ণৌ যেতে হলো। শেষে বার হাজার টাকা খরচ...

কিসে কি হয় বলা যায় না, পাকপাড়ার বাবুদের বাড়ীতে সাত মাসের মেয়ের অসুখ করেছিল—ঘুঙরী কাশা—আমি দেখতে গিছিলাম। কিছুতেই অসুখের কারণ ঠিক কত্তে পারি নাই। শেষে জানতে পাল্লুম, গাধা ভিজেছিল—যে গাধার দুধ সে মেয়েটি খেতো।

ঠাকুর—কি বল গো! তেঁতুল তলায় আমার গাড়ী গিছিলো, তাই আমার অম্বল হয়েছে।

ডাক্তার—জাহাজের কাপ্তানের বড় মাথা ধরেছিল—তা ডাক্তাররা পরামর্শ করে জাহাজের গায়ে বেলেস্তরা লাগিয়ে দিল। ২৮৮ পৃ

স্ত্রালোকের পট পর্য্যন্ত সন্ন্যাসী দেখবে না। স্ত্রীলোক কিরূপ জানো—যেমন আচার তেঁতুল। মনে কল্লে, মুখে জল সরে আচার তেঁতুল সম্মুখে আনতে হয় না! ২৮৯ পৃ

মিছরীর রুটি সিধে করেই খাও, আর আড় করেই খাও, মিষ্টি লাগবে। ২৯১ পৃ

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে ডাক্তারের প্রতি) আমার শ্যালা কোন চেলা নাই।

আমি সকলের চেলা। সকলেই ঈশ্বরের ছেলে, সকলেই ঈশ্বরের দাস। আমিও ঈশ্বরের ছেলে, আমিও ঈশ্বরের দাস! ২৯১ পৃ

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি একটা হয় আবেশে, এখন লজ্জা হচ্ছে। যেন ভূতে পায়, আমি আর থাকি না।...এ অবস্থার পর গণনা হয় না, গণতে গেলে ১/৭/৮-এই রকম গণনা হয়। নরেন্দ্র—সব এক কি না। শ্রীরামকৃষ্ণ—না, এক দুয়ের পার! ২৯৮ পৃ

বঙ্কিমের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমি জিজ্ঞেসা করলুম, মানুষের কর্ত্তব্য কি? তা বলে আহার নিদ্রা মৈথুন। ঐ সকল কথাবার্ত্তা শুনে আমার ঘৃণা হলো। বল্লাম যে, তোমার এ কি রকম কথা। তুমি ত বড় ছ্যাঁচড়া যা সব রাতদিন চিন্তা করছো, কাজে করছো, তাই আবার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে। মূলো খেলেই মূলোর ঢেকুর উঠে। ৩১১ পৃ

ঠাকুর—একটি স্যাকরার দোকান ছিল। বড় ভক্ত পরমবৈষ্ণব; গলায় মালা, কপালে তিলক, হস্তে হরিনামের মালা। সকলে বিশ্বাস করে ঐ দোকানে আসে, ভাবে এরা পরম ভক্ত, কখনও ঠকাতে পারে না। একদল খদ্দের এলে দেখতো, কোন কারিগর বলছে, কেশব কেশব? আর একজন কারিগর খানিক পরে নাম করছে 'গোপাল গোপাল' আবার খানিকক্ষণ পরে একজন কারিগর বলছে, হরি হরি তারপর কেউ বলছে, হর হর! কাজে কাজেই এত ভগবানের নাম করতে দেখে খরিদ্দারেরা সহজেই মনে করত, এ স্যাকরা অতি উত্তম লোক। কিন্তু ব্যাপারটা কি জান, যে বল্লে, কেশব কেশব! তার মনের ভাব এসব কে? যে বল্লে, গোপাল গোপাল। তার অর্থ আমি এদের চেয়ে চেয়ে দেখলুম, এরা গরুর পাল যে বল্লে হরি হরি!—তার অর্থ এই যে যদি গরুর পাল তবে হরি অর্থাৎ হরণ করি। যে বল্লে হর হর—তবে মনে হয় এই—তবে হরণ কর এরা ত গরুর পাল। ৩১১ পৃ

শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্য শুদ্ধবোধরূপম! তা তোমায় কেমন করে বুঝাবো, কেউ জিজ্ঞাসা করে, ঘি কেমন খেলে, তাকে এখন কি ক'রে বুঝাব? হদ্দ বলতে পার, কেমন ঘি না যেমন ঘি। একটি মেয়েকে তার সঙ্গী জিজ্ঞাসা করছিল, তোর স্বামী এসেছে, আচ্ছা ভাই স্বামী এলে কিরূপ আনন্দ হয়? মেয়েটি বল্লে, ভাই তোর স্বামী হলে তুই জানবি। এখন তোরে কেমনকরে বুঝাব। ৩২৫ পৃ

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও গো বলবো কি। দক্ষিণেশ্বরেকালীবাড়ীতে একটি মেথরাণীর যে অহঙ্কার। তার গায়ে ২/১ খানা গহণা ছিল; সে যে পথ দিয়ে আসছিল, সেই পথে দুএকজন লোক তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল, মেথরাণী তাদের বলে উঠলো, এই সরে যা। তা অন্য লোকের অহঙ্কারের কথা কি বলবো। —৩২৬ পৃ

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত—প্রাণের ভাই শ্রীম...তুমি অনেকদিন হল ঠাকুরের সঙ্গে আমার কি আলাপ হল জানতে চেয়েছিলে।...

বোধ হয় ১৮৮১ সালের শারদীয় অবকাশের সময় প্রথম দর্শন। সেদিন কেশব বাবুর আসিবার কথা, আমি নৌকায় দক্ষিণেশ্বর গিয়া ঘাটে থেকে উঠে একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, পরমহংস কোথায়? তিনি উত্তর দিকের বারান্দায় তাকিয়া ঠেসান দেওয়া এক ব্যক্তিকে দেখিয়ে বল্লেন, এই পরম হংস?...তাকিয়ার অতি নিকটে তাঁহার ডান পাশে একটি বাবু বসে আছেন। শুনলাম তার নাম রাজেন্দ্র মিত্র যিনি বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের এ্যাসিসটাণ্ট সেক্রেটারী হয়েছিলেন।...একটু পরেই রাজেন্দ্রবাবুকে বল্লেন, দ্যাখো দিখিনি, কেশব আসছে কিনা। একজন একটু এগিয়ে ফিরে এসে বল্লেন, না! আবার একটু শব্দ হতে বল্লেন. দ্যাখো আবার দ্যাখো। এবারও একজন দেখে এসে বল্লেন, না। অমনি পরমহংসদেব হাসতে হাসতে বল্লেন, পাতের উপর পড়ে পাত— রাই বলে ওই এল বুঝি প্রাণ নাথ।...৩৪১/৪২ পৃ

...কিছুকাল পরে সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় কেশব দলবলসহ এসে উপস্থিত।...এসে যেমন ভূমিষ্ঠ হয়ে ওকে প্রণাম করলেন, উনি ঠিক তদ্রূপ করে একটু পরে মাথা তুললেন। তখন সমাধিস্থ...সমাধি ভঙ্গের পরে কেশব-বাবুকে বললেন, একদিন তোমার ওখানে গেছলাম, শুনলাম তুমি বলছো, ভক্তি নদীতে ডুব দিয়ে সচ্চিদানন্দ সাগরে গিয়ে পড়বো। আমি তখন উপর পানে তাকাই যেখানে কেশববাবু স্ত্রী ও অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ বসেছিলেন আর ভাবি, তাহলে এদের দশা কি হবে?...তোমরা ভক্তি নদীতে একবার ডুব দেবে আবার উঠবে আবার ডুব দেবে আবার উঠবে এমনি চলবে...। ৩৪২ পৃ

কেশব বাবু বললেন, গৃহস্থর কি হয় না! মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরমহংসদেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; দেবেন্দ্র দেবেন্দ্র দুই তিনবার বলে উদ্দেশে

ক'বার প্রণাম করলেন, তারপর বললেন, তা জানো এক জনার বাড়ী দুর্গোৎসব হতো, উদয়াস্ত পাঁঠাবলি হ'তো। কয়েক বৎসর পরে আর বলির সে ধূমধাম নাই। সে বললে, এখন দাঁত পড়ে গেছে। দেবেন্দ্রও এখন ধ্যান ধারণা করছে, তা করবেই ত। তা কিন্তু খুব মানুষ। ৩৪৩ পৃ

আর একদিন বোধ হয় ১৮৮৩ সনে শ্রীরামপুরের কয়েকটি যুবক সঙ্গে নিয়ে গেছলাম। সেদিন তাদের দেখে বললেন, এরা এসেছেন কেন? আমি বললাম, আপনাকে দেখতে। ঠাকুর,—আমায় আবার দেখবে কি এরা বিলডিং টিলডিং দেখুন না? আমি—এরা তা দেখতে আসে নাই, আপনাকে দেখতে এসেছে। ঠাকুর—তবে বুঝি চক্‌মকি পাথর···। ৩৪৪ পৃ

আর একদিন গেছি। প্রণাম করে বসেছি, বলিলেন: সেই যে কাক্‌ খুললে ফস্‌ফস করে উঠে একটু টক্‌ একটু মিষ্টি তার একটা এনে দিতে পার? আমি বললাম, লেমনেড? ঠাকুর বললেন আন না? মনে হয় একটা (আনিয়ে) দিলাম।... ৩৪৪ পৃ

(অশ্বিনী কুমার) বরিশালের অচলানন্দ তীর্থাবধূতের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বলাতে বল্লেন, সেই কোতরঙ্গের রামকুমার ত?···তাকে কেমন লাগলো। আমি—খুব ভাল লাগলো। ঠাকুর, আচ্ছা সে ভাল না আমি ভাল? আমি—তাঁর সঙ্গে কি আপনার তুলনা হয়? তিনি পণ্ডিত, বিদ্বান লোক আর আপনি কি পণ্ডিত জ্ঞানী? উত্তর শুনে একটু অবাক হ'য়ে চুপ করে রইলেন। এক আধ মিনিট পরে আমি বল্লাম,—তা তিনি পণ্ডিত হ'তে পারেন, আপনি মজার লোক। আপনার কাছে খুব মজা! এইবার হেসে বললেন, বেশ বলেছ ঠিক বলেছ। ৩৪৫।৪৬ পৃ

এতক্ষণ মেঝেয় বসে কথা হচ্ছিল; এখন তক্তাপোষের উপরে উঠে লম্বা হয়ে শুলেন। আবার বল্লেন, হাওয়া কর। আমি হাওয়া করতে থাকলাম।···একটু পরে বল্লেন, বড্ড গরম গো পাখাখানা একটু জলে ভিজিয়ে নাও। আমি বল্লাম, আবার শৌক (সখ) ত আছে দেখছি। হেসে বল্লেন কেন থাকবে নি। ক্যানো থাকবে নি। আমি বল্লাম, তবে থাক থাক, খুব থাক! সেদিন কাছে বসে যে সুখ পেয়েছি সে আর বলবার নয়। ৩৪৭ পৃ

(অশ্বিনী দত্তকে) ওগো তুমি ত উকিল। উঃ বড় বুদ্ধি। আমায় একটু বুদ্ধি দিতে পার। তোমার বাবা যে সেদিন এসেছিলেন, এখানে তিন দিন ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁকে কেমন দেখলেন? বল্লেন, বেশ লোক, তবে মাঝে মাঝে হিজিবিজি বকে। আমি বল্লাম, এবার দেখা হলে হিজিবিজিটা ছাড়িয়ে দেবেন।

একটু হাসলেন। ৩৪৭ পৃ

সমাধিভঙ্গ হলো, পায়চারী করতে লাগলেন। ধুতি যা পরা ছিল তা দুই হাত দিয়ে টানতে টানতে একেবারে কোমরের উপর তুলছেন, এদিক দিয়ে খানিকটা মেঝে ঝেটিয়ে যাচ্ছে, ওদিক দিয়ে খানিকটা ওমনি পড়ছে। আমি আর আমার সঙ্গী টেপাটেপি করছি আর চুপি চুপি বলছি, ধুতিটা পরা হয়েছে ভালো। একটু পরেই 'দুর শালার ধুতি' বলে ধুতিটা ফেলে দিলেন। দিয়ে দিগম্বর হয়ে পায়চারী করতে লাগলেন। উত্তর দিক থেকে কার যেন ছাতা ও লাঠি আমা'দর সম্মুখে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, এ ছাতা লাঠি তোমাদের? আমি বল্লাম, না। আগেই বুঝেছি, এ তোমাদের নয়, আমি ছাতা লাঠি দেখে মানুষ বুঝতে পারি। সেই একটা হাউ মাঁউ করে কতকগুলো গিলে গেল, এ তারই নিশ্চয়।

কিছু কাল পরে ঐ ভাবেই খাটের উত্তর পাশে পশ্চিমমুখো হয়ে বসে পড়লেন। বসেই আমায় জিজ্ঞাসা—ও গো আমায় কি অসভ্য মনে করছ? আমি বল্লাম, না আপনি খুব সভ্য। আবার এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন? ঠাকুর—আরে শিবনাথ টিবনাথ অসভ্য মনে করে। ওরা এলে কোন রকমে একটা ধুতি টুতি জড়িয়ে বসতে হয়। ৩৪৮ পৃ

ঠাকুরের সঙ্গেও মাত্র চার পাঁচ দিনের দেখা, কিন্তু ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই এমন হয়েছিল যে তাঁকে (ঠাকুরকে) মনে হত যেন এক ক্লাশে পড়েছি, কেমন বেয়াদবের মত কথা বলেছি; সম্মুখ থেকে সরে এলেই মনে হ'ত ওরে বাপরে কার কাছে গেছলাম। ৩৪৯ পৃ

অমিয়বাণী। শ্রীশ্রীবিশ্বরঞ্জন

...অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটা সত্য ঘটনা বলছি। আমার গুরুদেব তখন সিমলায়; তিনি যেখানে বসিয়া তাহার কিছুদূরে বসিয়া কোনও

এক সম্প্রদায়ের কয়েকটি সাধু গীতার সার—সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজঃ এই শ্লোকটির সমালোচনা করিতে লাগিলেন…সত্যকথা বলা ধর্ম্ম, অহিংসা ধর্ম্ম শমদম ইত্যাদি ধর্ম্ম—এই সব ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর মাং অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হও অর্থাৎ জাল, জুয়াচুরি, মিথ্যা কপটতা আশ্রয় করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হও, সব পাপই শ্রীকৃষ্ণ ক্ষয় করিয়া দিবেন ইহা শুনিয়া আমার গুরুদেব উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—বাঃ অতি অপূর্ব্ব।

কোন সময় আমি একদল সন্ন্যাসীর মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিলাম। তাহারা সকলে সিদ্ধি খাইয়া মশারির নীচে বসিয়া প্রাণায়াম আরম্ভ করিল। আমি মশারির মধ্যে বসিয়া জপ ধ্যান করিব ভাবিয়াছিলাম কিন্তু শুনি আমার চারিদিকে কেবল ভোঁস ভোঁস শব্দ হইতেছে কামারদের হাপরের মত। চুলোয় গেল আমার জপ ধ্যান।…সকালে উঠে জিজ্ঞেস করায় কেউ কেউ বললে, ২০।২৫ বৎসর যাবৎ এরূপ করছে, কিন্তু কি যে লাভ হয়েছে বলতে পারল না। তবে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে এখন আর ছেড়ে দিতে পারে না। ৩৫ পৃ

…কাশীতে শেষ রাতে উঠে রাস্তায় চলছি, এমন সময় রাস্তার অপর পার হতে "আঃ উঃ" এইরূপ যন্ত্রণাসূচক শব্দ আসছে। লক্ষ্য করে গিয়ে দেখি, একটি সন্ন্যাসী রাস্তায় পড়ে আছেন, হাতটা ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছে। তৎক্ষণাৎ তাকে রামকৃষ্ণমিশন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। পুরান ছেঁড়া কৌপীন ছাড়িয়ে নূতন কাপড় পরাতে গেলে, সে কিছুতেই পুরান কৌপীন ছাড়তে রাজী হল না। পরে দেখা গেল কৌপীনের ভিতর দুখানা দশ টাকার নোট রয়েছে। ১০৬ পৃ

আমার যখন এই অবস্থায় আছি সেই নির্জ্জন স্থানে, তখন এক দিন একটি মুণ্ডিত মস্তক বালক ব্রহ্মচারী আসিয়া হাজির। আমি তখন পাহাড় হইতে নামিতেছিলাম, সে নীচে দাঁড়াইয়া! কি ভাব ভক্তি—দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, আমি যাহাকে চাই সেই আপনি দয়া করিয়া আপনার সঙ্গদান করুন…ইত্যাদি ভক্তির কথা! ভক্তির দৌড় এত বাড়িয়া গেল, যে একদিন আমি একটু দূরে মূত্রত্যাগ করিয়া আসিয়াছি দেখি সে ঐদিকে যাইতেছে। জানতাম পা

ধোয়াইয়াই লোকে চরণামৃত নেয়, কিন্তু আর কিছু দিয়াও যে চরণামৃত নেওয়া চলে তা জানতাম না। তাকে অতি কষ্টে বারণ করা গেল। তাকে খাইয়ে দাইয়ে নিজের কম্বলখানা পেতে শুতে দিলাম। সকাল বেলা উঠে দেখি সে নেই, তাহাকে যে বিছানা দেওয়া হয়েছিল, তাহাও নাই। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কয়েকখানা কৌপীনও উধাও! ১১০ পৃ

আর একটি লোকের জেল হয়। সে জেলে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে ভাবত, আমি ত মরে গেছি আমি কি করে খাব দাব। ভাবতে ভাবতে সত্য সত্যই সে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিলে।...একজন বিজ্ঞ ডাক্তার ডাকা হল, তিনি সব দেখে শুনে, কোন ওষুধের ব্যবস্থা না করে নিজের চাকরকে রোগীপার্শ্বে শোয়াইয়া দিলেন এবং তাকে শিখাইয়া দিলেন সেও যেন ঐ পাগলটার মত কম্বল মুড়ি দিয়ে বলতে থাকে, আমি মরে গেছি আমি মরে গেছি। এবার রোগী দেখল তার একটা সাথী জুটেছে। তখন দুটি মরামানুষ একই ভাবে দিন কাটাতে লাগল। আস্তে আস্তে ডাক্তারের নির্দ্দেশ মত চাকরটা রোগীর সাথে সুখ দুঃখের কথা বলতে লাগল। খাবার দিয়ে গেলে বলতো, মরলেও খাওয়া চলে, চল খাওয়া যাক। এই বলে দুজন একটু একটু খেত। ক্রমে ক্রমে চাকর বলতে লাগল—ওহে মরলেও চলা যায়—চল আমরা একটু হেঁটে বেড়াই। এইভাবে দুজনে খাওয়া দাওয়া চলাফেরা করতে লাগল। পরে একদিন চাকর বললে, ওহে আমিও মরি নাই, তুমিও মর নাই। রোগী তখন বললে, হ্যাঁ হে তাইতো আমিও মরি নাই তুমিও মর নাই। ১৭৬ পৃ

এক ব্যক্তি জপ ধ্যান করিতে বসিয়া কিছুতেই তন্ময় হইতে পারে না। গুরু তাকে বললেন, তোমার যে বস্তু অতি প্রিয় তাহাই ধ্যান কর। তার প্রিয় ছিল একটি মহিষ! সে মহিষটার কথা ভাবতে লাগিল এবং ভাবতে ভাবতে এত তন্ময় হইয়া গেল, যে গুরু তাহাকে ঘরে আসিতে আজ্ঞা করিলে, বলিয়া উঠিল, আমি কি করে বাইরে আসবো, আমার শিং দুটো যে মস্ত বড় দরজায় ঠেকে যাবে যে। সে মহিষের ভাবনায় এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছিল—যে তাহার অন্তর হইতে মনুষ্য সংস্কার মুছিয়া গিয়াছিল। ১৪৩ পৃ

সাধু নাগমহাশয় ॥

নাগমহাশয়ের বাটির পার্শ্বের একখানি জমিতে তাঁহার ভগ্নী সারদামণি

একটি লাউগাছ লাগাইয়াছিলেন। গাছটি বেশ সতেজ হইয়া উঠিতেছিল। একদিন গাছের কাছে পাড়ায় কোন লোক গরু বাঁধিয়া দিয়া যায়। কিন্তু দড়িটি এত ছোট করিয়া বাঁধিয়াছিল যে, গাভী লাউগাছটির লোভে বারবার তাহার সন্নিধানে যাইবার চেষ্টা করিলেও কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিলে না। নাগমহাশয় গাভীকে এইরূপ উপর্যুপরি বিফলমনোরথ হইতে দেখিয়া—খাও মা, খাও বলিয়া তাহার দড়িটি খুলিয়া দিলেন। গাভী মনের সাধে লাউগাছ খাইতে লাগিল। দীন দয়াল অবাক হইয়া পুত্রের কার্য্য দেখিলেন, তারপর ভৎ‍র্সনা করিয়া বলিলেন, নিজে তো উপার্জ্জন কর না সংসারের যাহাতে হিত হয় সেরূপ করা দূরে থাক—এরূপ অনিষ্ট করা কেন? ৪৫ পৃ

ডাক্তারী ছেড়ে দিয়ে তো বসলি, এখন কি করে দিন কাটাবি!

নাগমহাশয়—যা হয় ভগবান করবেন!

দীনদয়াল—হ্যাঁ তা জানি, এখন ন্যাংটো হয়ে চলবি, আর ব্যাঙ খেয়ে থাকবি।

নাগমহাশয় আর কোন উত্তর করিলেন না; পরিধেয় বস্ত্রপরিত্যাগ করিয়া, উঠানে একটি মৃত ব্যাঙ পড়িয়াছিল, তাহা কুড়াইয়া আনিয়া খাইতে খাইতে পিতাকে বলিলেন, এক্ষণে আপনার দুই আজ্ঞাই প্রতিপালন করিলাম। খাওয়া পরার জন্য আর চিন্তা করিবেন না। ৪৬ পৃ

নারায়ণগঞ্জের কোন বিশিষ্ট ভদ্রলোক একদিন নাগমহাশয়ের শ্বশুরবাটিতে বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় কতকগুলি অযথা দোষারোপ করেন। নাগমহাশয় (সেখানে ছিলেন) অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে নিরস্ত হইতে বলিলেন; কিন্তু তিনি যতই বিনয় করিতে লাগিলেন, লোকটির বাক্য ততই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতে লাগিল।...নাগমহাশয়ের চক্ষু দিয়া অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, ক্রোধে জ্ঞান শূন্য হইয়া লোকটির পৃষ্ঠে পাদুকাঘাত করিতে করিতে বলিলেন, বেরোও শালা এখান থেকে এখানে বসে ঠাকুরেরনিন্দা!···গিরিশবাবু এই ঘটনা শুনিয়া নাগমহাশয় কলিকাতায় আসিলে জিজ্ঞাসা করেন আপনি ত জুতো পরেন না, তা তাকে মারতে জুতো পেলেন কোথায়...নাগমহাশয় বলিলেন, কেন তার জুতা দিয়েই তাকে মারলাম! ৬১ পৃ

নাগমহাশয় কখন চাকর রাখিতেন না। তিনি দেশে থাকিতে লোক নিযুক্ত

করিয়া গৃহসংস্কার করিবার জো ছিল না। নাগমহাশয় যখন স্থানান্তরে থাকিতেন, মাতাঠাকুরানী সেই সময় জঙ্গল কাটাইয়া, চাল ছাওয়াইয়া গৃহসংস্কার করাইয়া রাখিতেন। একবার নাগমহাশয় দীর্ঘকাল দেশে থাকায় তাহার সমস্ত ঘরগুলি অব্যবহার্য হইয়া পড়িয়াছিল, চাল দিয়া জল পড়িত। ঘর নূতন করিয়া ছাওয়াইবার জন্য মাতাঠাকুরানী একজন ঘরামী নিযুক্ত করিলেন। ঘরামী বাটিতে প্রবেশ করিবামাত্র নাগমহাশয়, হায় হায় করিতে লাগিলেন, তাহাকে বসাইয়া তামাক সাজিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পরে ঘরামী চালে উঠিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিল। হায় হায় করিতে করিতে নাগমহাশয় তাঁহাকে নামিয়া আসিতে বলিলেন, বিনয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঘরামী কিছুতেই নামিল না। তখন আর নাগমহাশয় স্থির থাকিতে পারিলেন না, কপালে করাঘাত করিতে বলিলেন, হায় ঠাকুর তুমি কেন আমায় এই গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে আদেশ করিয়া গেলে, আমার সুখের জন্য অন্য লোক খাটিবে ইহা আমাকে দেখিতে হইল। ধিক এ সংসারাশ্রমে। তাঁহার এই ব্যাকুলতা দেখিয়া ঘরামী নামিয়া আসিল। সে নামিবামাত্র নাগমহাশয় আবার তামাক সাজিয়া দিয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। ৬৯ পৃ

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী। মহেন্দ্রনাথ দত্ত

তাঁহার (শশীমহারাজ) একটি প্রিয় জিনিষ ছিল—কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মুড়ি খাইতে তিনি বড় ভাল বাসিতেন। একবার করিয়া মুড়ি মুখে দিতেছেন, আর একবার করিয়া কাঁচা লঙ্কায় কামড় দিতেছেন, যখন দুই চক্ষে জল তখন তাঁর কাঁচা লঙ্কা খাওয়া সাব্যস্ত হইত। ২৯ পৃ

বাবুরাম মহারাজ বরাহনগর মঠে যেমন সাধন ভজন করিতেন, আলমবাজার মঠে ততোধিক সাধনভজন করিতে লাগিলেন। অনেকদিন মধ্যাহ্নে আহারের পর মাথায় গামছাখানি ঢাকা দিয়া কোঁচরে কাপড়খানি গায়ে দিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়া পঞ্চবটিতে বসিয়া জপ করিতেন এবং বিকেল বেলা ফিরিয়া আসিতেন। বাবুরাম মহারাজ এসময় গৈরিকবসন পরিধান করিতেন না, সাদা কাপড় পরিতেন এবং সন্ন্যাসীর বাহ্যিক চিহ্ন রাখিতেন না। কালী বেদান্তী অতি সতর্ক লোক, বাহিরের সিঁড়ির কাছে রাস্তার দিকে যে জানলাটি ছিল সেইখান থেকে বাবুরাম মহারাজকে বাহির হইতে দেখিয়া বলিতেন, বাবুরাম এবার চরা করতে বেরুল, আর কি—দিন কাটিয়ে আসবে! ৪৬ পৃ

একদিন বাবুরাম মহারাজ বর্ত্তমান লেখকের সহিত চৈতন্যচরিতামৃত সম্বন্ধে নানাবিধ কথা কহিতে লাগিলেন। প্রসঙ্গক্রমে কথা উঠিল যে চৈতন্য মহাপ্রভু বরাহনগরে আসিয়াছিলেন। হঠাৎ দুইজনের ইচ্ছা হইল যে, সেই স্থানটি দর্শন ও প্রণাম করিয়া আসে...দুইজনে দুপুরবেলা রৌদ্রে অনেক ঘুরিয়া ও স্থানটি আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া মণি মল্লিকের গঙ্গা ধারের বাগান 'তটিনী কুটিরে' প্রবেশ করিলেন। ভাগ্যক্রমে মণি মল্লিক সেদিন বাগানে গঙ্গার ধারের বৈঠকখানা ঘরে উপস্থিত ছিলেন। বাবুরাম মহারাজের সহিত অনেক কথাবার্তা হইতে লাগিল। মণি মল্লিক বলিলেন, আমরা সংসারী লোক—ভোগ বিলাসে থাকি আমাদের আবার মুক্তি কোথায় হবে? আর আপনারা সাধু সন্ন্যাসী—যেন কামধেনু, সামান্য জটেবুড়ি (জড়িবুটি) খেয়ে অমৃত দুধ দিয়ে থাকেন। জটে বুড়ির কথা শুনিয়া উভয়ের হাসিতে হাসিতে পেট ফুলিয়া উঠিল। ৪৯ পৃ

একদিন শীতকালের প্রথমে বাবুরাম মহারাজ বর্তমান লেখককে সঙ্গে লইয়া আলমবাজারের গ্রামের ভিতর বেড়াইতে যাইলেন। পথে যাইতে যাইতে তিনি খুব তন্ময় হইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা কহিতেছিলেন। পথিমধ্যে একখানি গোলপাতার ঘরের চালে লাউ ও লাউডগা দেখিতে পাইলেন। বর্তমান লেখক বলিলেন, ডগাগুলি যেন ল ল কচ্ছে, লাউডগা ভাতে দিয়ে খেতে বড় ভাল লাগে। বাবুরাম মহারাজ এত সরল ও অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন যে, এই কথা শুনিয়া নিঃসঙ্কোচে সেই গোল পাতার বাড়ীতে ঢুকিয়া প্রৌঢ়া স্ত্রীলোককে বলিলেন, গ্যাখ তোমাদের লাউডগা বেশ হয়েছে, আমাদের কিছু দাও—আমরা ভাত দিয়ে খাব! তিনি এমন সরল ও মিষ্টি বাক্যে কথা গুলি কহিলেন যে স্ত্রীলোকটি অতি আগ্রহে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া লাউডগা কাটিয়া বাবুরাম মহারাজকে দিলেন। ৫১ পৃ

চৌধুরী মহাশয় আলমবাজারের মঠে আসিলে যোগেন মহারাজের পিতা বলিয়া সকলেই তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। তিনি আসিয়াই প্রথমে সুরু করিতেন, আর আমার বেঁচে সুখ নাই, বাপের নামে বেটার পরিচয় হয়, আর আমার কিনা বেটার নামে বাপের পরিচয়! যেন নন্দ ঘোষের দশা নন্দের বেটা কেউ ত বলে না, কেষ্টর বাপ নন্দই সকলে বলে থাকে। আর আমি

যেখানে যাই সেখানে যোগের বাপ বলে সকলে সম্মান করে আর আমার বেটা যোগে কেউ বলে না। একেই বলে পোড়া কপাল। ৫৪ পৃ

কৌতুক রহস্যেও শরৎমহারাজ বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। একদিন সকলে গঙ্গাস্নান করিয়া মঠের দিকে ফিরিয়া আসিতেছিলেন এমন সময় একটা গরু এক স্থান হইতে অপর এক স্থানে গিয়া শুইয়া রহিল। বর্ত্তমান লেখক, বলিলেন "এই বৃষটি এই বাড়ীরই হইবে কারণ এই স্থানটা ওর অভ্যস্তস্থান বলিয়া এইখানে শুইয়া রহিল।" শরৎ মহারাজ কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "ঠিক বলেচ—এটা ঠিক মাতাল ও গুলিখোরের স্থান নির্ণয়ে! তবে একটা গল্প বলি শোন" এই বলিয়া তিনি এক গল্প বলিতে সুরু করিলেন,দেখ দুই বন্ধু—এক মাতাল ও এক গুলিখোর রাস্তায় যাইতে যাইতে এক হালুইকরের দোকানে গিয়া খাবার কিনিল। হালুইকরের দোকানে তখন ভাঙান পয়সা ছিল না। সেইজন্য ছয় আনা খাবার কিনিয়া দশ আনা পয়সা পরদিন আসিয়া লইবে স্থির করিল। উভয়ে খানিক দূর চলিয়া গেলে, গুলিখোর বলিল, ভাই, স্থানটি নির্ণয় করিয়া যাইতে হইবে। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে একটা সাদা ষাঁড় দোকানের সামনে শুইয়া আছে। গুলিখোরটি বলিল, ঠিক হয়েছে, একটা সাদা ষাঁড় শুয়ে থাকে, ওই হল ঠিক চিহ্ন। পরদিন সন্ধ্যার সময় উভয়ে নেশা করিয়া দশ আনা পয়সা আদায় করিতে আসিয়াছে। ঘটনাক্রমে সাদা ষাঁড়টি এক লম্বা দাড়িওয়ালা দর্জির দোকানের সম্মুখে শুইয়া আছে, উভয়ে যাইয়া লম্বা দাড়িওয়ালা দর্জিকে তম্বিতম্বা—দশ আনা পয়সা দাও। দোকান ত ভুল হয় নাই প্রমাণ ত ঠিকই রহিয়াছে কারণ সেই সাদা ষাঁড় সম্মুখে শুইয়া আছে। গুলিখোর বন্ধুটি বলিল, কি বাবা, দশগণ্ডা পয়সা ফাঁকি দেবার জন্য একেবারে ভোল ফিরিয়েছ? কাল ছিলে হালুইকর আর আজ হলে দর্জি, আর বাবা রাতারাতি দাড়ি গজিয়ে ফেল্লে। এখনও তার সাক্ষী সাদা ষাঁড়টি শুয়ে রয়েছে—গুলি খাই বলে মনে করোনা বাবা আমার ভুল হয়েছে।/ ৭৩-৭৪ পৃ

কাশীধামে ৯০ বৎসরেরও অধিক এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। চক্ষু নাই, দৃষ্টিহীন কেবল শ্বাস প্রশ্বাস আছে। সকালে তাহাকে বাহিরে বাহির করিয়া একখানি পিঁড়িতে বসাইয়া আর একখানি পিঁড়ে পিঠে ঠেস দিয়া রৌদ্রে

রাখিয়া তাঁহার আত্মীয়রা চলিয়া যাইতেন। কুলীন ব্রাহ্মণ, বহু বিবাহ করিয়াছিলেন এবং নামগুলি পাছে বিস্মৃত হন, সেইজন্য একখানি খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। 'বৃদ্ধের বিবাহ' মানে ছিল অর্থ উপার্জ্জন। কালী বেদান্তী ইহারা অল্পবয়সী ও অপর সকলে যাইয়া সেই জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধকে বলিতেন, একটা বে করিবে! ভাল সম্বন্ধ আছে। বৃদ্ধ ক্ষীণ অস্পষ্ট স্বরে বলিতেন, কত দেবে? তাহা শুনিয়া সকলে সময়োপযোগী গালিগালাজ দিয়া তাঁহাকে বলিতেন, খাট দেবে, কাঠ দেবে, প্যাঁকাটি দেবে? কিন্তু বৃদ্ধটি শুনিতে না পাইয়া পুনঃ পুনঃ বলিতেন, কত দেবে? আর কালীবেদান্তী এবং অন্যান্য ব্যক্তিরাও বলিতেন খাট দেবে, কাঠ দেবে, প্যাঁকাটি দেবে? আর কিছু দেবে না? বৃদ্ধ বলিত। ১৩৩ পৃ

নরেন্দ্রনাথ অতিশয় তামাকপ্রিয় ছিলেন এবং বহুবার খাইতেন। পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়া তামাক খাইতে অসুবিধা হওয়ায় নরেন্দ্রনাথ চটিয়া যাইলেন। একদিন একস্থানে রাত্রি যাপন করিলেন। শরৎ মহারাজ নরেন্দ্রনাথের জন্য একটু দাকাটা তামাক ও কল্কে সঙ্গে রাখিতেন। নরেন্দ্রনাথের তামাক খাওয়ার অসুবিধা হওয়ার জন্য ক্রোধে তামাক ও কল্কে টানিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন—কল্কেটা ভাঙ্গিয়া গেল। মহা-বৈরাগ্য, তামাক আর খাইবেন না। শরৎ মহারাজের একশিরা ফুলিয়াছিল এই জন্য তিনি সেই স্থানটিতে দোক্তাপাতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে শরৎমহারাজও (ঐ) দোক্তাপাতা টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সকলেই রাত্রিতে শুইয়া রহিলেন। খানিক রাত্রে নরেন্দ্রনাথ উঠিয়া বালকের মতন আব্দার ধরিলেন, শরৎ তামাক খাওয়া শরৎ তামাক খাওয়া। শরৎমহারাজও বলিতে লাগিলেন, এখন তামাক কোথায় পাব? তুমি বললে, তামাক আর খাব না, টেনে সে সব ত ফেলে দিয়েছ তাতে কল্কেও ভেঙ্গে গেছে। নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, দুঃশালা আরে তখন বলেছিলাম এখন কি তার? আরে খোঁজনা সে সবগুলো কোথায় পড়ে আছে। শরৎমহারাজ তখন হাসিতে হাসিতে অন্ধকারে চারিদিকে হাত বুলাইতে বুলাইতে সেই ভাঙ্গা কোল্কেটা পাইলেন। শরৎমহারাজ তখন নরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, এই নাও তোমার ভাঙ্গা কোল্কেটা পেয়েছি, তামাক

আর কোথায় (১৫০) পাব? নরেন্দ্রনাথ তখন বলিলেন আরে তোর সেই পায়ের বাঁধা দোক্তাগুলো কোথায় খুঁজে দেখ না। অবশেষে সেই দোক্তাপাতাগুলি হাতড়ে হাতড়ে খুজে পেয়ে হাতে রোগড়ে কোল্কেতে ভরে দেশলাই জেলে একটু আগুন করে দুই জনে হাতে করে সেই ভাঙ্গা কল্কেতে টান মারতে লাগলেন...। ১৪৯ পৃ

হৃদু মুখুজ্জে দক্ষিণের কালীবাড়ী ত্যাগ করিয়া অন্তত্র কিছুদিন কাজ কর্ম করিয়াছিলেন। তাহার পর কাঁকুড়গাছি রামচন্দ্রদত্তের যোগোদ্যানে পূজারী নিযুক্ত হন কিন্তু নানা কারণবশতঃ সেই কার্য হইতে তাঁহাকে অপসারিত করা হইয়াছিল। তাহার পর তিনি তসরের কাপড়ের পুঁটলি লইয়া পরিচিত বাড়ীতে বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেন। একদিন কাপড়ের পুঁটলি লইয়া আলমবাজারের মঠের সম্মুখ দিয়া বেলা ৯৷৷৹টা ১০টার সময় যাইতেছিলেন—হঠাৎ তাঁহার মঠে একবার তামাক খাইয়া যাইতে ইচ্ছা হইল, তিনি বড় ঘরটিতে পুঁটলিটি রাখিয়া ভিতর বাড়ীতে আসিয়া ঠাকুর প্রণাম করিয়া শিবানন্দ স্বামীর কাছে তামাক খাইতে গেলেন। শিবানন্দ স্বামী তখন ভিতর বাড়ীর দক্ষিণ দিকের বারান্দায় ও পূর্বদিকের ফাঁকা ছাতের সঙ্গমস্থলে বসিয়া একটি ছোট হুঁকায় তামাক খাইতেছিলেন। নিরঞ্জন মহারাজ পূর্বদিকের খোলা ছাত ও ঠাকুরের ভাঁড়ারের দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন, কি মুখুজ্জে! কেমন আছ? হৃদু মুখুর্জ্জে বলিলেন, আর দাদা—মরে আছি, আর কি সেদিন আছে? মামা গেছেন, তার সঙ্গে আমার প্রাণও চলে গেছে; খালি দেহটা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তবে পেটটা ত আছে; তাই কিছু চেষ্টা কর্তে হয়।

শিবানন্দ স্বামীর হাত থেকে হুঁকাটি লইয়া হৃদু মুখুজ্জে উপু হইয়া বসিয়া বার কতক তামাক টানিলেন। শিবানন্দ স্বামী বলিলেন, হাঁ হে মুখুজ্জে, তিনি যখন কেশববাবুর বাড়ীতে গিয়েছিলেন, তুমি ত সঙ্গে ছিলে —কি সব হয়েছিল একবার বলত। হৃদু মুখুজ্জে বলিতে লাগিলেন, একটা গাড়ী ক'রে মামার সঙ্গে আমি ক্যাশব বাবুর বাড়ী চ'ললাম। গাড়িতে আমি মামাকে বলিতে লাগিলাম, ক্যাশব বাবু বড় মানুষ, বড় লোক তার বাড়ীতে গিয়ে তুমি এমন বেফাঁশ এলোমেলো কথা বল কেন? তুমি

বড়'—'। এই রকম বলিতে বলিতে গাড়িতে চলিলাম। মামা তখন একখানা লাল পেড়ে ধুতি পরে আছেন। ক্যাশববাবুর বাড়ীতে গাড়ী পৌছলে যত্ন ক'রে তাহারা ক্যাশববাবুর ঘরে লয়ে গেল। ক্যাশববাবু যত্ন করিয়া অগ্রসর হইয়া মামাকে বসাইতে গেলে মামা বলিতে লাগিলেন, ও ক্যাশব আমি তোমায় কি বলেছি? হৃদু তাই পথে আমায় বোকছিল আর আমায় এই কথা বলে ('—') গাল দিচ্ছিল। ক্যাশববাবুর কাছে তখন জনকতক লোক বসেছিল, ক্যাশববাবু আহ্লাদ করিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, হৃদু আপনাকে রাস্তায় কি বলে গাল দিয়েছে। মামা আবার সেই কথাটি বলিলেন তখন ক্যাশববাবু উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলেন আবার একটু পরে জিজ্ঞাসা বল্লেন, হৃদু আপনাকে কি বলে গাল দিয়েছে? মামা আবার সেই কথাটি বল্লেন। ক্যাশববাবু আরও উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলেন। মামার সরল গ্রাম্য কথা ক্যাশববাবুর কর্ণে যেন অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল আর সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন। তারপর ক্যাশববাবু আনন্দ ও কৌতুকচ্ছলে জিজ্ঞাসা করেন, আজকে কি মনে করে এসেছেন? মামা বললেন, ক্যাশবের মন ভোলাতে এই দূতীগিরি করবো বলে এসেছি। এই বলিয়া তাঁহার পরণের লালপেড়ে কাপড়খানি মাথার ঘোমটার মত দিয়া দূতী সাজিলেন, এবং ক্যাশববাবুর মুখের কাছে হাত নেড়ে দূতী সংবাদ গাহিতে লাগিলেন। ক্যাশববাবু আনন্দে উল্লসিত হইয়া তাড়াতাড়ি খোল লইয়া নিজেই বাজাইতে লাগিলেন আর মামা নৃত্য করিয়া দূতী সংবাদ গাহিতে লাগিলেন। ৫৫-৫৭ পৃ

১৮৯৫ সালে তিনি (হৃদু মুখুজে) দাক্ষিণেশ্বরে উৎসব দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। দুঃখ করিয়া তিনি একটি কথা বলিয়াছিলেন, যখন কেউ আসেনি তখন আমি মামার এত করে সেবা করেছিলুম কিন্তু এখন আমায় কেউ পোঁছে না। বেড়ালটা একবার দুধে মুখ দিয়েছে বলে তাকে কি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়। ৫৮ পৃ

স্বতন্ত্র গিরিশবাবু স্বতন্ত্র ভাব···তিনি একটি জটাধারীর গল্প আরম্ভ করিলেন, দেখ একদিন দুপুরবেলায় একটা জটাধারী ছাই মাখা চিম্‌টে হাতে সন্ন্যাসী এসে আমাদের ঠাকুর দালানে বসিল। সন্ন্যাসী দেখলেই ত মেয়েদের হাত দেখান

আছেই। আমি বৈঠকখানার ঘরের দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে কি বল্লে শুনতে লাগলুম। ঝি মাগি—সে বাড়ীর সব কথা আগেই তাকে বলে দিয়ে গেল। সন্ন্যাসী গণৎকার তখন ত কৃতবিদ্য। বাড়ীর মেয়েরা এসে যেমনি হাত দেখায় আর সন্ন্যাসী অমনি পট পট করে সব বলে দেয়। আমার ত রাগে গা গস্ গস্ করতে লাগলো। চুপ করে খানিকক্ষণ তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে শুয়ে রইলুম। যখন বুঝলুম মেয়েরা সব বাড়ীর ভেতরে চলে গেছে তখন আমি নেমে এলুম। এসে ঠাকুরদালানের সম্মুখের করবিগাছের গোটাকতক ডাল ভেঙ্গে নিয়ে এই আর কি সন্ন্যাসীকে মার আর তাড়া। সন্ন্যাসীও যত গালি দিয়ে পালাতে থাকে আমি তত করবিগাছের ডাল নিয়ে মারতে স্থরু কল্লুম। এই কথা বলিতে বলিতে তিনি এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসীর পলায়ন ক্রীড়া কবিতায় বর্ণনা করিতে লাগিলেন। ৬৪-৬৫ পৃ

একদিন গিরিশবাবু বলরামবাবুর ঘরটিতে বসিয়া বলিতে লাগিলেন, দেখ আমাদের একটা ছোঁড়া উড়ে চাকরছিল। কলতলাটা পেছল ছিল, সেখানে গিয়ে ধূপ করে সে পড়ে যায়—তাইতে তার ডান হাতটা মচকে গিয়ে বড় যন্ত্রণা হল ও ফুলে উঠল। উড়ে ছোঁড়াটা কাঁদতে লাগল। আমি বল্লুম, তুই এই টাকাটা নে—নিয়ে এক টাকার জিলিপি কিনে দক্ষিণেশ্বরে চলে যা। সেখানে এক সাধু আছে, তার কাছে খবরটা দিয়ে বলবি যে, আমার হাত ভেঙ্গে গেছে, আপনি হাত বুলাইয়া জায়গাটা ভাল করে দিন। চাকরটাও ঠিক সেইরূপ কল্লে। ফিরে এলে আমি জিজ্ঞাসা কল্লুম কিরে সাধু কি বল্লে? চাকরটা বল্লে, সাধু বল্লে ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু তখনও তোর হাতের হাড়টা বেঁকে রয়েছে, আর কিছু ফুলেও রয়েছে, আমি বল্লুম সাধু যখন বলেছে তখন তার নিশ্চয়ই ভাল হবে যা ভয় করিস না। তাহার পরদিন যখন সে কলতলায় গেছে, আবার পা পিছলে ধুপকরে পড়ে গেছে আর যেমনি পড়ে যাওয়া ওমনি যে হাড়ের গাঁটটা বেঁকে গেছলো সেটা ঠিক বসে পোড়লো। আহ্লাদ করে আমায় এসে দেখাসে। আমি বল্লুম, দেখলি সাধুর কথা কেমন ঠিক হয়! ৬৬-৬৭ পৃ

···যোগেন মহারাজ ও বর্তমান লেখক বলরামবাবুর বাড়ীর ছোট্ট ঘরটিতে বসিয়া আছেন,...বেলা চারিটা বা সাড়ে চারিটার সময় উপেন মুখুজ্জ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন···উপেন মুখুজ্জ্যে আহ্লাদ করিয়া বলিলেন, যে তিনি ১৩০০০

টাকা দিয়া একখানি বাড়ী কিনেছেন আর সেই সুখবরটি যোগেন মহারাজকে দিবার জন্ত আসিয়াছেন, উপেন মুখুজ্জ্যে যোগেন মহারাজকে গুরুর মত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন।...যোগেন মহারাজ তাহা শুনিয়া খুব আনন্দিত হইলেন! উপেন মুখুজ্জ্যে বলিলেন, আরও হাজার দুই টাকা বাড়ীটা মেরামত করিতে লাগিবে ' যোগেন মহারাজ বাবুরাম মহারাজের মার কাছ থেকে চারটে বড় বড় পানতুয়া আনিয়া উপেন মুখুজ্জ্যেকে খাইতে দিয়া এক গ্লাস জল ও একটা পান দিলেন।...পরে তিনি চলিয়া গেলেন। যোগেন মহারাজ তখন হর্ষিত হইয়া সামনের বারান্দায় পাইচারি করিতে করিতে কৌতুকচ্ছলে ডান হাতের তর্জ্জনী নাড়িতে নাড়িতে বলিতে লাগিলেন, দেখলি শ্যালা, আশীর্বাদ ফলে কি না? তুই শ্যালা ত আমায় মানবিনি, শ্যালা নিজের গোঁয়েতেই চলবি। দেখ, শ্যালা উপেনের বটতলার ছোট দোকানটি থেকে এখন কেমন কল্লে, শ্যালা তবুও তুই আমায় মান্‌বিনি! ৭০-৭১ পৃ (উপেন মুখোপাধ্যায় বসুমতীর মালিক ছিলেন)

কালীবেদান্তীর পীড়ার সময় কাশীপুরের ডাক্তার মতিলাল মুখোপাধ্যায় চিকিৎসা করিতে আসিয়াছিলেন। যদিও তিনি ব্রাহ্মভাবের লোক ছিলেন, কিন্তু শরৎ মহারাজের সহিত কথা কহিয়া এইরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, আলমবাজারের মঠের সন্নিকটে আসিলেই মঠে আসিয়া সকলের দেখাশুনা করিয়া যাইতেন...শীতকাল সকালে বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে, হাওয়াও চলিতেছে; বড় ঘরের সব দুয়ার জানালা বন্ধ। দুই তিন জন ভিতরে বসিয়া গায় সামান্ত কাপড় দিয়া জপ করিতেছেন; এমন সময় মতি ডাক্তার আসিয়া সহসা বড় ঘরটিতে ঢুকিলেন, সকল দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া তিনি বলিলেন, লেপ কাপড় গায় দেওয়া চলে কিন্তু ঘর গায়ে দেওয়া ত কখনই দেখি নাই। দোরগুলি খুলিয়া দিন। ৭৭ পৃ

আলমবাজারের মঠে বর্ষাকালে বিকালে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে। শরৎ মহারাজ ম্যালেরিয়ার জ্বরে ভুগিতেছিলেন তাই আক্ষেপ করিয়া অস্বাস্থ্যকর স্থানের নানা কথা কহিতেছিলেন···কেহ কেহ বলিলেন, বাঙ্গলা দেশ একেবারে ত্যাগ করিয়া পাহাড়ের কোন স্থানে গিয়া মঠ স্থাপন করিলে ম্যালেরিয়ার আর

ভয় থাকে না। অপর একজন বলিলেন, তিনি (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ) বাঙ্গলা দেশে থাকিয়া তপস্যা করিয়া গিয়াছেন, পচা ম্যালেরিয়ায়, দক্ষিণেশ্বরে তিনি জীবন কাটাইয়াছেন, বাঙ্গলাদেশ ত্যাগ করিয়া যাওয়া যাইতে পারে না।...হরিশ, যিনি দক্ষিণেশ্বরে ও কাশীপুর বাগানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে ছিলেন এবং মাথায় একটু গোল হওয়াতে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলেন, তখন উপস্থিত ছিল।...শরৎ মহারাজ হরিশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ভাই হরিশ আর ত এমন করে চলা যায় না।...হরিশ ভক্তি ভাবে করমর্দন করিতে করিতে শরৎ মহারাজকে বলিল, তা-তা-তা ভাই ও রকম করে চল্ চল্ চল্লে যদি ব্যামো হয়, তবে এমন করে চললে হয় না। এই বলিয়া পদদ্বয় উচ্চে তুলিয়া হস্তদ্বয় ভূমিতে রাখিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল।

ঊর্ধ্বপদে ভ্রমণ যাহাকে পিকক্ মার্চ বলে হরিশ তদ্রূপ করিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সকলে তাহা দেখিয়া হাসিতে লাগিল কিন্তু তাহার কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। তখন কোন ব্যক্তি তার পা দুটো ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। হরিশ দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, কেন শরৎ এই যে বল্লে পায়ে চল্লে ম্যালেরিয়া হয় তাই আমি হাতে চলছিলুম। ৭৯ পৃ

নাগমহাশয়বাবু একদিন গিরিশবাবুর ঘরে বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছিলেন, কথা প্রসঙ্গে গিরিশবাবু নাগ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁ নাগমশাই আপনার পিতার সহিত কি আপনার ধর্মমতের কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। এই কথা শুনিয়া নাগমহাশয় বলিয়া উঠিলেন, না না সে সব প্রভেদ মিটিয়া গিয়াছে ; আমার পিতাও সারাদিন জপ করেন। নাগমহাশয় আরও বলিলেন, তার পিতা যদিও সব সময় জপ করেন কিন্তু এখনও তাঁর ছেলের উপর যথেষ্ট ভালবাসা রয়েছে— নিজের ছেলে এ জ্ঞানটা এখনও রয়েছে। গিরিশবাবু বলিলেন, আপনার মতন এমন সন্তানকে স্নেহ ক'রবে এ তো সৌভাগ্যের কথা। নাগমহাশয় তখন বুক ও মাথা দোলাইয়া বালকের ন্যায় অঙ্গভঙ্গী করিয়া বলিতে লাগিলেন, তাতে কি হলো মশাই, এ যে নঙ্গর ফেলে দাঁড়টানা হচ্ছে—ছেলের উপর ভালবাসা রেখে জপ কল্লে, মনটা কতদূর আর এগোয় ? ৯৬ পৃ

যোগেন মহারাজ বরাহনগর বা আলমবাজার মঠ হইতে তীর্থ দর্শন করিতে চলিয়া যান। কিছুদিন তাঁহার আর কোন খবর পাওয়া যায় নাই।

বাবুরাম মহারাজের মাতা ও আর কতকগুলি স্ত্রীলোক বৈদ্যনাথ তীর্থদর্শন করিতে যান। স্ত্রীলোকের স্বভাবই এই—ঠাকুরদর্শন ও সাধুদর্শন করিবে। বৈদ্যনাথে বাবুরাম মহারাজের মাতা শুনিলেন যে, কয়েক মাইল দূরে একজন ত্যাগী যুবা সাধু আসিয়াছেন; তাহার খুব উন্নত অবস্থা এবং অনেকেই তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেছে। বাবুরাম মহারাজের মাতা অতি সরল প্রাণ—সঙ্গে কিঞ্চিৎ মিষ্টি লইয়া, এক পাণ্ডাকে সঙ্গে লইয়া সেই সাধুর আশ্রমে চলিলেন। পাণ্ডা পথে ত্যাগী বাবাজীর অনেক গুণ কীর্তন করিতে লাগিল। বাবুরাম মহারাজের মাতা মনে করিলেন—না জানি কি রকমই বা সাধু হইবে, কত বড়ই না তার জটা হইবে...অবশেষে দুইজনেই একটি বাগান বা তপোবনে পৌঁছিলে পাণ্ডাটি তৎক্ষণাৎ সাধুর নিকট চলিল ও হাত মুখ নাড়িয়া বাবুরাম মহারাজের মাকে সাধু কোথায় বসিয়া থাকেন তাহা দেখাইতে লাগিল। বাবুরাম মহারাজের মাতা সাধুর কাছে গিয়াই সাধুটিকে চিনিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, ওগো এযে আমাদের যোগীন এ আবার সাধু হবে কেন! এ যে আমাদের বাড়ীর ছেলে! হ্যারে যোগীন তুই বুঝি এখানে এসে সাধু হয়েছিস্ আর মেড়োদের কাছে রুটি খাচ্ছিস? কোথায় আছিস খবর দিসনি কেন? বাড়ী চ খাবি চ, তোর ভাত না খেলে পেটের অসুখ হয়, আর রোদ্দুরে বসে সাধুগিরি করতে হবে না। ১১৫ পৃ

শশীমহারাজ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে দুপুর বেলা একখানা লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া থাকিতেন। একে দারুণ গরম তাহাতে আবার লেপ মুড়ি, গা দিয়া দর দর করিয়া ঘাম বাহির হইত, তাহা না হইলে শশী মহারাজের আরাম বোধ হইত না। সেইজন্য বর্তমান লেখক তাঁহাকে ঠাট্টা করিতেন, পোষে পোষকামড়ি আর বৈশাখে ঝাঁ্যাতলা মুড়ি···শশী মহারাজ বলিতেন, যা ছোঁড়া যা ঠাট্টা করতে হবে না, আমার লেপ মুড়ি না দিলে ঘুম হয় না। ১১৭ পৃ

...সারদা মহারাজের 'কাক চরিত' অর্থাৎ কাকেরা কত প্রকার ডাকে ও তাহার কি অর্থ ও ফল হয় তাহা জানিবার ইচ্ছা হইল। তিনি নানা স্থানে ঘুরিয়া কাক চরিতের ও ফলিত জ্যোতিষ বা গণৎকারের অনেক

বই সংগ্রহ করিয়া বাহির বাড়ীর এঁদো ঘরটিতে দুয়ার বন্ধ করিয়া সেই সকল পুস্তক পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার অধ্যবসায় ও একাগ্রতা অদ্ভুত ছিল। তিনি এক মনে সেই অন্ধকার ঘরটিতে বসিয়া সারাদিন কাকের নানা রকম ডাক এবং কোনদিনে কোন মুখে বসিয়া ডাকিলে তাহার কিরূপ অর্থ হয়, কোন গাছের ডালে বসিয়া কিরূপ ডাকিলে তাহারই বা কি অর্থ হয়, এই সব অতি মনোযোগ সহকারে শিখিতে লাগিলেন। শশী মহারাজ ও কালী বেদান্তী কৌতুক করিয়া সারদা মহারাজকে বলিতেন যে পুকুরের পাড়ে নিমগাছের ডালে বসিয়া কাক ডাকিলে তাহার কি অর্থ হয় আর সারদা মহারাজও পুস্তকে লিখিত কাকের ডাক স্মরণ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতে থাকিতেন। ১২০ পৃ

একদিন সারদা মহারাজ ও আরও দুই একজনের বলরামবাবুর বাড়ীতে বাবুরাম মহারাজের মাতার নিকট খাইবার কথা ছিল। বাবুরাম মহারাজের মাতা তিন জনের মত রুটি ও কুমড়ার ছোঁকা তৈয়ারি করিয়াছিলেন। কার্যগতিকে সারদা মহারাজ ছাড়া কেহই যাইতে পারেন নাই,...পাছে রুটি তরকারি নষ্ট হইয়া যায় সেইজন্য সারদা মহারাজ একাই তিনজনের সমস্ত খাবার খাইয়া ফেলিলেন। বাবুরাম মহারাজের বৃদ্ধা মাতা সারদা মহারাজের এরূপ খাওয়া দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন···ভয়ে বৃদ্ধা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিলেন। পরদিন প্রাতে সারদা মহারাজকে সুস্থ দেখিয়া তাঁহার উদ্বিগ্ন ভাব কমিল। নারীসুলভ স্নেহপূর্ণভাবে বাবুরাম মহারাজের মাতা বলিতেন, সারদা কি খায় রে! ও অনেক পাহাড় পর্ব্বত ঘুরে বেড়িয়েছে, ও অনেক মোন্তর শিখেছে তাই উড়ো মোন্তরে উড়িয়ে দেয়, তা না হলে মানুষ কি অত খেতে পারে। ১২৫ পৃ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীতে তাঁহার গৃহী শিষ্যরা করিতেন। ১৮৯৪ খ্রী...এইবারই প্রথম দেখা গেল যে সকল বর্ণের লোক একসঙ্গে প্রসাদ পাইতে কুণ্ঠিত হয় নাই। দুইজন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ প্রসাদ পাইতেছিলেন; একজন প্রসাদ পাইবার পর অপরকে বলিলেন, এটা কেমন হলো হে? গঙ্গার ধার, কৈবর্তর বাড়ী, উনছত্রিশ জাত এক সঙ্গে বসে অন্ন পেলাম—আমি ত কখনও অপরের ছোঁয়া লেপা অন্ন খাইনি,

কিন্তু আজ ত এই ছত্রিশ জাতের ছোঁয়া লেপা অন্ন খেলাম। কি রকম হলো বল দিকিনি। অপর ব্রাহ্মণটি বেশ ভক্তিমান লোক ছিলেন, তিনি বলিলেন, আচ্ছা খেতে কি আপনার কোন দ্বিধা হইয়াছিল? প্রথম ব্যক্তিটি বলিলেন, তা হলে খেলাম কেন? দ্বিতীয় ব্যক্তিটি বলিলেন, কি জানেন, এটা এ যুগের শ্রীক্ষেত্র—এ মহাপ্রসাদ—ইহাতে কোন জাতিভেদ নাই এবং উচ্ছিষ্টও হয় না! ১২৭ পৃ

উৎসব। জাহাজ যখন বহু সংখ্যক নিশান উড়াইয়া ভরাভর্তি লোক লইয়া ঘাটে আসিতে লাগিল তখন সকলেই উল্লাসে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। প্রতিবাসী মুসলমান স্ত্রীলোকেরা ছোট ঘাটটিতে জল লইতে আসিয়া কলসি কাঁকে করিয়া জনসংখ্যা ও বহু নিশান-উড়ান জাহাজ দেখিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে একজন প্রবীণা অপর একজনকে বলিতে লাগিল, ও গো জান, সেই গদাই ঠাকুর গঙ্গার পাড়ে বসে মা মা করতো আর কাঁদতো। পাগলার ছেলে পুলে ছিল না তাই এখন জাহাজ ভরে সব ছেলেরা এসেছে!

নানা স্থান পর্যটন করিয়া কালী বেদান্তী অবশেষে গুজরাটের দ্বারকা ও বেট দ্বারকায় যান। এই স্থানে অবস্থান কালে তিনি এক ওয়াঘির বা জঙ্গলি দস্যু দেখিয়াছিলেন। ওয়াঘির এক জাতীয় লোক যাহারা চিরকাল দস্যুবৃত্তি করিয়া থাকে। দেখিতে অতিশয় বলিষ্ঠ ও ভীষণ সাহসী—এক প্রকার বন্যপশু বিশেষ। একবার এক ওয়াঘির ধৃত হইয়া জেলে যায়। কিছুদিন পরে জেলের সিপাহির তরোয়ালখানি কাড়িয়া লইয়া প্রাচীর টপ-কাইয়া সহরে চলিয়া আসে। বাজারের মাঝে খোলা তরোয়ালখানি পার্শ্বে রাখিয়া বসিল এবং ক্ষৌরকারকে দাড়ি মুড়াইয়া দিতে আদেশ করিল। ওয়াঘির দেখিতে জনতা অধিক হইল, এবং ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল অনেক পুলিশ লোকও জমায়েৎ হইল কিন্তু কাহারও সাহস হইল না যে, ওয়াঘিরকে ধৃত করে। নির্ভীক ওয়াঘির ক্ষৌর হইয়া স্বচ্ছন্দে ইচ্ছামত আপন গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেল। ১৩৮ পৃ

নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলে মিলিয়া একবার গাড়োয়াল পাহাড়ের কোন এক স্থানে যাইতেছিলেন। সন্ধ্যার সময় একটি গ্রাম দেখিতে পাইলেন। চার পাঁচ

জন মিলিয়া গ্রামে গিয়া বসিলেন কিন্তু গ্রামস্থ কোন লোকই খবরাখবর লইল না। এক সময় এক সাধু গঙ্গাধর মহারাজকে বলিয়াছিল যে গাড়োয়ালদের গ্রামে গিয়া খুব চিৎকার না করিলে কেহ কিছু দিবে না।...সাধুর উক্তিটি কার্যে পরিণত করিবার জন্য সকলে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা গ্রামের মধ্যে এক স্থলে বসিয়া কতকটা কৌতুক ও কতকটা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া তারস্বরে সকলে মিলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, লকড়ি লাও, আটা লাও জল লাও! এইরূপ গগনভেদী চীৎকার করায় এক পাহাড়ি বৃদ্ধ বাহির হইয়া আসিল এবং গাঁয়ের মোড়লকে ডাকিতে লাগিল, এ পারধান বাবা লোক আয়া হ্যায়।...পারধান আসিয়া কাঠ, ডাল, আটা, প্রভৃতি আবশ্যকীয় সামগ্রী দিল। পাহাড়ে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, গাড়োয়াল সরাঁখা দাতা নহী, কোর লট্টা দেতা নেহী। ১৫৩ পৃ

হৃষিকেশে অবস্থানকালে অতি কঠোর তপস্যা করায় ও নিরন্তর অল্প আহার বা অনাহারে থাকায় নরেন্দ্রনাথের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। কয়েক দিবস জ্বর হইল। জ্বর একটু কমিলে নরেন্দ্রনাথ খিচুড়ি খাইতে ইচ্ছা করিলেন। সকলে মিলিয়া সত্র বা অন্যান্য স্থান হইতে চাল ডাল প্রভৃতি যোগাড় করিয়া আনিয়া খিচুড়ি রাঁধিতে চেষ্টা করিলেন। অতি ধীর ও বালক স্বভাব রাখালমহারাজ খিচুড়ি অতি সুস্বাদু হইবে, এই ভাবিয়া এক ডেলা মিছরি ফেলিয়া দিলেন। নরেন্দ্রনাথ লঙ্কা খাইতে ভালবাসিতেন এবং তীব্র ঝালবস্তু তাঁহার প্রিয় ছিল।...প্রথম দিন পথ্যের সময় খিচুড়ি মুখে দিয়াই একবারে মুখ সিটকাইয়া উঠিলেন, তারপর খিচুড়ির ভিতরে একটা লম্বা সুতা দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, খিচুড়িতে একটা সুতা কেন রে আর খিচুড়িটা এত মিষ্টি হয়েছে কেন। সকলে বলিল, রাখালমহারাজ খিচুড়িতে এক ডেলা মিছরি ফেলে দিয়েছে। নরেন্দ্রনাথ তখন বিরক্ত ও কৌতুকচ্ছলে রাখালরাজকে বলিতে লাগিলেন, দুঃ শালা! খিচুড়িতে কখন মিছরি দেয় রে। শ্যালা তোর একটু আক্কেল নেই! ১৫৭ পৃ

...কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি একবার স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন. স্বামিজী আপনি এত লঙ্কা খান কেন? স্বামিজী গম্ভীর মুখ করিয়া শ্লেষপূর্ণ ভাবে তাহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, মশাই চিরজীবনটা পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি আর বুড়ো আঙ্গুলের টাকনা দিয়ে ভাত খেয়েছি। লঙ্কাই ত তখন

একমাত্র সম্বল ছিল, ঐ লঙ্কাই ত আমার পুরান বন্ধু ও মিত্র। আজকাল না হয় দুচারটে জিনিস খেতে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু চিরকালটা ত উপোস করে মরেছি। ১৯৩ পৃ

কেশব সমাগম। শ্রীমতিলাল দাস

আমি একদিন অপরাহ্নে আমাদের বহির্ব্বাটির মুক্ত প্রাঙ্গণে খেলা করিতেছিলাম, এমন সময় শুনিতে পাইলাম যে আমার একজন ভক্তিভাজন পিতৃব্য অপর একটি লোককে উত্তেজিত স্বরে এইভাবে বলিতেছেন, তাকে কলিকাতায় পাঠাইয়াছ সর্ব্বনাশ করিয়াছ যদি কেশব সেনের হাতে পড়ে তবে যাদু করিয়া ফেলিবে! ৫ পৃ

একটি মজার কথা তখন অনেকের মুখে শুনিতাম যে কলিকাতায় যাইতে হইলে, 'তিন সেনের' হাতে পড়ার খুবই সম্ভাবনা যথা কালু সেন (Railway Collision) উইল সেন (Wilson Hotel) এবং কেশব সেন! প্রথম দুই সেনের হাত এড়াইতে পারিলেওনাকি কেশব সেনের হাত হইতে রক্ষা পাইবার আর উপায় ছিল না। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে কেশব যুগের আরম্ভে রেলপথ পূর্ব্ববঙ্গে কেবল মাত্র দেখা দিয়াছিল, তাই কলিসনের ভয়ে গ্রামবাসিগণ রেল গাড়িতে চড়িতে সহজে সম্মত হইত না। উইলসন হোটেলের কথা আর কি বলিব? যে সকল যুবক তখন বিদ্যা অর্জ্জনের জন্য কলিকাতা মহানগরীতে গিয়া বাস করিত তাহাদের অধিকাংশের প্রধান কাজ ছিল উক্ত হোটেলে চুপে চুপে গিয়া আসল বস্তুটি সেবন করা। ৬ পৃ

একদিন আমার একজন পূজনীয় খুল্লতাত (৺বৃন্দাবনচন্দ্র দাস) হাসিতে হাসিতে আমাদের বাড়ীর মধ্যে ইংরাজী স্কুলের কয়েকটি ছাত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন ওরে, তোরা আর কি পড়া শুনা করিস! মহারানী কেশব সেনকে তাঁর বিদ্যার জন্য সোনার দোয়াত কলম দিয়াছেন। সরল গ্রামবাসিগণ মহারানী ভিক্টোরিয়াকে স্বর্গের দেবী জ্ঞানে মনে মনে পূজা করিতেন। সেই মহারানী আদর করিয়া যাঁহাকে সোনার দোয়াত কলম উপহার দিলেন কত বড় লোক তিনি!

শ্রীকেশবচন্দ্রের ইংলণ্ডে অবস্থানকালীন তাঁহার দেব চরিত্র, অলৌকিক ধর্ম্ম-

প্রতিভা এবং অদ্ভুত বাগ্মীতার পরিচয় পাইয়া সেই দেশের লোক যে কিরূপ চমকিত ও মুগ্ধ হইয়াছিল ইতিহাস তাহার সাক্ষী। তখন সকলেরই মনে মনে একটি প্রশ্ন উঠিয়াছিল।

Who among all living men

Is this Keshab Chandra Sen? —Punch ৭পৃ

...বিদেশী ভাষায় শ্রীকেশবকে আশ্চর্য্যভাবে বক্তৃতা করিতে দেখিয়া অনেক শিক্ষিত ইংরেজের নাকি মনে ধারণা হইয়াছিল যে তিনি নিশ্চয়ই পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। এই কথা সত্য কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য একবার এইরূপ ঠিক করা হইল যে পূর্ব্বে বক্তৃতা বিষয় তাঁহাকে জানান হইবে না। সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া তিনি তাহা জানিতে পারিবেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে ঠিক সময়ে শ্রীকেশব হাস্যমুখে সভাস্থলে প্রবেশ করিয়াই দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার বক্তৃতার বিষয় Nothing! তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া স্থির কণ্ঠে এই বলিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন যে: Before the Creation of this world there was Nothing, God alone existed! ৮ পৃ

একদিন আমাদের গৈলা গ্রামের কয়েকজন যুবক গোপনে পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন, যে তাহারা সন্ধ্যার পরে লোকালয় হইতে কিছু দূরে অবস্থিত স্থানীয় মধ্য ইংরাজী স্কুলের একটি প্রকোষ্ঠে কেশব সেনের মত উপাসনা করিবেন... যাহাদের ভাগ্যে শাস্তি ভোগ একটু বেশী হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে... ৺কালিপ্রসন্ন সেন একজন—ইহার পিতা ৺জগবন্ধু সেন যারপর নাই কোপন স্বভাবের লোক ছিলেন। উপাসনার ব্যাপার যখনই তাঁহার কর্ণগোচর হইল, তিনি তাঁহার পুত্রকে ডাকিলেন: তুই কাল কি করছিলিরে নচ্ছার ছেলে?···(পুত্র) আমি পরমপিতার উপাসনা করিয়াছিলাম। (পিতা)—তবেরে তুই তোর পরম পিতার ঘরে গিয়াই খাওয়া-দাওয়া করিস, এই ক্ষুদ্র পিতার ঘরে কেশব সেনের চেলার জন্য কোন ভাত নাইরে! ১০ পৃ

যখন আমি বরিশাল জিলা স্কুলের উচ্চতম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতাম তখন একদিন কোন বন্ধুর মুখে কথাপ্রসঙ্গে শুনিলাম, কেশববাবু পাগল হইয়া গিয়াছেন। তিনি সোনার বালা হাতে দিয়া রাস্তায় রাস্তায় নাচেন, আর হরি হরি বলেন। কথাটি শুনিয়া মনে হইল, ইনি প্রকৃত একটি আশ্চর্য্য রকমের

লোক। তখন জানিতাম না যে নববিধান ঘোষণার পরে শ্রীকেশবের শত্রুগণ চারিদিকে রটাইয়া দিয়াছিলেন যে তিনি পাগল হইয়া গিয়াছেন। ১১ পৃ

কোন খ্যাতনামা ভাবুক লোক ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে, কেশবজীবন সম্পর্কে 'মিরার' পত্রিকায়, নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন :...এ ভীষণ পৌত্তলিক বিরোধী...এ ঘোর পৌত্তলিক—এ চৈতন্যকে ঈশ্বর জ্ঞানে ভক্তি করে এবং মাতা গঙ্গার পূজা করে। ১২ পৃ

কেশব চরিত। শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা।

(কেশব) তখন ধর্ম জানিতাম না, জানিতাম সংসারী হওয়া পাপ। স্ত্রৈণ হওয়া পাপ...। ২৩ পৃ

মন বলিল, তুমি যদি হাস, পাপী হইবে। ২৪ পৃ

যার তার নাকে চসমা দেখিয়া কোন এক সুরসিক ব্যক্তি বলিয়াছিল এদের চস্‌মা যেন খড়ের ঘরের সার্সি,আর কেশব বাবুর চস্‌মা চূণকামকরা পাকা ঘরের সার্সির মত। ৩৫ পৃ

কেশবের মহা তেজস্বিনী বক্তৃতা শ্রবণে এবং তৎপ্রতি যুবক দলের প্রগাঢ় অনুরাগ দর্শনে এ দেশের পাদরিদল ক্রমে ভয় পাইতে লাগিলেন। তিনি পাদরী সাহেবদের উপর পাদরীগিরি করিতে লাগিলেন। ৪৯ পৃ

(কেশববাবু সস্ত্রীক মহর্ষির বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাওয়াতে মহা বিভ্রাট বাধে—এমন কি সদর দরজা বন্ধ করা হইয়াছিল কেশববাবু তাহা দেখিয়া)...খোল দরজা! বলিয়া এমন এক ধমক দিলেন যে তাহা শুনিয়া দ্বারবান সভয়ে তৎক্ষণাৎ দ্বার উন্মোচন করিল, অমনি তিনি বাহির হইলেন, তাঁহার সহধর্মিণীও সাহস পূর্ব্বক পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন, তাহা দেখিয়া বাটির একজন প্রাচীন ভৃত্য বলিল, আরে, তুমি ভদ্রলোকের মেয়ে, তুমি কোথা যাও? ৫৩ পৃ

এক সময় রামগোপাল ঘোষ রাজনীতি সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার পর এ পথে আর কেহ পদার্পণ করেন নাই। কেশব হইতেই মুখে মুখে বক্তৃতা করিবার প্রথা এ দেশে বিশেষরূপে প্রবর্তিত হইয়াছে। আজকাল যে সে বক্তৃতা করিতেছে। ব্রাহ্ম সমাজের আবাল বৃদ্ধ বনিতা এ

কার্য্যে বড়ই তৎপর। বেদীতে বসিয়া স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত বক্তৃতা করে ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে। ৬৭ পৃ

সত্য সত্যই কেশবকণ্ঠে বেদমাতা বাগ্দেবী নিত্য বিরাজ করিতেন। ৬৮ পৃ

(কেশববাবু আদি ব্রাহ্ম সমাজ ত্যাগ করিলেন)...কেশবের অভাবে আদি সমাজকে নিতান্ত হীনপ্রভ হইতে হইয়াছিল। মাতা যেমন সন্তান প্রসব করিয়া কালবশে আপনি ক্ষীণা এবং দুর্ব্বলা হন, কিন্তু প্রসূত সন্তান দিন দিন স্বাস্থ্য যৌবনে বলশালী হইয়া উঠে ; কেশবকে প্রসব করিয়া আদি সমাজের অবস্থা তাহাই হইল। ৭১ পৃ

উচ্চ অট্টালিকায় বাস করিয়া স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গের সঙ্গে থাকিয়া কিরূপে বৈরাগী হওয়া যায় তাহা প্রমাণ করিবার জন্য নিজ কলুটোলার ভবনে ছাদের উপর তিনি এক কুটির বাঁধিলেন। ১১২ পৃ

এই বৎসর ভাদ্রমাস হইতে দীর্ঘ ধ্যান সাধন আরম্ভ হয়। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল উপাসক মণ্ডলীকে ধ্যান করিতে হইত। তরলচিত্ত ব্রাহ্মগণের পক্ষে ইহা অতিশয় কষ্টের কারণ হইত। ১১৫ পৃ

কুচবিহার বিবাহ প্রসঙ্গে

কুচবিহার যাইবার পূর্ব্বে, কেশববাবু তথায় তারযোগে সংবাদ দিলেন, ধর্ম সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র এদিক ওদিক হইবে না। উত্তর আসিল, কোন আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই, পৌত্তলিক অংশ বাদ দিয়া হিন্দু বিবাহ পদ্ধতি অনুযায়ী কার্য্য করা হইবে। এই আশা পাইয়া আচার্য্য মহাশয় (কেশববাবু) তথায় গমনে উদ্যত হইলেন।...এমন সময় সংবাদ আসিল, বিবাহ-পদ্ধতি দেখা হয় নাই এবং ইহা মুদ্রিত হইবে না। কয়েকদিন পরে আবার সংবাদ আসিল ব্রাহ্ম পদ্ধতি ইহার ভিতর প্রবিষ্ট আছে, ইহা ব্যবহৃত হইতে পারিবে না। সে কথার এবং বাইনাচের প্রতিবাদ করিয়া বলা হইল, স্পেসেল ট্রেন বন্ধ থাকুক। পাত্র পক্ষীয়েরা বলিলেন, তাহা সম্ভব নহে। ১২২ পৃ

(কুচবিহার বিবাহ লইয়া মহাবিভ্রাট) ব্রহ্ম মন্দিরে তজ্জন্য সভা হইল। প্রকাশ্য সভায় (কেশববাবু) ত্যাগ পত্র লিখিয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতে বিপক্ষের ক্রোধ বৃদ্ধি হইল। কেহ কুবাক্য বলে, কেহ কর্মচ্যুত করিতে চায়,

যে কোন কালে মন্দিরে আসে না সেও বলে আমি ব্রাহ্ম, মহা গণ্ডগোল। ঠিক যেন দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার। শেষে মারামারি হইবার উপক্রম হইল। ১২৭ পৃ

পরিশেষে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের কতকগুলি সভ্য স্বতন্ত্র হইয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ নামে এক দল বাঁধিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাহ্মদল প্রথমে ব্রহ্মমন্দির অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা কেশবচন্দ্রকে পদচ্যুত করণার্থে আপনা আপনির মধ্যে যে নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, তদনুসারে উক্ত মন্দির একদিন বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিলেন, তাহাতে কিছু ফল হইল না দেখিয়া রবিবার সন্ধ্যায় নিজেরা উপাসনা করিবেন বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হন, তাহাতেও কোন ফল দর্শিল না। কেশবচন্দ্রের পক্ষেও বহু লোক সহায় ছিল। একজন প্রচারক বেদীতে বসিয়া রহিলেন, তিনি নামিলেই অপর দল ব্রাহ্ম উপাচার্য্য তাহাতে বসিবেন, কিন্তু তিনি নামিলেন না। বিপক্ষগণ শেষে নীচে বসিয়া উপাসনা করিবার আয়োজন করিলেন কাজেই তাহা নিস্ফল করিবার জন্য কেশবানুচরগণ 'দয়াল বল জুড়াক হিয়ারে' কীর্ত্তন ধরিয়া দিলেন। পুলিস প্রহরী শান্তিরক্ষার জন্য তথায় উপস্থিত ছিল তজ্জন্য নিয়মিত উপাসনার কেহ ব্যাঘাত করিতে পারিল না। সে দিন ব্রহ্মমন্দির যুদ্ধক্ষেত্র রূপে পরিণত হইয়া ছিল। ১৩১ পৃ

যাঁহারা এতকাল কেশবচন্দ্রের সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া স্বাধীনকার্য্য করিতে পারিতেন না, তাহারা এক্ষণে হাত পা ছড়াইয়া স্ফূর্ত্তির সহিত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। ১৩৩ পৃ

উপহাস প্রিয় ব্যক্তিরা বলিত কেশব বাবুর ধর্ম্ম. দরবেশের কাঁথা এবং খাসিরামের চানাচুর। ১৪৩ পৃ

ফলতঃ রামকৃষ্ণ রামপ্রসাদের ন্যায় একজন উচ্চশ্রেণীর পৌত্তলিক ভক্ত ছিলেন। ১৫২ পৃ

(কেশবচন্দ্রের প্রচার কার্য্য) ···এই অবস্থায় একদিন মহাভাগ কেশব সবান্ধবে এক গোয়ালার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার ঘরের মধ্যে এক বলীবর্দ্দ আবদ্ধ ছিল, মৃদঙ্গ করতালের ধ্বনি শুনিয়া সে সবলে বন্ধন রজ্জু ছিন্ন করত প্রাণের ভয়ে একেবারে গায়কগণের ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হয়। মহা বিভ্রাট। বৃষের হম্বারবে এবং ঘন ঘন পদশব্দে গৃহস্বামী গৃহস্বামিনী

এবং আগন্তুকের মনে ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। কুটিরবাসী দীন দরিদ্র গোপ সন্তান সহসা আপন প্রাঙ্গণ মধ্যে ভদ্রলোকদের দল দেখিয়া কি করিবে বুঝিতে পারিল না। তাহার স্ত্রী ভয়ে ভীতা হইল। এমন সময় গৃহ মধ্য হইতে দ্বার ভগ্ন করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে তাহার গোরু ছুটিয়া বাহিয়ে আসিল।...পরে বাদ্য বন্ধ রাখিয়া গায়কগণ দুই একটি গান করিলেন এবং আচার্য্য বিদায় কালে গৃহস্থের নিকট কিঞ্চিৎ তণ্ডুল ভিক্ষা করিলেন...দুঃখীর বন্ধু কেশব কাঙ্গাল জনের গৃহে যাইতে বড়ই ভালবাসিতেন। ১৬০ পৃ

...আজ সকালে উপাসনার সময় বলিলাম, হাস্যই আমাদের দেবতা। ১৬৫ পৃ

কেশবচরিত পরিশিষ্ট

(কেশববাবু প্রার্থনায়) ...রূপক উদাহরণ দৃষ্টান্ত এত অধিক ব্যবহার করিতেন, যে প্রার্থনার মধ্যে না আসিত এমন বিষয় প্রায় ছিল না।...সে সকল কথা হঠাৎ শুনিলে মনে হইত যেন পৌত্তলিকা, অথবা একটি ঘোর প্রহেলিকা। তজ্জন্য অনেকে বিরক্ত হইতেন। ঈশ্বরের সঙ্গে এত ইয়ারকি ভাল নয় মনে করিতেন। ৭ পৃ

কোন একজন ভদ্রলোক মন্দিরে উৎসব দেখিতে আসিয়া বলিয়াছিল, কেশব বাবু খুব চতুর লোক আপনি মাঝে মাঝে পাশের ঘরে গিয়া মিছিরি টুকু, দুধটুকু পান আসটা খেয়ে আসছে ; উপবাসও করে না কিছুই না। আর প্রচারকেরা না খেয়ে শুকিয়ে কেবল 'দয়াল এস হে। দয়াল এস হে!' করে চেঁচিয়ে মরছেন। কেহ বা বলিত, কেশব সেন কিন্তু কয়টা লোককে আচ্ছা ভ্যাড়া বানিয়ে রেখেছে! ১৩ পৃ

কঠোর সন্ন্যাসী, বিরক্ত সাধুদিগের ত্যাগস্বীকার কেশবচন্দ্রের শ্রদ্ধার বিষয় ছিল বটে ; কিন্তু তাঁদের অনুকরণ তিনি কখন করেন নাই। ভিক্ষান্ন ভোজন, মস্তক মুণ্ডন, গৈরিক বস্ত্র ব্যবহার তিনি করতেন, কিন্তু তাহা নববিধান অনুসারে। গৈরিক বস্ত্রে জরির পাড় বসান বিষয়ে একবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ১৪পৃ

(কেশববাবু) আধুনিক সভ্যতার বিপরীত যাহা কিছু, সে সমুদায় কার্য্যে

অগ্রেই তিনি পদ চালনা করিতেন। পায়ে নুপুর হাতে সোণার বালা পরিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তনে যখন মাতিতেন তখন থামাইয়া রাখা ভার হইত। ১৮ পৃ

…নৃত্যকালে ভাই অনুতলাল আচার্য্যপদে নুপুর এবং হস্তে স্বর্ণবলয় পরাইয়া দিতেন। এই সমস্ত আমোদ উল্লাস রঙ্গরস বিলাস মত্ততা দেখিয়া মনে হইত যেন আবার আমাদের সেই প্রেমিক চৈতন্যের দল ফিরিয়া আসিয়াছে। ২২ পৃ

একবার গায়ে ভস্ম মাখিয়া বাঘছাল পরিয়া সন্ন্যাসীর সাজে মঙ্গলপাড়ার ভিতরে আসিয়াছিলেন। সে বেশ দেখিয়া রাজা বলিলেন, গোসাঞজী আমাকে বর দিন? তিনি উত্তর দিলেন, বর আর কি দিব, কন্যা দিয়াছি? ২৯ পৃ

ভারতের সাধক

নগেন পাণ্ডা একবার এক মরণাপন্ন ব্যক্তিকে বাঁচানোর জন্য বাবাকে বিশেষ করিয়া ধরিলেন। বাবাও যাইতে সম্মত হইলেন। পথে যাইতে কালে নগেন পাণ্ডা বাবাকে বলিতে লাগিলেন, আপনি শুধু বলিবেন—এই শালা উঠ, বোস তোর রোগ সেরে গেছে!…আর কিছু বলতে হবে না।

বাবা বেশ তাই বলব—আবার ভুলে না যাই মা যা করান!

রোগীর ঘরে প্রবেশ করিয়াই বামাক্ষ্যাপা বলিলেন, ও গো নগেনকাকা এ শালা ত ফট!

রোগী মরিয়াছে! নগেন পাণ্ডা বলিলেন বাবা ছিছি এমন জানলে কখনও আনতাম না!

নগেন কাকা রাগ করো না, আমি আপনার শেখান কথাগুলি বলতে চেয়েছিলাম—মা বললে ক্ষেপা খবরদার! বলে দে—ফট!

বালানন্দ ব্রহ্মচারী তখন বরাহনগরে আছেন।…মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাহার নিকট লোক পাঠাইয়া আমন্ত্রণ জানান।

মহাযোগী বালানন্দ কহিলেন, যতীন্দ্রমোহন মহারাজ তাহা জানি, আমাকেও অনেকে মহারাজ বলিয়া সম্বোধন করে। এক মহারাজ অপর মহারাজের কাছে এলে তাহাতে আর নিন্দা কোথায়! যতীন্দ্রমোহন নিজে এলেই ত পারেন।

বালানন্দ একবার রাজপথে মধ্যস্থলে আসন পাতিলেন। সেই জায়গাকার মহারাজ যতীন্দ্র—তাহার লোকেরা কহিলেন, রাজা আসিতেছেন পথ ছাড় !

রাজাকে বল এখানে এক মহারাজ আসিতেছেন পথ ছাড় !

রাজাকে বল এখানে এক মহারাজ বসিয়া আছেন।

মহারাজ নিজে আসিয়া সন্ন্যাসী মহারাজকে জিজ্ঞাসেলেন—শুনিলাম প্রভু এক মহারাজা তা আপনার ফৌজ কোথায় !

ফৌজ ! কেহ ত আমার দুষমন নয় !

ভাল ! আপনার তাজখানা

খরচের বালাই নাই— তাজখানায় কাজ কি !

ত্রৈলঙ্গ স্বামী

সেবার উজ্জয়িনীর মহারাজ কাশীধামে আসিয়াছেন। একদা তিনি ব্যাসকাশী ইত্যাদি ভ্রমণের পর নৌকাতে ফিরিতেছেন ; হঠাৎ দেখা গেল গঙ্গায় এক বিপুলকায় কেহ ভাসিতেছেন, মহারাজের লোকেরা কেহ কেহ চিনিলেন যে ঐ জন সচল মহাদেব ত্রৈলঙ্গস্বামী। ইহারা মহারাজকে মহাপুরুষে পরিচয় দান করিলেন।

ইতিমধ্যে মহাপুরুষ সন্তরণে নৌকাখানির দিকে আসিলেন ; নৌকার আরোহীরা অতি শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে নৌকায় উঠিতে সাহায্য করিলেন। নৌকায় যখন তিনি, তখন মহারাজ ও তাঁহার লোকজনেরা মহাপুরুষকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। ত্রৈলঙ্গস্বামী নৌকায় বসিলেন ; এ সময় তাঁহার চারিপাশে সকলে বসিয়া আছেন, হঠাৎ বালক স্বভাব ত্রৈলঙ্গস্বামী মহারাজের কোটিদেশে মহামূল্যবান রত্নে বাঁধানো এক তরোয়ালের (ছোরা হইতে পারে) দিকে মহা কৌতুহলে চাহিলেন। এবং উহা দেখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তরোয়াল তাঁহাকে দেওয়া হইল। মহাপুরুষ কিছুক্ষণ উহার এদিক সেদিক দেখিয়া হঠাৎ গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া অট্টহাস্যে ফাটিয়া পড়িলেন। সকলে স্তম্ভিত ; মহারাজ বিশেষ কুপিত হইলেন, যেহেতু উহা ইংরেজ সরকার তাঁহার মর্য্যাদা মান্য করিয়া দিয়াছেন। মহারাজ ঐ উন্মাদ যোগীকে শাস্তি দিবেন বলিয়া উষ্মাপ্রকাশ করিলেন। মহারাজের পার্ষদগণ কহিলেন, মহারাজ আপনি ক্ষুব্ধ হইবেন না,

উনি সচল শিব, মহাব্রহ্মজ্ঞ, স্বেচ্ছাময় পুরুষ হইলেও কখনও কাহারও মন্দ করেন নাই। আপনি শান্ত হউন ডুবুরি নাবাইয়া ঐ তরোয়াল উদ্ধার করা যাইবে। মহারাজ সন্ন্যাসীকে শাস্তি দিবেন বলিয়া বদ্ধপরিকর। ইতিমধ্যে নৌকা কাশীর ঘাটে লাগিল। মহাপুরুষ তাহাদের কথাবার্ত্তা সব শুনিতেছিলেন, আর মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। এবার তিনি একটি হাত গঙ্গার জলে ডুবাইলেন! এবং নিমেষেই তাঁহার হাতে জল ছাড়িয়া উঠিল। সকলে দেখিল তাহার হস্তে দুইখানি মহামূল্যবান রত্নসমন্বিত তরোয়াল! দুইটিই অবিকল একই! মহাপুরুষ মহারাজকে তখন কহিলেন, কোনটি তোমার! চিনিয়া লও।

মহারাজ অতীব ধাধায় পড়িলেন। মহাপুরুষ হাসিয়া কহিলেন, মূঢ় তুমি নিজের জিনিষ চিনিতে পার না? অথচ আমার আমার বল!···তোমার যে নিজস্ব কি তাই জানো না···এই তলোয়ার একদিন তোমাকে ফেলিয়া যাইতে হইবে অথচ তুমি বল আমার—যাহা এখানে ফেলিয়া যাইতে হইবে তাহা তোমার নিজস্ব কিরূপে হইল। যে বস্তু নিজের নহে তাহার জন্য এত অহঙ্কার ক্রোধ সাজে !

মহারাজ তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন।

একবার ভাস্করানন্দ—ইনি মহাযোগী ১৩০৬ দেহরক্ষা করেন—শ্যামাচরণের নিকট উচ্চমার্গীয় কিছু যোগ শিক্ষার মানসে তাঁহাকে আনন্দবাগে আসিতে আমন্ত্রণ জানান।

কেবলানন্দজী এই সংবাদ শ্যামাচরণকে দিলেন। শ্যামাচরণ তাহা শ্রবণে কহিলেন, ছাখো হে পিপাসা পেলে তৃষ্ণার্ত্ত লোকে কুয়োর কাছে ছুটে যায়। কুয়ো কি কখনও এজন্য স্থান ত্যাগ করে?

তত্ত্বাভিলাষীর সাধুসঙ্গ। (২য় খণ্ড) প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমি বলিলাম:···না না আমি গৃহী—আপনাকে দর্শন করতেই এখানে এসেছি। শুনিয়া বাবা বলিলেন, তোমার কিছু অসুখ আছে নাকি? আমি বলিলাম, না আমার শরীরে কিছু অসুখ নাই তবে ভবব্যাধি যদি বলেন তা আছে! বাবা: শরীরে অসুখ বিসুখ কিছুই নেই, তবে আমার কাছে কি

করতে এসেছ? আমি: অসুখ কি ব্যাধি না থাকলে কি আপনার কাছে আসতে নেই! তিনি: কৈ কঠিন রোগ না হলে ত কেউ আমার কাছে আসে না, ঐ দেখ না, একটা মরা ছেলে নিয়ে এলো গা, বাঁচিয়ে দাও, আমি কি করবো তারা মা যা করবেন। আমি কি ডাক্তার বটে? ১ পৃ

আমার দিকে চাহিয়া রসিকতা করিয়া বলিলেন, বাবা বড় ছোটবেলায় ঘর ছেড়েছে—গিন্নিটি কি মনের মত হলো না বুঝি! ২ পৃ

(একজনকে টাকা দিতেছিল) বাবা বাধা দিয়ে বলিলেন: সব শালা চোর এখানে, টাকা কড়ি দিস না কোথায় রাখবো! তার চেয়ে কিছু মাল দিয়ে যাস! ৯ পৃ

ভদ্রলোকটিকে দেখাইয়া বাবা তখন আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন: এই দেখ কেমন গেরস্ত সংসারী সাধনও আছে মার কৃপায় আবার সংসারী··· সংসারকে ভয় নেই!···বাবাজীর (লেখক) গোড়ায় গলদ! আমি বলিলাম: খুলে বলুন···। তিনি: ঐ ত গোড়াতেই ভয়। ঘরে থাকবো না বাহিরে যাবো···মাকে ত জানো নাই বাবা সে কেমন মেয়ে দেখবে তখন, বুঝবে যখন ঘুরপাক খাওয়াবেক! আমি বলিলাম: যদি বলি মাই ত সব করেছেন! বাবা তখন সেই ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়া আমাকে দেখাইয়া বলিলেন: এই দেখ ঠ্যাটা, যদি মাই সব করে থাকে জানছিস, তবে অত হিসেব করে কাজ করছিস কেন? মাকে ধরে এক জায়গায় বসে থাকগে যা না। ৯ পৃ

(বাবা)···তু গান করিস নাকি? দ্বিচরণ তু কি বলিস? দ্বিচরণ; হ্যা উয়ার কলকাতার গান একটা হোক না। আমি তো অবাক, শেষে অব্যাহতি পাইলাম একখানা ব্রাহ্ম সঙ্গীত গাহিয়া। বাবা বলিলেন, তোর স্বরটা নরম বটে। ১৩ পৃ

(বাবা)...বল তো বাপ মা বেঁচে থাকতে কোথায়, কোন শাস্তোরে ঘর ছেড়ে বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে যাবার ব্যবস্থা আছে? তোরা এমনই ঠ্যাটা হয়েছিস, ঘরের ভগমান ফেলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে মরিস—তোর কি লাজ লাগে নাই? ১৫ পৃ

(আমি)···যেমন ভাব সংস্কার নিয়ে জন্মেছি...! বাধা দিয়ে তিনি বলিলেন, ওরে ঠ্যাটা দুষমন কোথাকার...তোর ভিতরে যে যে গুণ আছে বলে

গরব করিস তু—সে তোর জন্মদাতার দেওয়া না হলে তু যাবি কৃথাকে-হ্যা—।
১৭ পৃ

(আমি)···বাবা আমার ভয়ঙ্কর বলবান, উদ্ধত প্রকৃতি (অনাচারী ভোগী) আর মা নিরীহ, ত্যাগী, শান্ত শিষ্ট, নিরক্ষর, শুদ্ধাচারী পূজা তপস্যা পরায়ণা, ভীরু স্বভাব! তিনি: ঐ রকমই পনেরো গণ্ডা এখানে, কাজেই এ ভাবে ছেলে মেয়্যা জন্মাছে। হ্যাঁ দেখ তারা মা ঐ রকম মেয়্যার সাথে ঐ রকম দস্যি পুরুষগুলোর মেল করায়ে মনের মত মানুষ তৈয়ারী করান! আমরা তাঁর খেলা বুঝব কি ...। ১৯ পৃ

পরদিন একটু সুবিধা বুঝিয়া ক্ষ্যাপার কাছে গিয়া বসিলাম, তখন সেখানে আরও দু তিন জন উপস্থিত। বাবা রসিক লোক, বলিলেন: চিল পড়েছে যখন, কুটটা না লয়ে উঠবেক না। ১০ পৃ

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম:···তান্ত্রিক সাধন প্রকরণের মধ্য দিয়ে না গেলে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি না কি কারো জাগে না? তিনি: এ কথা তোকে কে বলেছে—যত সালা অগুগোগুর কথা। তোর খিদে যদি পায় তখন ভাত খেলে তোর যেমন পেট ভরবে, ডাল রুটি খেলে কি তার চেয়ে কম পেট ভরবে।··· যে বলে ভাত ছাড়া আর কিছুতেই পেট ভরবে না সে নিশ্চয়ই গেঁও মনিষ—ভাত ছাড়া আর কিছুতেই পেট ভরবে না.. ।

আমি বলিলাম: রামকৃষ্ণদেবও ঠিক এই কথা বলতেন,···ধর্ম নিয়ে লাঠালাঠি আমাদের এদেশে খুব দেখা যায়! তিনি বলিলেন:...যারা লেঠেল—তারা লাঠিবাজীই বোঝে ভাল তা ধর্ম নিয়েই হোক বা ঘরের মাগছেলে পাড়াপড়শি নিয়েই হোক—ওই রকম ওদের বুদ্ধি। ২৫ পৃ

(বাবার কিছু টাকা ছিল, ইহা অমুক পাণ্ডা জানিল কারণ সে তখন বাবার সেবক ছিল···ঐ টাকা বাবা কোথায় পুঁতিয়া রাখিয়াছেন তাহাও জানিত। একদিন সকালে বাবা, দেখিলেন টাকা নাই! অমুক পাণ্ডাও অনুপস্থিত, বাবা বুঝিলেন ইহা তাহারই কাজ, বাবার টাকা অদৃশ্য হইয়াছে জানিয়া সে বিস্ময় প্রকাশ করিল! থানা পুলিশ হইল। তখন পাণ্ডা আসিয়া তাঁহার পা ধরিয়া কাঁদা কাটা করিল, বাবাও জল হইয়া গেলেন। সেই অবধি বাবা, কাহারো নিকট অর্থ গ্রহণ করিতে না বলিতেন, ঐ অর্থ যে অনর্থ! আমি

একদিন...জিজ্ঞাসা করিলাম: আপনি সাধুলোক মার কৃপায় কিছুরই অভাব নাই—আপনি কেন টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন? তাহাতে বাবা বলিলেন: ও সব বেটি মায়েরই ঘটাঘটি জানিস না, টাকাটা আপনিই এলো, ভাবলাম এখন রাখি যখন কারো কাজে লাগবে তখন দেওয়া যাবে! তা হোলো ভালো যার কাজে লাগলো সে মনিষটাকেও চেনা গেল। মায়ের টাকা তিনিই ওটার ব্যবস্থা করলেন যেয়ে। ৩১ পৃ

তিনি চটিয়া বলিলেন·...শালা গুরুর কৃপা মানবেন নাই—খৃষ্টান হয়েছেন। ৩৮ পৃ

তিনি: ওই আদিরসের অনুভূতি সূক্ষ্মভাবে সংস্কারগত হয়ে সকল শিশুরই মনের মধ্যে থাকে—সুপ্ত ভাবেই থাকে এটা বুঝিস ত?...আমি: আচ্ছা তখন থেকে শিক্ষা দ্বারা ঐ সব শিশুদের···সকল ভাব দূর করতে পারা যায় না! তিনি: মর্ শালা শিক্ষে দিয়ে আগুনকে চাপাবি কি করে? সেদিকে যা দিয়ে আগুনকে ঢাকা দিবি তাই পোড়াবে! তুই বলিস কি রে বোকা? ৪০ পৃ

তিনি:···শুধু সহবাসের সুখটি লক্ষ্য করে মেয়্যাদের দেখলেই পুড়তে হবে! ৪৪ পৃ

আমি:...নরনারীর আসলে সম্বন্ধটা কি কেমন করে আমরা এই মোহ ঘটিত সম্পর্ক থেকে উদ্ধার পাব। তিনি বলিলেন: ও তো আপনি ঘাঁটতে ঘাঁটতে হবে।...তোর ত বিয়ে হয়েছে, সন্তান হয়েছে, তু ত সব জানিস্—কেমন করে জন্ম দিতে হয় সে কি তোকে কেউ শিখিয়ে দিয়েছে নাকি? ৫০ পৃ

আমি: জীবন সঙ্গিনী আবার জন্মজন্মান্তরেও ধাওয়া করে নাকি? তিনি: ভয় করে নাকি তোর? ৫২ পৃ

(বাবা তাঁহার কুকুর সম্পর্কে চিন্তিত—আমি উঠিব ভাবিতেছি) বাবা—এবার পানের পুটলী বোঝাই দিয়ে সরে পড়বার চেষ্টা আছে বটে। কুত্তোর কথায় কিছু জ্ঞান নাই, তাই উঠবে কিনা ভাবচে বটে? বাধ্য হইয়া স্বীকার করিলাম। বাবা বলিলেন, এই তো বুদ্ধি তোমার গা—তাই বলচি। কুকুর কি মানুষ নয়—মা জগদম্বার সৃষ্টি! আমি হাসিয়া বলিলাম: কুকুর মানুষ! বাবা বলিলেন: মানুষ নয়! ৫৬ পৃ

শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ। কৃষ্ণদাস বাবাজী (হিন্দি ভাষায় মূল গ্রন্থ—শ্রীমৎ নাগজী শ্রীমৎপ্রিয়দাস তাহার টীকা প্রণয়ন করেন।)

দাস রঘুনাথ—

শ্রীমান দাস রঘুনাথ নামে হৈন খ্যাত
পরম বৈরাগ্য কৃষ্ণপ্রেমে উনমত।
সিংহদ্বারে থাকি কৈল অযাচক বৃত্তি॥

দাস রঘুনাথ সারাদিন ভজন করিয়া রাত্রি অধিক হইলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া অযাচক বৃত্তি করিতেন। সেবাইতরা সর্ব্ব কর্ম্মের পর যাওয়ার সময় কিছু প্রসাদ তাঁহাকে দিতেন—ইহাতে স্বতই তাহার মনে হইত, ঐ ব্যক্তি আসিতেছেন উনি বোধ হয় আজ আমায় দেবেন।...উনি ত কাল দিয়েছিলেন, অন্য বোধ ইনি দিতে পারেন।...হঠাৎ একদা ইহা এইরূপ অপেক্ষা তাহাকে লজ্জা দিল। তিনি সিংহদ্বার ছাড়িলেন।

প্রভু কহে, ভাল হৈল, ছাড়িল সিংহদ্বার
সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার আচার!—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
অন্ত্য ৬ পৃ

ইহার পর ছত্রে প্রসাদ পাওয়া দু এক দিবস লইলেন। তাহাও ছাড়িলেন কারণ ঠিক সময়ে যাইতে হয়।

কথোদিনে ছাড়াছাড়ি কৈল কিছু যুক্তি!
পড়া মহা প্রসাদ যাহা কুণ্ডেতে ভারয়ে।
ধুইয়া তাহার মধ্যে কণা যা থাকয়ে। ভক্তমাল।
প্রসাদান্ন পসারীর যত না বিকায়।
দুই তিন দিন হৈলে ভাত সড়ি যায়॥
সিংহদ্বারে গাভী আগে সেইভাত ডারে।
সড়া গন্ধে তৈলঙ্গগাই খাইতে না পারে॥
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি।
ভাত ধুঞা ফেলে ঘরে দিয়া বহু পানি।
ভিতরেতে দড় মাঝি যেই ভাত পায়।
লুন দিয়া রঘুনাথ সেই অন্ন খায়॥ শ্রীচৈ. চ. অন্ত্য ৬ পৃ

ঈশান নামেতে ভৃত্য সহিত চলিলা।
লুকাইয়া পঞ্চদশ মোহর ঈশান।
পথের সম্বল হেতু বাঁধি লইলেন।

এদিকে সনাতন গোস্বামী কারামুক্ত হইয়া ভৃত্য ঈশানের সহিত প্রভুর চরণ দর্শনাভিলাষে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রকাশ্য রাজপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পার্ব্বত্যপথে ফলমূলাদি দ্বারা কোনরূপে জীবন ধারণ করিয়া পাতড়া পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই পর্ব্বতে একজন ভূঞা উপাধিধারী দস্যু বাস করিত।...সনাতন গোস্বামী ঐ ভূঞার নিকট উপস্থিত হইয়া পর্ব্বত পার করিয়া দিবার নিমিত্ত তাহাকে অনুরোধ করিলেন। ভূঞার অধীনে একজন গণক ছিল। সে গণনা করিয়া কাহার নিকট কি আছে বলিয়া দিতে পারিত। গণক গণনা করিয়া ভূঞাকে জানাইল, এই ভৃত্যটির নিকট আটটি স্বর্ণ মুদ্রা আছে। ভূঞা আনন্দিত হইয়া সনাতন গোস্বামীকে বলিল, আমি রাত্রিতে আমার লোক দিয়া তোমাদিগকে পর্ব্বত পার করিয়া দিব। এখন তোমরা স্নানাহার করিয়া বিশ্রাম কর। এই কথা বলিয়া ভূঞা পরম সমাদর সহকারে রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিল। সনাতন গোস্বামী নদীতে স্নান করিয়া দুই দিন উপবাসের পর রন্ধন ও ভোজন করিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজমন্ত্রী সনাতন ভূঞার অতিরিক্ত আদর দেখিয়া সংশয়চিত্তে ভৃত্য ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট কি কিছু অর্থ আছে ঈশান আটটি মোহরের একটি গোপন করিয়া বলিল, হাঁ আমার কাছে। সনাতন গোস্বামী, ...মোহরগুলি আমাকে দাও!...সাতটি মোহর লইয়া ভূঞাকে দিয়া বলিলেন, আমার নিকট কয়েকটি মোহর আছে এইগুলি লইয়া ধর্ম্ম ভাবিয়া আমাকে পার করিয়া দাও...। ভূঞা হাসিয়া বলিল, তোমার ভৃত্যর নিকট আটটি মোহর ছিল তাহা আমি পূর্ব্বেই বিদিত হইয়াছি, আমি আজ রাত্রে তোমাদের মারিয়া ঐগুলি লইতাম। ভালই হইল আমি হত্যাপাপ হইতে অব্যাহতি পাইলাম। তুমি অতি সুবোধ, আমি তোমার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়াছি—মোহর লইব না, তোমাদিগকে পর্ব্বত পার করিয়া দিব। সনাতন গোস্বামী বলিলেন, তুমি যদি এই মোহরগুলি না লও, পথে অন্য কেহ আমাদিগকে মারিয়া কাড়িয়া লইবে, অতএব তুমিই গ্রহণ কর। আমরাও নিরাপদে গমন করি। ৩৭৮ পৃ

এক লীলা গোসাঞির শুন চমৎকার। যাহার শ্রবণে হয় ভবনিধি পার ॥
একদিন গোসাঞি স্নান করিতে যমুনা। স্পর্শমণি পাইলেন যাতে হয় সোনা ॥

একবার সনাতন যমুনাতে স্নান করিতে সময়ে এক স্পর্শমণি পাইয়াছিলেন। সনাতন সেইটি মাটি চাপা দিয়া রাখি দিলেন। কিছুকাল পরে দৈবযোগে গৌড়দেশীয় বর্দ্ধমানের দক্ষিণে মানকরের জীবন নামে ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত। সে বড় দীন দরিদ্র। সে কাশীতে এতকাল শিবব্রত করিয়াছিল, তাহাতে শিব সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বলেন,

বৃন্দাবনে সনাতন গোসাঞির স্থান
যাইলে পাইবে অর্থ ইথে নাহি আন।

তুমি বৃন্দাবন ধামে যাও, সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ কর। তোমার কামনা পূর্ণ হবে। এবং এই কথা জীবন সনাতনকে নিবেদন করিল। সনাতন অবাক হইয়া বলিলেন, আমি অর্থ কোথা পাব? ভিক্ষাজীবী মুঞি মোর অর্থ কোথা হয়! ইহাতে ব্রাহ্মণ কপাল চাপড়িল, হা হা মোর ভাগ্যে কি ঈশ্বর প্রতারিলা! ব্রাহ্মণের হাহা রবে সনাতন কাতর হইলেন; হঠাৎ তাঁহার স্পর্শমণির কথা মনে পড়িল, কহিলেন; হয় হয় ঠাকুর মোর স্মরণ হইল। মিথ্যা নহে শ্রীমন মহাদেব যে কহিল ॥ স্পর্শমণি লবে চল দেখাইয়া দিই। তাঁহারা যমুনা তীরে এক স্থানে আসিলেন, সনাতন গোসাঞি বলিলেন, এই জায়গা খুঁড়িয়া দেখ। বিপ্র খুঁড়িয়া স্পর্শমণি পাইয়া গোসাঞিকে প্রণাম করিয়া পথ চলিল। হঠাৎ তাহার মনে ইহা উদয় হয় যে, গোসাঞি ইহা দেখিল না পর্য্যন্ত। আর—আমার চরিত্র এই সেই বস্তু লাগি। তপ করি ঈশ্বর সেবনে অনুরাগী ॥ ছি ছি মোরে ধিক ধিক... ॥ সে দৌড়াইয়া যাইয়া সনাতনের পায়ে পড়িয়া বলিল, যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে মান না মুনি, তাহারই খানিক, মাগি আমি নত শিরে, এত বলি নদী নীরে ফেলিল মানিক।—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

সনাতন গোসাঞি মাধুকরী করিতে চৌবের গৃহে মথুরায় যাইতেন, সেখানে, 'মন মোহানয়া শ্রীমন্ মদনমোহন। শ্রীমতী কুব্জা মহিষীর প্রকাশন।' এই মদনমোহনকে দেখিয়া সনাতন মুগ্ধ হইয়াছিলেন। চৌবের দেহত্যাগের পর চৌবের গৃহিণীই ঐ বিগ্রহের সেবা করিতেন। যাহা কিন্তু আচার

বিহিত হইত না, সনাতন গোসাঞি ইহাতে বড় কষ্ট পাইতেন। এবং এই কথা চৌবে গৃহিণীকে বলিলেন। কিন্তু: চৌবের ঘরণী তাহা নাহি সমুঝিলা। নিজমতে প্রেমভাবে সেবিতে লাগিলা।। আর দিন সনাতন দেখিতে ইচ্ছিল। চৌবের বাড়ীতে গিয়া উপনীত হৈল। সনাতন গোসাঞি আশ্চর্য্য হয়ে দেখিলেন, মদনমোহন ও চৌবের পুত্র এক সঙ্গে খাইতে বসিয়াছেন। মদনমোহন বালক সুলভ চাপল্য প্রকাশ করিতেছেন গণ্ডগোল করিতেছেন। সনাতন গোসাঞি ইহাতে মূর্চ্ছিত প্রায়! ভাবিলেন, আমি ইহাকে সদাচার শিক্ষা দিতে গিয়াছিলাম। কি ধৃষ্টতা!—গোসাঞি কহেন মাত নিবেদন করি। আজি যদি মোরে কিছু দেহ মাধুকরি।। তোমার শিশুর এই পাত্র অবেশষ। যাহা থাকে তাহা দেহ করি কৃপালেশ।।

রাত্রিকালে স্বপনে, শ্রীমদনমোহন। শ্রীধান সনাতন গোস্বামীরে কহেন।। তুমি মোরে চৌবের ভবন হতে আনি। সেবা কর দিয়া মাত্র তুলসী আর পানি।। আবার ঠিক এমনই স্বপন দিলেন চৌবের ঘরণীকে, আমাকে সনাতনের হাতে অর্পণ কর।

কাঠিয়া বাবা। শ্রীশিশির কুমার রাহা।

বাবাজী মহারাজ সময় সময় বহু সাধু সঙ্গে করিয়া নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতেন।...যেখানে আসন স্থাপন করিতেন—সেখানকার অধিবাসীরা তাঁহাদের আহার যোগাইত। এই খাদ্য বণ্টন করিবার সময়...যে গণ্ডগোল সৃষ্টি না হইত তাহা নয়। সেবার (একবার) তাঁহাদের দলে এক সন্ন্যাসী পরমহংস ছিলেন তিনি এই সব দেখিয়া শুনিয়া যারপরনাই বিরক্ত হইয়া বাবাজী মহারাজকে বলিলেন—মহারাজ আপনার দলের সাধুদের দেখছি সাধন বৈরাগ্য কিছু নাই ...সামান্য খাওয়ার ব্যপার নিয়ে নিজেদের মধ্যে এত গণ্ডগোল করে এ কে সাধু সন্ন্যাসীর নিয়ম নয়।...বাবাজী মহারাজ অত্যন্ত বিনয় সহকারে কহিলেন, মহারাজ কি ভাবে আমাদের চলা উচিত। আপনি যদি আদেশ করেন...। পরমহংসজী—সাধুদের নিয়ম, কাহারো নিকট চাইতে নাই...আপনা হতে যা আসবে তাতেই সন্তুষ্ট...যদি কখনো কিছু নাও আসে তাহলেও তারা অসন্তোষ প্রকাশ করিবে না। ...তিনি দলের সাধুদের বলিয়া দিলেন দেখ গ্রামবাসীরা তোমাদের আহার

যোগাবে না নিজেদের আহার যোগাড় কর। বাবাজী ও পরমহংসজীর আসন পাশাপাশি আসন না ছাড়িয়া যাওয়াতে তাঁহারা উপবাসী রহিলেন। এইরূপে দিনের পর দিন যায়...পরমহংসজীর শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে লাগিল।... তিনি ক্ষুধার জ্বালা আর সহ্য করিতে না পারিয়া...বলিলেন, মহারাজ! আমার ত প্রাণ যায় আপনি অনুগ্রহ করে গ্রাম হতে কিছু ভিক্ষা করে নিয়ে এসে আমার প্রাণ রক্ষা করুন। বাবাজী মহারাজ—সে কি পরমহংসজী বৈরাগ্যের লক্ষণ ভুলে গেলেন—আপনিই না বলছিলেন সাধু সন্ন্যাসীদের কারো নিকট কিছু চাইতে নাই...। ৪৮ পৃ

কুম্ভ মেলা। শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ সঙ্গে করিয়া মেলা স্থানে একটি গাভী আনিয়াছেন। শীত খুব পড়িয়াছে। তিনি নিজের গায়ের কম্বলখানা ঐ গাভীটির গায়ে জড়াইয়া দিয়া নিজে খালি গায়ে বসিয়া আছেন। তাহাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া...মিত্র মহাশয় কহিলেন, বাবাজী মহারাজ পশুপক্ষী ত খালি গায়েই থাকে। আপনি গায়ের কম্বলখানা গাভীটিকে দিয়ে এই অসহ্য শীতে খালি গায়ে আছেন কেন? শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ—বাবা বড় শীত পড়েছে, গাভীটির বড় কষ্ট হচ্ছে, তাই একে কম্বল খানা দিয়েছি। আমার ত ধুনি রয়েছে গায়ে রজও মাখি, কাজেই কোন কষ্ট হয় না। ৬২ পৃ

একে (গাভী) এত দূরে না এনে শ্রীবৃন্দাবনেই রেখে আসলে পারতেন। (এই প্রশ্নে) শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ—আমি কি আর ইচ্ছে করে এনেছি, আমি ত শ্রীবৃন্দাবন হ'তে রেল গাড়ীতেই এখানে আসতে পারতুম কিন্তু গাভীটি যখন বল্লে, আমার সঙ্গে কুম্ভমেলায় আসা তার একান্ত ইচ্ছা, তখন আর কি করে তা:ক ফেলে আসি। তাই তাকে নিয়ে হাটা পথে মেলায় এসেছি—এতে আমার কোন কষ্ট হয়নি। ৬২ পৃ

একদিন অভয়বাবু কঠিয়াবাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ প্রহ্লাদ আর ধ্রুবর মত ভক্ত কি আজকালকার দিনে হয়? তিনি উত্তর করিলেন, হাঁ হয়। অভয়বাবু—এই মেলায় কি এমন কেহ এসে:ছন! কঠিয়া বাবা, হা অনেকে এসেছেন। তার চাইতে বড়ও অনেকে এসেছেন। কিন্তু তোমাদের চোখ কোথায় যে দেখবে। ৬২ পৃ

(অভয়বাবু) রাত্রিতে ঘুমাইয়া আছেন, শ্রীযুত বাবাজী মহারাজ তখন

তাঁহাকে দর্শন দিলেন, এবং খুব ধমক দিয়া কহিলেন, তুমি পড়ে পড়ে ঘুমাবে আর ভগবান তোমাকে দর্শন দেবেন? আমি তোমায় ভগবৎ নাম দিয়েছি তুমি জপ কর না কেন? ভগবান বুঝি এমনি পাওয়া যায়। ৮৭ পৃ

শ্রীবৃন্দাবনে একবার এক রাজা আসিয়া বাস করেন। তিনি একদিন বাবাজী মহারাজাকে তাঁহার বাড়ী লইয়া যান এবং যথাসাধ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। রাজার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বাবাজী ঐ রাজবাড়ী হইতে বাহির হইবেন, দারোয়ান তাঁহাকে প্রণাম করিল। আর কথা কি— সেখানেই দারোয়ানের কাছে বসিয়া প'ড়লেন...ঝুলি হইতে গাঁজার কল্কি বাহির করিলেন এবং দারোয়ানের সহিত পরমানন্দে ধূমপান করিতে লাগিলেন। ৯৫ পৃ

একদিন ছন্নু সিং বাবাজীর নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত হইল। এই লোকটির নাম গোসাঞা (ডাকাত ছিল ১৪ বছর দ্বীপান্তর হয়—কিন্তু শোধরায় নাই)। ছন্নু বলিলেন মহারাজ আপনি সিদ্ধ পুরুষ...অনুগ্রহ করে এই দুর্দ্দান্ত গোসাঞাকে ভাল করে দিন। বাবাজী মহারাজ—কিরে গোসাঞা তুই আমার চেলা হবি? ভীষণ দুর্দ্দান্ত গোসাঞা কহিল মহারাজ জীবনে না করেছি এমন কুকর্ম্ম নেই···আমাকে কি চেলা করবেন...বাবাজী মহারাজ চোর গোসাঞাকে কৃপা করিয়া দীক্ষাদান করিলেন। ৮০ পৃ

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ—১ম (১২৯৩—৯৬ সালের ডায়েরী) শ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী।

আজকাল গোস্বামী মহাশয়ের আগমনে ব্রহ্মসমাজে নিত্য উৎসব চলিয়াছে। প্রত্যহই অপরাহ্নে প্রচারক নিবাস লোকে লোকারণ্য। নানা শ্রেণীর বাউল বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক সাধকদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া, গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় নীতিমান সত্যনিষ্ঠ, আদর্শ সাধুপুরুষ রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক স্ত্রী পুরুষের প্রণয় ঘটিত সঙ্গীত শুনিয়া অশ্রু-ধারায় ভাসিয়া যান, কাঁদিতে কাঁদিতে বিহ্বল হইয়া সময়ে সময়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন—ইহা দেখিয়া আমি একেবারে অবাক হইয়া যাইতেছি। কিছুদিন পূর্ব্বেও আমাদের বাড়ীর চতুঃপার্শ্বে, পথে ঘাটে মাঠে চাচা প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকদের মুখে এই সব ভাবেরই গান শুনিয়া হাতে

ঠেঙ্গা লইয়া তাহাদের তাড়া করিয়াছি। হায় হায় নীতির আদর্শস্থান ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য গোস্বামী মহাশয়ের এইরূপ ভাব! ২ পৃ

আমার প্ররোচনায় দুটি বন্ধু ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু, উপবীত না থাকিলেও, তাহাদের লইয়া আমাদের সমাজে কোন গোলমাল নাই। পাড়ার বৃদ্ধরা তাঁহাদিগকে উপবীত লওয়ার জন্য অনেক বুঝাইয়াও কোন ফল পান নাই। এখন তাঁহারা সে চেষ্টায় নিরাশ হইয়া বলিতেছেন, ওহে আমাদের দুর্নীতির চিহ্ন গলায় দড়ি—তা যেন ত্যাগই করেছে, তোমাদের সুনীতির চিহ্ন জামা সার্ট সর্ব্বদা পরাটা ছাড়লে কেন? ওগুলো গায়ে রাখলে বাঁচি। আমি আজ পর্য্যন্ত উপবীত ত্যাগ করিতে পারিলাম না বলিয়া ব্রাহ্ম বন্ধুরা বড়ই দুঃখিত। ৭ পৃ

(কুলদা ব্রহ্মচারী যোগসাধন দীক্ষা লইতে যাইলে আচার্য্য মহাশয় তাহাকে অভিভাবকের অনুমতি লইতে বলেন :···ছোট দাদার নিকট অনুমতি পত্রের কথা তুলতেই তিনি খুব রাগিয়া আমাকে ধমক দিয়া বলিলেন, সে সব কিছু হবে না। যোগ করলে ভয়ানক রোগ জন্মে। মাথা তো একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। ভাল ভাল লোক ওর ভিতরে গিয়ে চিরকালের মত একবারে অকর্ম্মা ভেড়া হয়ে গেছে।···১১ পৃ

(আচার্য্য) সরল বিশ্বাসে, যথার্থ কাতর হইয়া কেহ ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিলে ভগবান নিশ্চয় তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন···একবার ইউরোপে কোন দেশে দীর্ঘকালব্যাপিনী দারুণ অনাবৃষ্টি হয়। সর্ব্বত্রই বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা আরম্ভ হইল। সেই সময়ে একটি সহরে, সকলে সমবেত হইয়া বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করিবেন এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। নির্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নগরবাসী সকলে গির্জ্জায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ঐ সময়ে একটি বালক, ছাতা হাতে উপাসনার স্থলে আসিল। বালকের হাতে ছাতা দেখিয়া সকলে তাহাকে বলিলেন, কি হে বালক তুমি ত বড় বোকা দেখছি। এই সময়ে ছাতা কেন? বালক বলিল—আজ বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা হইবে। ভগবান বৃষ্টি দেবেন, তখন কি করব? ছাতা না থাকলে যে ভিজে ভিজে বাড়ী যেতে হবে। সকলে বালকের কথা শুনিয়া অবাক হইলেন। প্রার্থনার পর যথার্থই বৃষ্টি হইল। তখন বালক সকলকে বলিল, ভগবানের

উপর তোমাদের যদি বিশ্বাস থাকতো, ছাতা ফেলে আসতে না। ১২ পৃ

আজ স্কুল হইতে আসার পরে ছোটদাদা বলিলেন, মেজদাদা (শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বন্দোপাধ্যায়) ঢাকায় আসিয়াছেন ; তিনি একরামপুরে তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের বাসায় উঠিয়াছেন। কল্য বৈকালে তোমাকে তাঁহার নিকট যাইতে বলিয়াছেন। মেজদাদার কথা শুনিয়া আমার হৃদকম্প উপস্থিত হইল... মেজদাদার নিকট গিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই তিনি একবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া গেলেন। অত্যন্ত তীব্র ভাষায় কর্কশস্বরে গালি দিতে দিতে যেন ক্ষেপিয়া উঠিলেন। চটি জুতা হাতে লইয়া আমাকে প্রহার করিতে দু চার পা অগ্রসর হইলেন। ভাগ্যক্রমে বৌদিদির বাধা পাইয়া বসিয়া গেলেন। অবশেষে আমাকে বলিলেন, যোগ শব্দটি ফের যদি কখনও তোর মুখে শুনতে পাই জুতিয়ে পিঠের ছাল চামড়া তুলে দিব। আমাদের তো যত প্রকারে অপমান করবার করছিস্ এখন মৃত পিতাকেও নরকস্থ করবার চেষ্টা হচ্ছে! তুই মরলে আমাদের শান্তি হয়! ১৩ পৃ

(বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কুলদানন্দকে তাঁহার বড় দাদাকে অনুমতির জন্য লিখিতে বলেন)

যদি বড়দাদাও অনুমতি না দেন তবে কি হইবে? এ কথা বলিতে আরম্ভ করা—মাত্রই···গোঁসাইয়ের কয়েকটি শিষ্য···বলিলেন, ও কি গোঁসাইয়ের কথার প্রতিবাদ করছিস ওতে যে অপরাধ হয়—উনি যখন বলছেন তখন নিশ্চয়ই তিনি অনুমতি দিবেন। আমি একথা শুনিয়া অবাক হইলাম, হাসিও পাইল। ভাবিলাম—হা ভগবান এমন কুসংস্কারী লোকও আবার ব্রাহ্ম সমাজে আসে! ১৫ পৃ

আজ বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজ স্ত্রীলোক পুরুষে পরিপূর্ণ। মন্দিরে ও চতুর্দ্দিকের প্রাঙ্গণে লোক আর ধরে না। গোস্বামী মহাশয়... উপাসনা করিতে বেদিতে বসিলেন। শারদীয় পূজার আগমনে পূজা আসিতেছে মনে করিয়া, দেশশুদ্ধ লোকের যে কেমন একটা আনন্দ উৎসব ও উল্লাসের উদয় হয় তাহা বর্ণনা করিয়া···সকলের ভিতর একটা আশ্চর্য্য ভাবের সঞ্চয় করিয়া দিলেন, উপাসনা করিতে বসিয়া দুচার কথা বলিয়াই ভাবে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন— .

এই মা! এই যে আমার মা এসেছেন...

এই সব বলিয়া ভগবানকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াই যেন গদগদ ভাবে, করজোড়ে কাঁদ কাঁদ স্বরে স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন।...অব্যক্ত একটা ভাবে সকলকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। মন্দিরের বাহিরে ভিতরে চতুর্দ্দিকে ভাবোচ্ছ্বাসের হুঁ হুঁ শব্দ পড়িয়া গেল। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কান্নার রোল উঠিল। শ্রীযুক্ত ডাক্তার পি কে রায় প্রমুখ দুচার জন গণ্য মান্য পদস্থ ব্রাহ্ম গোলমাল থামাইতে থামুন থামুন চুপ করুন চুপ করুন বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন কে আর কার কথা শুনে। বেগতিক দেখিয়া শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায় হারমোনিয়মের সুর চড়াইয়া গান সুরু করিয়া দিলেন। এদিকে গোস্বামী মহাশয় জয়মা জয়মা বলিয়া বেদি হইতে লাফাইয়া পড়িলেন, উচ্চ সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল, গোস্বামী মহাশয় নৃত্য করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে বালকবৃদ্ধ যুবকেরা স্থানে স্থানে বেহুস হইয়া পড়িলেন। হুঙ্কার গর্জ্জনে ও বিচিত্র ভাবোচ্ছ্বাসের ধ্বনিতে ব্রাহ্মমন্দির পরিপূর্ণ হইল। ১৬-১৭ পৃ

(কুলদানন্দ বাড়ী হইতে ঢাকায় আসেন মা ও ভাইঝির কলেরার ঔষধ লইতে)

গোস্বামী,...বাড়ী থেকে এলে বুঝি

আমি – এই মাত্র বাড়ী থেকে আসছি।

গো – কেমন, অবস্থা কি রকম?

আমি – মা'র ও একটি ভাইঝির কলেরা হয়েছে।

গো – তুমি ঔষধ নিতে এসেছে?

– হাঁ।

...মেয়েটি কি ছোট?

– সাত আট বছর হবে।

গোঁসাই শুনিয়া আহা আহা করিয়া দুঃখপ্রকাশপূর্ব্বক চোখ বুজিলেন...। মার জন্য ব্যস্ত হয়ো না। ওষুধ নিয়ে যাও, ওতে গ্রামবাসীদেরও উপকার হবে।

আমি তাড়াতাড়ি ঔষধ লইয়া বাড়ী রওনা হইলাম...আমি যে বাড়ী হইতে আসিয়াছি তাহাই বা তিনি জানিলেন কি প্রকারে? কেমন? অবস্থা কি

রকম কিছু না জানিলে এরূপ প্রশ্নই বা করিবেন কেন?...আমি দ্রুত বাড়িতে বাড়ী পৌঁছবামাত্রই শুনিলাম—সকালেই মেয়েটি মারা গিয়াছে আর মার অবস্থা এখন ভালর দিকে ফিরিয়াছে। ২৫ পৃ

সকালে ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া দেখি—প্রচারকনিবাস লোকে পরিপূর্ণ। গোস্বামী মহাশয়ের সম্মুখে বসিয়া কাঙ্গাল ফিকির চাঁদ ফকির...ভাবে উন্মত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিতেছেন, মা নই আমি সে ছেলে।—একটু পরে গোস্বামী মহাশয় খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন...হাসি থামিস...গদগদভাবে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন... ঐ দেখ পাগলা এসেছে—ঐ ...দেখ নন্দী ভৃঙ্গী

বাসায় আসিবার কয়েক ঘণ্টা চিত্তটি বেশ সরস ও প্রফুল্ল রহিল, পরে ধীরে ধীরে মনের ভিতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। মনে হইল, গোঁসাই এসব কি করিতেছেন নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানীদের প্রধান আচার্য্য হইয়া অনায়াসে ব্রাহ্মমন্দিরে দাঁড়াইয়া পৌত্তলিকতা প্রচার করিতেছেন। নন্দী ভৃঙ্গি বাল্মীকি নারদাদির দর্শন ও সময়ে সময়ে তাহাদের স্তব স্তুতি এসব কি?—এসব কি স্বাভাবিক মস্তিষ্কের কার্য্য...। ২৮ পৃ

...শুক্রবার সকালে টেলিগ্রাম আসিল, গোস্বামী মহাশয়ের অবস্থা খারাপ ডবল নিউমোনিয়া হইয়া দুটি ফুসফুস পচিয়া যাইতেছে—জীবনের আশা নাই। ...গুরুভাই শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বক্সী মহাশয়...তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট বারদী চলিয়া গেলেন...ব্রহ্মচারী কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হইলেন, পরে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন সময় শেষ করে এসেছিস্। এখন আর কি হবে। আমি ত তাঁকে ঘরে দেখতে পেলাম না। হয়, হয়ে গিয়েছে অথবা তাঁর গুরু তাঁকে দেহ ছাড়িয়া থাকিবার শক্তি দিয়াছেন, আচ্ছা তুই যা মঙ্গলবারের মধ্যে যদি 'তার' আসে তবে বুঝবি ভয় নাই। চিন্তা করিস না, আমি সেখানে যাচ্ছি। ইহার পর ব্রহ্মচারী মহাশয় আসন হইতে উঠিয়া সকলকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন—যতদিন ভিতর হইতে দরজা না খুলি, কেহ এ দরজায় ঘা দিও না। বা খুলিতে চেষ্টা কারও না। ব্রহ্মচারী মহাশয় ঘরে ঢুকিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিলেন।

সেদিন ঢাকাহইতেও পূর্ব্বোক্ত সকলে দ্বারভাঙ্গা যাইতেছিলেন। গোয়ালন্দের

জাহাজে উঠিয়া সকলে বিমর্ষ হইয়া বসিয়া আছেন…অকস্মাৎ যোগজীবন আকাশের দিকে তাকাইয়া অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলিয়া উঠিলেন ঐ দেখ ব্রহ্মচারী মহাশয়ও দ্বারভাঙ্গা যাচ্ছেন। আমাকে তিনি হাত নাড়িয়া বলিলেন, আমিও দ্বারভাঙ্গায় যাচ্ছি! তোরা আর ভাবিস না—কোন ভয় নেই। ৩৭ পৃ

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহঠাকুরতা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয় তাঁহাদের ডায়েরীতে গোঁসায়ের এই সময়ের অদ্ভুত ঘটনাবলী বিশদরূপে লিখিয়া রাখিয়াছেন।…উহাদের ডায়েরীদৃষ্টে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র আভাস এই স্থলে লিখিয়া যাইতেছি।

১০ই ফালগুনে গোস্বামী মহাশয় পশ্চিমে যাওয়ার অভিপ্রায় কলিকাতা যাত্রা করিলেন। তথায় একদিবস অপেক্ষা করিয়া পরদিন শ্যামনগরে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে নৌকাযোগে চূচূড়াতে পৌঁছিয়া, বুধবার মহর্ষি শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মহর্ষি গোস্বামী মহাশয়কে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আহা সকলে বলে গোঁসাই পাগল হয়েছেন, পৌত্তলিকের ন্যায় ব্যবহার করেন, কিন্তু কই? আমি তো এঁকে ধূপ ধুনার সুগন্ধ-ধূমাবৃত উজ্জ্বল দুর্গাপ্রতিমার ন্যায় দেখেছি। ৩৮ পৃ

এই সময়ে মহর্ষির নিকট একখানা চিঠি আসিয়া পড়িল। কোনও একটি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম কতিপয় প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে লিখিয়াছেন, আপনি নির্জ্জনে অনেকদিন ধরিয়া ধর্ম সাধন করিলেন—কি লাভ করিলেন? এবং এই সম্বন্ধে আপনি কি উপদেশ দেন, ইত্যাদি। মহর্ষি পত্রখানার উত্তর দিতে, তাঁর অনুগত ভক্ত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে বলিলেন, লিখে দাও এখন হতে …গোঁসাই যাহা বলেন, তাহা আমারই কথা। ৩৮ পৃ

গোস্বামী মহাশয় সুস্থ হইয়া ১৯শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার দিবসে পরিবারবর্গ ও শিষ্যগণের সহিত দেওঘর রওনা হইলেন (দ্বারভাঙ্গা হইতে)। রাস্তায় মোকামা ঘাটে গাড়ি পরিবর্তন করিতে হয়। এই সময় কোন বাবু টিকিট করিতে বুকিং অফিসে গেলেন—আসিয়া দেখিলেন, অনেকগুলি লিচু গাড়িতে রহিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—লিচু কোথা হইতে আসিল? গোঁসাই বলিলেন, দ্বারভাঙ্গায় থাকতে লিচু খেতে ইচ্ছা হয়েছিল, তাই পরমহংসজী দিয়ে গেলেন। সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন। কে যে কখন লিচু দিয়া গেলেন উহারা

কেহই তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই।—আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এদিকে এখনও লিচু পাকে নাই। ৩৯ পৃ

...আজ অপরাহ্নে সমাজে যাইয়া শুনিলাম, একটি জটিল উদাসী সাধু বহুক্ষণ হয় গোস্বামীর মহাশয়ের নিকটে আসিয়া রহিয়াছেন। গোঁসাই তাহাকে বড়ই শ্রদ্ধাভক্তি করিতেছেন। গোঁসাইয়ের শিষ্যরা নাকি তাহাকে প্রচারক নিবাসেই গঞ্জিকা সেবনের যোগাড় করিয়া দিয়াছেন, এবং তিনিও স্বেচ্ছামত গাঁজায় দম মারিতেছেন। শুনিয়া আমার ভিতর জ্বলিয়া উঠিল, আমি সকলকে বলিলাম, আপনারা অপেক্ষা করুন। ঐ গাঁজিয়ালটাকে একটি বার গাঁজা খাইতে দেখিলে এখনই আমি উহাকে সমাজ কম্পাউণ্ড হইতে চলিয়া যাইতে বলিব। এই বলিয়া খুব দম্ভের সহিত যেমন বলিলাম, অকস্মাৎ শূন্য স্থানে সিঁড়ি অনুমানে পা ফেলিয়া দড়াম করিয়া নীচে পড়িয়া গেলাম। পায়ে বিষম আঘাত লাগিল। ৪৮ পৃ

পুরাণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা গোস্বামী মহাশয়ই প্রথম আরম্ভ করিলেন। শুনিতেছি ইতিপূর্ব্বে এ ভাবের ব্যাখ্যা নাকি আর কখনও হয় নাই। এই প্রকার রূপক ব্যাখ্যা শুনিয়া ব্রাহ্মভাবাপন্ন অনেকেই মহাভারত রামায়ণ পুরাণাদির প্রতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হইতেছেন। ৫৩ পৃ

সঙ্কীর্ত্তনের রব ও খোলের ধ্বনি শুনিলেই গোঁসাই যেন কি রকম হইয়া পড়েন, উচ্চ উচ্চ লাফ প্রদানপূর্ব্বক 'হরিবোল হরিবোল' বলিতে বলিতে জ্ঞান-শূন্য হন, কখনও একেবারে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। গোঁসাইয়ের এইরূপ মত্ততায় বহু লোকের ভাব জাগাইয়া দেয়।...কয়েকটি শিষ্যদের মধ্যেই মাতামাতির ভাবটা বেশী দেখা যায়। আমরাও অনেকে ভাব করিতে চেষ্টা করি। কিন্তু খাঁটি ভাব হয় না। মেহনৎ মাত্রই সার। ৫৩ পৃ

আজ প্রচারক নিবাসের আঙ্গিনায় সঙ্কীর্ত্তনে মহাহুলস্থুল ব্যাপার। আনন্দ কোলাহলে সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গন পরিপূর্ণ। অনেকেই আজ ভাবাবেগে 'ডগমগ'।...শ্রীধরবাবু মাতিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন।...বাহ্য সংজ্ঞা হারাইয়াও এমন শৃঙ্খলার সহিত নৃত্য করা বিশেষ একটি শক্তির প্রভাবে ভিন্ন হয় না।... শ্রীধরের চক্ষে পলক নাই। অকস্মাৎ উচ্চ লাফ সহকারে শূন্য আকাশে অঙ্গুলি-নির্দেশ পূর্ব্বক চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, ঐ দেখ কালী। ঐ দেখ

কালী। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মটি (যিনি) শ্রীধরকে জাগাইয়া বড়ই আনন্দ করিতে-ছিলেন, কিন্তু ঐ কালী শব্দটি যেমনই শুনিলেন, অমনি শ্রীধরকে ধাক্কা দিয়া আলিঙ্গন মুক্ত করিয়া বলিলেন, দূর শালা, বল পরব্রহ্ম বল পর ব্রহ্ম। তিনি বল পরব্রহ্ম বল পরব্রহ্ম বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। শ্রীধর জয় কালী জয় কালী বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ৫৪ পৃ

সঙ্কীর্ত্তনান্তে কতিপয় ব্রাহ্ম এই বিষয় লইয়া কিছুক্ষণ আলোচনা করিলেন। তাহারা বলিলেন, গোঁসাই হরিনাম ব্রাহ্মসমাজে চালাইয়াছেন, তাঁহার শিষ্যরা এখন কালী দুর্গা প্রভৃতি নামও চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন। ৫৪ পৃ

আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রত্যহই অপরাহ্নে একবার গোস্বামী মহাশয়ের কাছে আসেন তিনি বেশ গাহিতে পারেন। গোস্বামী মহাশয়ের রুচি বুঝিয়া অনেক সময়ে তিনি কৃষ্ণকান্ত পাঠকের গান গাহিয়া থাকেন। তাঁহার সঙ্কলিত সঙ্গীতমুক্তাবলী ও প্রেমসঙ্গীত হইতেও মাঝে মাঝে তিনি নিম্নলিখিত গান গাহিয়া থাকেন যথা – 'জলে ঢেউ দিও না সখি, আমি কালরূপ নিরখি' 'তারে দিয়ে প্রাণ চরণ পেলাম না সজনি, আমি হলেম গৌর কলঙ্কিনী' – গোঁসাই এইসব গান শুনিয়া ভাবে ডগমগ হইয়া পড়েন। গোঁসাইয়ের ভাব দেখিয়া উপস্থিত সকলেও বিমুগ্ধ হইয়া যান। গানগুলি যে কি ভাবের আশ্চর্য্য এই যে ব্রাহ্ম মহাশয়েরাও তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর পান না। ৫৬-৫৭ পৃ

বিক্রমপুর নিবাসী, জগন্নাথ স্কুলের একটি ছেলে রাধাকৃষ্ণের একখানা চিত্র-পট হাতে লইয়া ঘরের সকলকে অতিক্রম করিয়া একেবারে গোস্বামী মহাশয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে যাইয়া বসিল ; পুনঃপুনঃ গোঁসাইয়ের পায়ে লুটাইয়া পড়িতে লাগিল, রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি গোঁসাইয়ের মুখের কছে ধরিয়া পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিল, গোঁসাই বলে দাও বলে দাও কিরূপে পাইব, বল। আহা কি সুন্দর মূর্ত্তি! আর কিছু আমি চাই না।। আর কিছু চাই না।। কি রূপে পাব বলে দাও। গোঁসাই পুনঃপুনঃ তাহাকে স্থির হও, স্থির হও বলিয়াও কিছুতেই তাহার সেই অস্থিরতা থামাইতে পারিলেন না। ছেলেটি যেন আরও ক্ষেপিয়া উঠিল। তখন গোঁসাই ধমক দিয়া বলিলেন, বটে? এখানে চালাকী। আর কিছু

চাও না ? নবাবের বাগানে নির্জ্জনে সুন্দরী একটি যুবতী পেলে চাও কি না ভেবে বল তো ? চালাকী করছ ? গোঁসাইয়ের কথা শুনিবামাত্র ছেলেটির সমস্ত ভাব যে শুকাইয়া গেল। ৭২ পৃ

আর আর দিনের মত আজও প্রত্যুষে উঠিয়া, নিজ আসনে বসিয়া স্থিরভাবে নাম করিতেছি অকস্মাৎ দেখিলাম—একটি অদ্ভুত জ্যোতি ঝিকমিক করিয়া প্রকাশ হইল।...ধীর তরঙ্গায়িত স্বচ্ছ জলাশয়ে চন্দ্রপ্রতিবিম্বের ন্যায়, অত্যুজ্জ্বল চঞ্চল জ্যোতি নিজ ললাট মধ্যে দর্শন করিতে করিতে আমি আনন্দে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলাম।...ঢাকায় পঁহুছিয়া গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য শ্রীযুক্ত শ্যামকান্ত পণ্ডিত, শ্রীধর ঘোষ ও শ্রীমান লাল বিহারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম ...এই দর্শন বিষয়ে পরিষ্কার করিয়া বলিলাম।...পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—উহাই ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দিব্যচক্ষু...। লাল বলিলেন, এই জ্যোতি ক্রমে হৃদয়ে আসিয়া পড়ে এবং অষ্টপ্রহর আনন্দ বিরাজ করে...। শ্রীধর বলিলেন, আরে ভাই এই ত জিনিস, একেই ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ বলে...। ইহাদের কথায় পরস্পর বিরোধী বিশেষ কিছু না থাকিলেও আমার সন্দেহ হয়...ব্রাহ্ম ডাক্তার কৈলাস বাবুর নিকট গেলাম...জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ দর্শন আমার চোখের চোখের দোষ বা মাথার কোন রোগের দরুণ হয় নাই তো ; ডাক্তারবাবু বলিলেন, তা ভিন্ন আর কি বলিব, তোমার তো সর্ট-সাইট আছে। চোখের রোগে মানুষ দিন দুপুরেও জোনাকি পোকা দেখে। আমাদের এ 'পারফেক্ট সায়েন্স' ডাক্তারী কেতাবে ও রূপ ঢের ঢের প্রমাণ আছে। যোগ টোগ করে চোখ মাথা নষ্ট হইলে, আরও কত দেখবে। ৮৩-৮৪ পৃ

২৬শে চৈত্র শনিবার (১২৯৪ ?) ঢাকায় টর্নেডো। বেলা অবসানে পশ্চিমাকাশে নদীর উপর এক খণ্ড মেঘ দেখা দিল। নবাব গণি মিঞা সাহেব বাড়ীর দক্ষিণে অকস্মাৎ ঘূর্ণিবায়ু উঠিল—বুড়ীগঙ্গার জল আলোড়িত করিয়া তুলিল।...এই কয়েক মিনিটের মধ্যে ঢাকা ও বিক্রমপুরে শত শত গ্রামে যে সব অস্বাভাবিক কাণ্ড ঘটিয়া গেল তাহা বুদ্ধির অগোচর ও বিস্ময়জনক !

বুড়ী গঙ্গার দক্ষিণ পার হইতে একটি বৃদ্ধাকে নদীর উত্তর পারে, সহরের মধ্যে উচ্চ অট্টালিকা সমূহ অতিক্রম করিয়া নর্ম্যাল স্কুলের দোতলায় একটি কঠোর ভিতরে আনিয়া রাখিয়াছে...... ২। ঢাকা প্রকাশ যন্ত্রালয়ের একখানা

টেবিল ৫/৬ মিনিট দূরের পথে একটি ভদ্রলোকের বাড়ীতে নিয়া ফেলিয়াছে। টেবিলটি আড়াই মণ ভারি।...৩। মুড়ি পরিপূর্ণ কলসী...৩/৪ মিনিট দূরের পথে অপর এক বাড়ীতে আনিয়া বসাইয়া দিয়াছে। আলগা সরার ঢাকনি সমেত মুড়ি পরিপূর্ণ কলসীটি যেমন ছিল ঠিক তেমনই আছে। ৫। সুদৃঢ় বৃহৎ অট্টালিকার কতকাংশ ভাঙ্গিয়া ইষ্টকাদি পর্য্যন্ত নিশ্চিহ্ন করিয়া লইয়া গিয়াছে অথচ তাহার ঠিক পার্শ্বে মাত্র ১২/১৪ ফুট অন্তরে অর্দ্ধশুষ্ক গোলাপফুলের একটি পাপড়িও বৃন্তচ্যুত হয় নাই। ৮৬ পৃ

আমি প্রশ্ন করিলাম, আপনি নাকি একবার উদয়াচলে গিয়াছিলেন? (বারদীর) ব্রহ্মচারী বলিলেন, চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু যেতে পারি নাই আমার সঙ্গে আরও তিনজন ছিল হিতলাল মিশ্র (ত্রৈলঙ্গ স্বামী) বেণী মাধব গঙ্গোপাধ্যায় নামে এক মহাত্মা, আবদুল গফুর নামে একজন মুসলমান ফকির। আমরা এই চারজনে সূর্য্যলোকে যাইব সঙ্কল্প করিয়া হাঁটিয়া হাঁটিয়া চলিলাম। হিমালয়ের উপর দিয়া ক্রমশঃ উত্তর দিকে চলিতে লাগিলাম, আহার আমাদের ফলমূল মাত্র। বরফের উপর দিয়া এই ভাবে বহুকাল চলাতে শরীরের চর্ম্ম এক রকম খড়খড়ে হইয়া গেল। পরে সাপের যেমন খোলস ওঠে, আমাদের সেই প্রকার একটা খোলস উঠিয়া গেল, তখন শরীরটি ঠিক দুধের মত সাদা হইল। ছয় মাস দিন ছয় মাস রাত্রি যেখানে হয় আমরা সেস্থানও ছাড়াইয়া বহুদূর গেলাম। সেখানে এখানের মত দিনরাত বা চন্দ্র সূর্য্য কিছুই নাই প্রশ্ন। কতকাল আপনারা ঐ রূপ স্থানে চলিয়াছিলেন!

ব্রহ্মচারী। যেখানে চন্দ্র নাই সূর্য্য নাই দিন রাত্রি কিছু নাই সেখানে সময় বা বৎসরের হিসাব পাইব কি উপায়ে? তবে বহুকাল চলিয়াছিলাম এই মাত্র বলিতে পারি—!

প্রশ্ন। আপনারা কি উদয়াচলে উঠেছিলেন?

ব্রহ্মচারী। আমরা সকলেই উঠেছিলাম। ৯২ পৃ

ব্রহ্মচারী।...বহুস্থান ঘুরে চন্দ্রনাথ যেতেছিলাম, রাস্তায় আমাকে পুলিশ ধরল, তারপর এখানে।

আপনাকে পুলিশ ধরেছিল কেন?

কামখ্যা (গৌহাটী) সহরের ম্যাজিষ্টার সাহেব কয়েকটি সাধুর জটার ভিতরে

টাকা মোহার পেয়ে, চোর অনুমানে তাঁদের জেলে আটক রাখেন। জটাধারী পেলেই তাকে ধরবার জন্য পুলিশের উপর হুকুম হল। আমার জটা ছিল, তাই আমাকেও ধরলেন।…৯৩ পৃ

…বাসায় আসিবার সময়ে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বকসী মহাশয়ের সঙ্গে চলিলাম। তিনি রাস্তায় গোস্বামী মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা ও অসাধারণ দয়ার অনেক কথা তুলিয়া, হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, দেখুন, আমি ব্রাহ্ম সমাজের লোক। ঠাকুরের চরণামৃত নিতে সাহস পাই না। প্রত্যহ রাত্রিতে শোবার সময়ে মাথার কাছে একটি খালি বাটি রাখিয়া মনে মনে প্রার্থনা করি যেন তিনি চরণামৃত রাখিয়া যান। আশ্চর্য্য তাঁর দয়া। প্রতিদিনই শেষরাত্রে উঠিয়া ঐ বাটিতে চরণামৃত পাই। এই ব্যাপার নিত্য ঘটিতেছে।… ১১০ পৃ

…তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, ওরে, তোর কিছু বলবার থাকলে এখন বল?

কামের অসহ্য যন্ত্রণায় আমি বড় অস্থির হইতেছি। কি করব?

কেন রমণ করবি, তোর কি জুটে না?

ঢের জুটে; কিন্তু তাতে যে পাপ হয়।

আচ্ছা যা তোকে কোন পাপ স্পর্শ করবে না—সব পাপ আমার।

লোকে যে নিন্দা করবে।

কে নিন্দা করবে? জ্ঞানীরা নিন্দা করবে না—মূরুক্ষুরাই করবে।… (প্রকাশ থাক শ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী এই উপদেশ গ্রহণ করেন নাই) ১১৮ পৃ

ল্যাঙ্গা বাবা। ফয়জাবাদে যাইয়া আমি প্রথমেই এই মহাত্মাকে দর্শন করি। গুপ্তার ঘাট হইতে ১।। কি ২ মাইল অন্তরে, সরযুর পারে, জনমানব শূন্য সুবিস্তীর্ণ ময়দানের মধ্যে ইনি থাকেন। রাশীকৃত মাটি পাহাড়ের মত স্তূপীকৃত করিয়া দোলমঞ্চের ন্যায় ৩টি থাক করিয়াছেন। সর্ব্বোচ্চ থাক সমতল ভূমি হইতে প্রায় ৫০ ফুট উচ্চ হইবে। তাহার উপরে মুক্ত আকাশের নীচে ল্যাঙ্গা বাবার আসন। এই স্থান হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত গাছপালার কোন সম্পর্ক নাই।…গুপ্তারঘাট বা ক্যান্টনমেন্টের নিকট হইতে ঐ দিকে তাকাইলে মোটা থামের উপরে বাবাজীকে একটি পক্ষীর ন্যায় দেখা যায়। উহার প্রায় দুই

দিকই সরযূ নদী…একটি সরু খাল সরযুর এক দিক হইতে আসিয়া, ল্যাঙ্গা বাবার আসন স্থান বেষ্টন পূর্ব্বক অপর দিকে গিয়া আবার সরযুতেই মিশিয়াছে। উহাতে জল খুব অল্প থাকে। শুনিলাম—একবার এই খালের স্রোত বৃদ্ধি হওয়ায়, উহা প্রশস্ত হইয়া ক্রমে ল্যাঙ্গাবাবার আসন স্থানের নিকটবর্ত্তী হয়। তখন বাবাজী বারংবার খালটিকে বলিলেন—মাঘি ইধার মৎ আও। কিন্তু খালটি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরে বাবাজী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, হাঁ-য্যাসা? বন্ধ হো যাও! সেই হইতেই নাকি খালটি একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সহরের লোকে সকলেই বলে বাবাজী সিদ্ধপুরুষ তাঁহার বাক্যেই খালের ঐ দশা ঘটিয়াছে।…১৫১ পৃ

বাবাজী যে ময়দানে থাকেন, ফয়জাবাদের ক্যাণ্টনমেণ্ট তাহারই এক পাশে। বিস্তৃত প্রকাণ্ড মাঠ বলিয়া, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গোলন্দাজ সেনাদের গোলাবাজী সেই মাঠেই হইয়া থাকে। গোলাগুলি ছুঁড়িবার পূর্ব্বে ময়দানের সমীপবর্ত্তী গ্রাম সমূহে নোটিশ দেওয়া হয়। দুচার দিনের জন্য তখন সকলকেই অন্যত্র সরিয়া যাইতে হয়। একবার এইরূপ গোলাবাড়ীর পূর্ব্বে নোটিশ পড়িল। সকলে বাড়ীঘর ছাড়িয়া অন্যত্র গেল, কিন্তু ল্যাঙ্গা বাবা আসন ছাড়িলেন না। সরকারী তরফ হইতে তাঁহাকে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে পুনঃ পুনঃ বলা হইল। বাবাজী বলিলেন, বাচ্চালোক খেল কর। আসন হামারা সিদ্ধ হ্যায়, ছোড়্নে নেহি সেকতে। কুছ হোগা নেহি তুম সব খেলা কর। শুনিলাম অতঃপর সরকার হইতে অনেক ভয়ও প্রদর্শন করা হইল, হইল, কিন্তু বাবাজী আসন ছাড়িলেন না। পরে হুকুম হইল—নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাবাজী না সরিলে তাঁহার মৃত্যুর জন্য সরকার দায়ী হইবেন না। যথাকালে গোলাগুলি ছোঁড়া আরম্ভ হইল। সমগ্র ময়দানটা অগ্নিময় হইয়া গেল, বাবাজী আপন আসনে ধুনী জ্বলিয়া বসিয়া রহিলেন। করনেল ক্রলী কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর দূরবীক্ষণ দ্বারা এক একবার দেখিতে লাগিলেন বাবাজী জীবিত আছেন কিনা। অসংখ্য গোলাগুলি ছোঁড়া হইতে লাগিল, এদিকে বাবাজী শুধু নিজের বামহস্ত ঢালের মত সম্মুখে ধরিয়া রহিলেন। গোলাগুলি সমস্ত বাবাজীর দক্ষিণে বামে ও মস্তকের উপর দিয়া অবিশ্রান্ত চলিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু বাবাজীর কিছুতেই কিছু হইল না। ইহা দেখিয়া করনেল ক্রলী স্তম্ভিত হইলেন। পরে সব শেষ

হইয়া গেলে, তিনি বাবাজীর নিকটে আসিয়া সসম্ভ্রম পুনঃ পুনঃ সেলাম করিয়া বলিলেন, বাবা অলৌকিক শক্তির পরিচয় আজ তুমি যাহা দেখাইলে এ জীবনে তাহা আমি ভুলিব না। আমি যতবার লক্ষ্য করিয়াছি ততবারই তোমাকে একই অবস্থায় স্থির থাকিতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। শুনিলাম, অলৌকিক ঘটনা সরকারের যে পুস্তকে লেখা থাকে তন্মধ্যে এই ঘটনাগুলি সাহেব লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ১৫১-১৫২ পৃ

ঠাকুর (আচার্য্য শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ) বলিতে লাগিলেন, কিছুদিন হলো একটি ভাল সন্ন্যাসী এই পথে চন্দ্রনাথ যাচ্ছিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় মুন্সিগঞ্জে পৌছে একটি ব্রাহ্মণের বাড়ী আশ্রয় নেন। ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধা ভক্তি ক'রে নিজে ঠাকুর ঘরের বারান্দায় তাঁকে থাকবার স্থান করে দিলেন। সন্ন্যাসী স্বপাকে রান্না করে, ভোজনান্তে বিশ্রাম করলেন। ব্রাহ্মণ বাড়ী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি সেই ঠাকুরকে খুব ভক্তি করতেন, অনেক সোনার গয়না দিয়ে সাজায়ে রাখতেন। সন্ন্যাসী সন্ধ্যা-আরতির সময় সে সকল দেখে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। শেষ রাত্রিতে তিনি সেই সকল গয়না ঠাকুরের অঙ্গ হতে খুলে নিয়ে চম্পট দিলেন। সকালে ব্রাহ্মণ উঠে দেখলেন সন্ন্যাসী নেই। ভাবলেন উদাসীন সন্ন্যাসী ওদের ত কোন লৌকিকতা নাই ইচ্ছা হয়েছে চলে গিয়েছেন। ব্রাহ্মণ স্নানান্তে ঠাকুর পূজা করতে ঠাকুর ঘরে যেমনি প্রবেশ করলেন, দেখলেন ঠাকুরের গায়ে গয়না নাই।...এদিকে সন্ন্যাসী গয়না নিয়ে শেষরাত্রি উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে দৌড়িতে বেলা অপরাহ্নে একটি স্থানে বৃক্ষতলে বিশ্রামর্থে বসলেন... হঠাৎ তাঁর মনে হল, ভাল একি করলাম...তৎক্ষণাৎ আর বিলম্ব না করে আবার সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীর দিকে দৌড়িতে লাগিলেন...সন্ন্যাসী তথায় পৌছিবা-মাত্রই সকলে নানাপ্রকার গালি গালাজ করতে লাগলেন...সন্ন্যাসী গয়নার পুটলি সম্মুখে রেখে বললেন,...পাড়ার দশটি ভদ্রলোককে এখানে ডেকে নিয়ে আসুন, আমার কিছু বলবার আছে সকলের সাক্ষাতেই গয়না দিব। ব্রাহ্মণ তাই করলেন, সন্ন্যাসী সকলকে বললেন, ছেলে বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করি, এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত আমি দেশে দেশে পর্য্যটন করে কাটাচ্ছি, এরূপ দুর্ম্মতি ত আর কখনও হয় নাই। এতকাল ভজন সাধন করে, যা কিছু আমি লাভ করেছিলাম আপনার গৃহে একবেলা মাত্র অন্ন গ্রহণ করে, আমার সে সমস্ত

নষ্ট হয়ে গেছে। আমি জীবনে কখনও কারো এক কপর্দ্দক চুরি করি নাই। আপনার অন্ন গ্রহণের পর অকস্মাৎ আমার এই দুর্ম্মতি হল কেন? ভাল! জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমাকে যা রান্না করতে দিয়েছিলেন, তাতে কি চোরের কোন প্রকার সংস্রব ছিল?.. ব্রাহ্মণ বললেন...শ্রাদ্ধ করিয়ে পেয়েছিলাম তাই আপনাকে দেওয়া হয়েছিল। সন্ন্যাসী চমকে উঠে বললেন, শ্রাদ্ধার দিয়েছিলেন, যার শ্রাদ্ধ করেছিলেন সে কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিল? তখন গ্রামের সকল ভদ্রলোকই বললেন,...অমন ভয়ানক চোর আর এদেশে জন্মেছে ব'লে আমরা কখনও শুনি নাই—এদেশের লোক তার নামে কাঁপত সে কয়েকবার জেলও খেটে ছিল। সাধু বললেন, দেখুন সেই চোরের শ্রাদ্ধের অন্ন গ্রহণেই আমার এই সর্ব্বনাশ। এই আপনাদের গয়না নিন্ এখন আমার আর চন্দ্রনাথ যাওয়া হবে না, আমার সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে। ১০৬-১০৭ পৃ

ঠাকুর :...আমার একটি ব্রাহ্ম বন্ধু বিলাত ফেরৎ ডাক্তার, সেই সময় গয়ায় গিয়েছিলেন। তাঁর পরলোকগত পিতা তাঁকে একদিন স্বপ্ন দিলেন, বাপু যদি গয়ায় এসেছ, আমাকে একটা পিণ্ড দাও, আমি বড়ই কষ্ট পেতেছি। তিনি ব্রাহ্ম, ও সব কিছু বিশ্বাস করেন না তাই উড়িয়ে দিলেন, পরদিন রাত্রিতে আবার স্বপ্ন দেখলেন, পিতা অত্যন্ত কাতর ভাবে বলছেন, বাবা তোমায় কল্যাণ হবে, আমাকে একটি পিণ্ড দাও। দুবার স্বপ্ন দেখেও তিনি তা গ্রাহ্য করলেন না, আমাকে এ বিষয় এসে বললেন, আমি তাঁকে বল্লাম, পুনঃ পুনঃ যখন এরূপ দেখছেন, তখন পিণ্ড দেওয়াই উচিত। তিনি আমার উপর বিরক্ত হয়ে বললেন, আপনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মপ্রচারক হয়ে এরূপ কুসংস্কার বিশ্বাস করেন? আমি তাঁকে বললাম, আপনি ত আপনার বিশ্বাস মত দিবেন না, আপনার পিতার বিশ্বাস দিবেন...। তিনি সম্মত হলেন না। পরে আর একদিন শুয়ে আছেন ...দেখলেন পিতা জোড় হাত করে বলছেন...শুনে আমার (ঠাকুর) কান্না পেল আমি তখন বললাম, আপনি নিজে না দেন প্রতিনিধি দ্বারাও ত দেওয়াইতে পারেন। তিনি চুপ ক'রে রইলেন। আমি দুটি টাকা নিয়ে একটি পাণ্ডাকে ওঁর প্রতিনিধি হয়ে পিণ্ড দিতে ব্যবস্থা করে দিলাম। ১১১ পৃ

ঠাকুর মা, আপনি নাকি আঁতুড় ঘরে ঠাকুরকে বিষ খাওয়াইয়া ছিলেন? ঠাকুর মা, রাম রাম তোরা কি বলছিকিনি! তা কি আবার কেউ করে।

ছেলের ঠাণ্ডা লেগেছিল। মুসব্বর যে লাগাতে হয় তাত আমি জানি না, আমি মুসব্বর ভেবে, দু আনা আন্দাজ আফিম গুলে খাইয়েছিলাম, কালো হয়ে গিয়েছিল, তাতে আর ছেলের কি হলো? ভগবানই দয়া করে রক্ষা করলেন। ২২৭ পৃ

আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাধারমণ বাবুর পুত্র, পাঁচ সাত বৎসরের বালক, আধপাগলাটে ওরা পণ্ডিত, ধূলা গায়ে নেংটাবস্থায় দৌড়িয়া আসিয়া তাহাদের বাড়ীর একটি গরুকে ধরিল। ঐ গরুটিকে লইয়া পণ্ডিত, ঠাকুরের বারো চোদ্দ হাত অন্তরে পুকুরের ধারে একটি চারা গাছের সহিত লম্বা দড়িতে বান্ধিয়া রাখিয়া ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিল, গোসাই, গরু রইলো, দেখো, যেন ছোটে না, আমি আসি। ঠাকুর ঐ সময়ে পাশ ফিরিয়া গরুর দিকে মুখ করিয়া বসিলেন।···বেলা প্রায় দুইটা হইতে সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত ওরা পণ্ডিতের আর দেখা নেই। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আশ্রমের ভিতর দিয়া ওরা পণ্ডিত যাইতেছে জানিতে পারিয়া ঠাকুর তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, পণ্ডিত এখন তোমার গরুটি নেবে? আমি যে সেই থেকে তোমার গরুটি দেখছি। পণ্ডিত দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল, ও গরুটা এখানেই আছে বেশ নিয়ে যাই! ২৯৪ পৃ

(কলিকাতা মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রিট) আমাদের বাসাটি ছোট হওয়াতে দিন দিন বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে।...রান্না খাওয়া ও হোমাদি কার্য্যের বড় অসুবিধা প্রত্যহ ভুগিতেছি। উপরের ঘরের সম্মুখের বারান্দায় আমি নিত্য হোম করি।...কাঁচা কাঠের ধোঁয়াতে সকলেরই প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। গুরুভ্রাতারা আমাকে এখানে হোম করা বন্ধ করিতে অনেক বার বলিয়াছেন। কিন্তু আমি কাহারও কথা গ্রাহ্য করি নাই।···আজ ভিজা কাষ্ঠ অনেক কষ্টে জ্বালাইয়া যেমন তাহাতে কয়েকটি মাত্র আহুতি দিয়াছি—অতিরিক্ত ধূঁয়াতে অস্থির হইয়া আমাদেরই একজন, তার ছেলেটিকে কোলে লইয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন, তুমি কি রকম লোক সকলকে মেরে ফেলবে নাকি? রেখে দাও তোমার হোম! আমি···খুব তেজের সঙ্গে বলিলাম বটে...ছেলেটা যখন টা টা করে চীৎকার করে আর সকলকে জ্বালাতন করে তোলে তখন ত ছেলেটার মুখ চেপে ধরতে পার না...তোমাদের জ্বালা

হয় বলে আমি নিত্যকর্ম্ম করবো না? ব্যঃ! সেই মুহূর্ত্তেই ঠাকুর বলিলেন, কে আছ ওখানে, এক্ষণই আগুনে জল ঢেলে দাও। এ কি রকম! একটা সাধারণ কর্ত্তব্য বুদ্ধি নাই! ১৬৬ পৃ

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ। (১২৯৮ সাল)

ঠাকুর—যাদের হিংসা নেই তাদের কেহই হিংসা করে না…।…কিছু দিন পূর্ব্বে এখানকার হাতী খেদায় এণ্ডারসন সাহেব হাতীতে চড়িয়া জয়দেবপুরের জঙ্গলে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সাহেব বিপদে পড়িলেন, হাতীটি বাঘের গন্ধ পাইয়া সাহেবকে হাওদা হইতে ফেলিয়া পলাইল। সাহেব বাঘটিকে লক্ষ্য করিয়া দুই তিনবার বন্দুক ছুড়িলেন কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হইল। বাঘটা সাহেবের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। …সাহেব কিছুক্ষণ ছোটাছুটির পর হয়রান অবস্থায় জঙ্গলের ঝোপে একটি উলঙ্গ সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহারই নিকট গিয়া পড়িলেন, সন্ন্যাসী সাহেবকে স্থির হইয়া বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, (বাঘটি তখন নিকটে) তুমি এত ব্যস্ত হইয়াছ কেন? সাহেব—বাঘ যে আমাকে ধরে ফেলবে। তখন সন্ন্যাসী বাঘটিকে হাত নাড়িয়া অগ্রসর হইতে নিবারণ করিয়া বলিলেন, বৈঠ বাচ্ছা আউর নগিজ মত আও। সন্ন্যাসী—বাঘকে (লক্ষ্য করে) তুমি গুলি ছুড়লে কেন? তুমি কি বাঘ খাও। সাহেব—না…বনের বাঘকে আপনি কি উপায় বশ করিলেন আমাকে দয়া করিয়া বলুন। ১২৬ পৃ

(ঠাকুর সোজা গোয়ালন্দ হইতে শান্তিপুর আসিলেন) ঠাকুরের বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ঠাকুরমা সেখানেই যেন ঠাকুরেরই জন্ম অপেক্ষা করিতেছেন। ঠাকুর সাষ্টাঙ্গ হইয়া ঠাকুরমার চরণে প্রণাম করিলেন। ঠাকুরের চোখে জল আসিল। ঠাকুরমা বলিলেন, তুই এখন এলি যে? ঠাকুর বলিলেন মা তুমি যে আমাকে বিজয় বিজয় বলে ডেকে ছিলে—তা আমি শুনেছিলাম। ঠাকুরমার শরীরে প্রহারের চিহ্ন সমস্ত দেখিয়া আমরা অবাক হইলাম। কিন্তু তিনি কিছুমাত্র কাহারও বিরুদ্ধে ঠাকুরকে একটি কথা বলিলেন না,… উন্মাদের অবস্থায় যাঁহাদের উপরে ঠাকুরমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল তাহাদের মধ্যে কোনও ব্যক্তি তাঁহাকে সামলাইতে না পারিয়া এমন দারুণ প্রহার

করিয়াছিল, যে ঠাকুরমা দুই তিনবার বিজয় বিজয় চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঠাকুরমার ঐ চীৎকার শুনিয়াই ঠাকুর শান্তিপুরে আসিবার জন্য অস্থির হইয়াছিলেন। ১২৯ পৃ

বহুকাল পূর্ব্বে বাল্যাবস্থায় এই শান্তিপুরে একটি মহাত্মাকে দেখেছি, সকলে তাঁকে শ্যামাক্ষেপা বলে ডাকত। শ্যামাক্ষেপা কোন সম্প্রদায়ের সাধু ছিলেন তা তাঁর চাল চলনে বোঝবার যো ছিল না। একস্থানে তিনি কখনও থাকতেন না। প্রায় নিয়তই রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে পাগলের মত ঘুরে বেড়াতেন। আহারের জন্য ঠাকুরের ভোগ সারবার সময় বুঝে, অকস্মাৎ শ্যামাক্ষেপা কোনও বাড়ী যেয়ে উপস্থিত হতেন। অনেক সময়ে মেয়েদের অসাবধানতাবশতঃ ভোগ রান্না সময়ে কোনও প্রকার অনাচার হয়ে পড়লে, প্রসাদ না পেয়েই শ্যামাক্ষেপা উঠে পড়তেন এবং গাল দিয়ে বলে যেতেন, আরে ভোগে এই গন্ধ পাচ্ছি রান্নার সময় রঁাধুনি এই করেছিল, এই হয়ে-ছিল...। অনুসন্ধান করে দেখা যেত, তা যথার্থ। মেয়েছেলেরা লজ্জায় মরে যেত।··· ১৪১ পৃ

ঠাকুর নিজের বাড়ীর শ্যামসুন্দরের কথা বলিতে লাগিলেন।...একবার শ্যামসুন্দর আমাকে এসে বলিলেন, ওরে আমি সোনার চূড়ো পরবো। আমাকে একটি চূড়ো গড়িয়ে দে না। আমি বললাম, আমি তোমাকে বিশ্বাস টিশ্বাস করি না, যারা করে তাদের গিয়ে বল, আমি টাকা পাব কোথায়? শ্যামসুন্দর বললেন, দেখ তোর খুড়িমাকে বলগে, তার ঝঁাপির ভিতরে টাকা আছে তা নিয়ে নে-না। পরে খুড়িমাকে এ বিষয় বলতে, খুড়িমাও বললেন, ওরে কাল শ্যামসুন্দর এসে আমাকে স্বপ্নে বল্‌লেন, ওগো আমাকে চূড়ো গড়িয়ে দেনা। আমি বললাম, আমি টাকা কোথায় পাব? আমার তো কিছুই নাই? শ্যামসুন্দর বললেন, ওগো ৪০/৫০টি টাকা কি তুই আর দিতে পারিস না দেখনা না পারিস তো বিজয়কে বলগে, সে দেবে। খুড়িমা এই বলে কঁাদতে লাগলেন, আর বললেন, ৬৭টি টাকা আমি অতি গোপনে রেখেছিলেম, তা কেউ জানে না। ঐ টাকা খুড়িমা দিয়েছিলেন আমি সেই টাকা দিয়ে ঢাকা হতে সোণার চূড়ো গড়িয়ে দিই। আজ শ্যামসুন্দর সেই চূড়ো পরেছেন, সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে আমি যখন এই ছাদের উপর গিয়েছিলাম

তখন শ্যামসুন্দর উঁকি মেরে দেখে বললেন, ওরে একবার দেখে যা না, চূড়ো পরে আমি কেমন সেজেছি। আমি বললাম, আমি আর কি দেখবো আমি ত তোমাকে মানি না। শ্যামসুন্দর বললেন, তাতে আর কি? নাই বা মানলি। একবার দেখতেও কি দোষ। পরে আমি শ্যামসুন্দরের কাছে যেয়ে তাঁর স্নেহমাখা স্নিগ্ধ দৃষ্টি, উজ্জ্বল রূপের ছটা দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে পড়লাম। শ্যামসুন্দর একটু হেসে বললেন, একি তুই না আমাকে বিশ্বাস করিস না! আমি বললাম, ঠাকুর আমার উপর তোমার এতই যদি দয়া তবে আর এতকাল এত ঘুরালে কেন? ১৪৪ পৃ

প্রচারক (ব্রাহ্মধর্ম্ম) অবস্থায় সময় সময় মাঠাকুরাণীকে দেখতে আমি বাড়ী আসতাম। একবার এই ঘরে মধ্যাহ্নে বসে আছি, শ্যামসুন্দর এসে বললেন, দ্যাখ আজ আমাকে খাবার দিয়েছে, আর জল দেয় নাই। আমি খুড়িমাকে ডেকে বললাম, খুড়িমা, তোমাদের শ্যামসুন্দর বলছেন, আজ তোমরা তাঁকে জল দাও নাই। খুড়িমা আমাকে বললেন, হাঁ শ্যামসুন্দর তো আর লোক পেলে না, তুই ব্রহ্মজ্ঞানী কিনা, তাই তোকে গিয়ে বল্‌ছেন জল দেয় নাই। আমি বললাম, আচ্ছা অনুসন্ধান করে দেখ না। খুড়িমা অমনি অনুসন্ধানে জানলেন, যথার্থই জল দেওয়া হয় নাই। ১৪৫ পৃ

ঠাকুর—ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশের কিছুকাল পরে, সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজীকে দর্শন করতে নবদ্বীপে গিয়েছিলাম।...আমি বাবাজীর নিকট কিছু সময় বসে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, বাবাজী ভক্তি কিসে হয়? বাবাজী আমার প্রশ্ন শুনে, কোন উত্তর না দিয়ে, একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে থেকে থর থর কাঁপতে লাগলেন। বাবাজীর সমস্ত শরীরটি পুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চিত হতে লাগল, মস্তকের শিখাটি খাড়া হয়ে উঠলো। বাবাজী অস্ফুটস্বরে একটি গভীর হুঙ্কার করে বললেন, কি বল্লে গোঁসাই! তুমি বল্লে ভক্তি কিসে হয়! তুমি বল্লে ভক্তি কিসে হয়। এঁ তুমি বল্লে ভক্তি কিসে হয়! এই বলেই সমাধিস্থ হলেন। তিন ঘণ্টা কাল বাবাজীর সংজ্ঞা ছিল না,...সমাধিভঙ্গের পর বাবাজী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে, কর-যোড়ে বললেন,...ভক্তি তো আপনারই ভাণ্ডারের জিনিষ আমার অদ্বৈতের ভাণ্ডারে কি আর ভক্তির অভাব আছে। বাবাজীর কথা শুনে চলে এলাম। ১৫৫ পৃ

(শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী অদ্বৈতপ্রভুর বংশীয়)

একজন বলিলেন, একটা বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসংশয় হইলে তাহা করিতে যেমন উৎসাহ হয়, না বুঝিয়া করিলে সে প্রকার তো হয় না। ঠাকুর বলিলেন, ঐ সকল পাশ্চাত্যভাব। আগে বুঝবো পরে করবো। এ আমাদের দেশের বা সনাতন ধর্ম্মের ভাব নয়। আমাদের শাস্ত্র কর্ত্তাদের উপদেশ, আগে কর পরে বুঝ। সকল বিষয়েই কতকগুলি স্বীকার্য্য আছে, তা মেনে নিতেই হয়। যেমন 'ক' এরপর 'খ', খ এরপর 'গ' পড়তে হয়।···প্রশ্ন করলে—শিক্ষা কখনও হয় না। ১৭৯ পৃ

বেলা দুটার পর তের চৌদ্দজন গুরুভ্রাতা ঠাকুরের সঙ্গে চলিলাম, প্রায় তিনটার সময় আমরা পার্ক ষ্ট্রীটে মহর্ষি ভবনে পঁহুছিলাম। দেখিলাম, মহর্ষির জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্মুখের হল ঘরে রহিয়াছেন। আমাদিগকে দেখিয়াই খুব আদর করিয়া ঘরের ভিতরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। ···আট দশ মিনিট কাল নীচের ঘরেই আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইল। ·· ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমরা সকলে যাইয়া মহর্ষির নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম প্রকাণ্ড হল ঘরের মধ্যেস্থলে একখানা ইজি-চেয়ারে মহর্ষি অর্দ্ধ-শয়ান অবস্থান রহিয়াছেন। দক্ষিণে ও বামে দুখানা চেয়ার রহিয়াছে এবং তাহারই নিকটে দুখানা লম্বা বেঞ্চি এমনভাবে রাখা হইয়াছে যে, তাহাতে বসিয়া সকলেই মহর্ষিকে দর্শন করিতে পারেন। ঠাকুর বেঞ্চির মধ্যস্থলে যাইয়া নমস্কার করিয়া মহর্ষির চরণদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় পবিত্রমূর্ত্তি বৃদ্ধ মহর্ষি শুভ্র মুখমণ্ডল রক্তিম হইয়া উঠিল, তিনি করপুট বক্ষঃস্থলে স্থাপন পূর্ব্বক মস্তক ঘন ঘন কম্পিত করিয়া গদগদ স্বরে, নমো ব্রাহ্মণ্যদেবায়, গো ব্রহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ, গোবিন্দায় নমোনমঃ গোবিন্দায় নমোনমঃ। পুনঃপুনঃ বলিতে বলিতে শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন গণ্ডস্থল ভাসিয়া তাঁহার অশ্রুধারা বর্ষণ হইতে লাগিল।

(শ্যামবাজারে যখন শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ ছিলেন)...গুরুভগ্নীদের দ্বারা এতকাল সুচারুরূপে পাক-কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছিল। পরে পাগলী ঠাকুর-মা আসা অবধি সব উলট পালট হইয়া গিয়ছে। তিনি আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে রান্না ঘরে ঢুকিলেন। গুরুভগ্নীদের রান্না কার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া বলিলেন,

আরে একি ? তোরা এখানে কেন। গোঁসাই বাড়ীর রান্নাঘরে শূদ্র ! তোরা তো এঁটো মুক্ত করবি, আর বাসন মাজবি। যতদিন বিজয়ের একটা বিয়ে না দিব, রান্না আমিই করবো ! তোরা এ ঘর থেকে বের হ। ঠাকুরমা এই বলিয়া উহাদের কুটনা—বাটনা সমস্ত ফেলিয়া দিলেন এবং নিজহাতে খোসা সহিতে তরকারী কুটিয়া আধসিদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ডালও ঐ প্রকার রাঁধিলেন, আধোয়া চাউল ফুটাইয়া পিণ্ড করিলেন। প্রথম দিন সকলেই ঠাকুরমার রান্না দেখিয়া খুব আমোদ করিয়া খাইলেন।...একদিন চন্দ্রমণিদিদি, ভাল চাউল ধুইয়া রাখিতেই ঠাকুরমা তাহাকে ঝাঁটা মারিয়া বলিলেন, ঠাকুরের ভোগের জিনিস শূদ্র হয়ে ছুঁইলি, বড়ই আস্পর্দ্ধা দেখছি।—ঠাকুর মার রান্না খেয়ে টেঁকা সকলের শক্ত হইয়া উঠিল। একদিন সকলেরই পাতে ডাল ভাত তরকারী পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া ঠাকুর মা ছুটিয়া ছেলের নিকট যাইয়া বলিলেন, ওরে বিজয় বল দিকিনি কেমন রেন্ধেছি ? ঠাকুর অমনি এক মুখ হাসিয়া বলিলেন, কেন মা ! তা কি আর জিজ্ঞাসা কর্ত্তে হয়। ঠিক যেন জগন্নাথের ভোগ—ওরা সব খাচ্ছেন কেমন ? ঠাকুরমা বলিলেন, ওরা খাবে কি ? ওদের কি ভক্তি আছে, আমরা হলাম শান্তিপুরের গোঁসাই, আমাদের হাতে দেবতারা খান ! বুঝলে ! আমরা বাপু তেল ঘিও দেই না, আর বাটনা কুটনার ধারও ধারি না—যা তা সাদা জলে সিদ্ধ করে দি, ছাখ দিকিনি তারই স্বাদ কত ! ২২৩ পৃ

ভোরের কীর্ত্তন শেষ হইলেই গঙ্গাস্নান যাওয়ার সময় ঠাকুরমা একেবারে ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান। ঠাকুর নিবিষ্টভাবে চোখ বুজিয়া থাকিলেও, ঠাকুরমা, ঠাকুরকে খুব স্নেহের সহিত ডাকিয়া বলেন, ওরে বিজয়—নে প্রণাম কর। এখন ওঠ না ভোর হয়েছে দেখ্‌চিস না ? ঠাকুর অমনি ঠাকুরমাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি মাথায় নেন। ২২৫ পৃ

ঠাকুরমা বলিলেন,···সাধারণ লোকের জন্ম যেভাবে হয়, ওর জন্ম তো আর সেভাবে হয় নাই। তা বললে, বিশ্বাস কর্ত্তে পারবি কেন ? সে সময় ওর বাবা ব্রহ্মচর্য্য করতেন, শান্তিপুর হতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে করতে শ্রীক্ষেত্রে গিয়েছিলেন, কত ক'রে। বুকেতে, হাতেতে হাঁটুতে ছালা বেঁধে। ও রকম এখন কেউ করুক দিকিনি। তিনি জগন্নাথের দর্শনের পেয়ে যা প্রার্থনা

করলেন তাই হ'লো। ভক্তের আকাঙ্ক্ষা তো ভগবান অপূর্ণ রাখেন না। বিজয় যখন আমার পেটে ছিল, উদয়াস্ত সূর্য্যের প্রতি রশ্মিতে আমি রাধাকৃষ্ণ দর্শন পেতাম। ২২৬ পৃ

ঠাকুরমা কখন কখন আমাদিগকে পরিহাস করিয়া বলেন, যাঃ তোরা তো কচু বুনের শিষ্য! একটি গুরুভাই জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুরমা আপনি কি আর স্থান পেয়েছিলেন না, ছেলে হলো কচু বনে? ঠাকুরমা বলিলেন, আরে! তখন যে শীকারপুরের বাড়ী বরকন্দাজ এসে ঘেরাও করলে, বাড়ী ছেড়ে সকলে পালাল, ঝড় বৃষ্টি তুফান যাব কোথায়? আমি গিয়ে বাড়ীর ধারে কচু বনে বসলাম। কতক্ষণ পরে দেখি বিজয় হয়েছে। প্রসব বেদনা তো হয় নাই, আগে বুঝবো কি করে। তাই তো ওকে সকলে কচুবুনে বলে...। ২২৬ পৃ

শ্রীশ্রীনিগমানন্দের জীবন ও বাণী। সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী ও শ্রীমৎ সিদ্ধানন্দ সরস্বতী।

– সেই নারায়ণপুর থাকতে থাকতেই মাদ্রাজে যাই। সেখানে অ্যাডায়ারের থিওজফিকাল সোসাইটিতে যোগ দিয়ে পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর গবেষণায় প্রবৃত্ত হই।...ওখানে থাকতে প্লানচেট টেলানচেট সব করেছি, তিন পায়া টেবিল দিয়ে– মিডিয়াম দিয়ে আত্মা আনিয়েছি। তাদের যতকিছু বিদ্যা অল্প দিনের মধ্যে শিখে নিলাম।...তারা তো দেখে অবাক! আমি go to sleep বলে তাদের নেতাকেই মুহূর্তের মাঝে hypnotise করে ফেলতাম, কিন্তু সে আমাকে কোন দিন পারেনি। ৭ পৃ

(আজমীরে) তখন আমার দেহের দিকে একেবারেই নজর ছিল না। চুলগুলো জটা ধরে গিয়েছিল......আমায় দেখলে লোকে পাগল মনে করত। ওখানে এসে একদিন জলাশয়ে স্নান করছি, এমন সময় এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমায় দেখে তার বাড়ীতে ডাকল। প্রবাসে বাঙ্গালীরা, স্বদেশের লোককে দেখলে খুব আনন্দিত হয়। আমি তার বাড়ী গেলাম, আমার চেহারা দেখে সে তিরস্কার করে বললে, বাঙ্গালী এমন কদর্য্য থাকে নাকি? সাধু হলে কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে নেই। ১৫ পৃ

ঘোড়ার ঘাস কাটতে হত, ঘাসের মধ্যে বড় বড় জোঁক থাকত। আমি

জোঁককে বড় ভয় করতাম। জোঁকের ভয়ে ঘাস কাটার নাম শুনলেই আমি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তাম। শেষকালে একদিন ভাবলাম জোঁকের ভয়ে তো আমার গুরুসেবা ঠিক ঠিক হচ্ছে না! আচ্ছা আজ দেখব জোঁক কেমন?...এই বলে ঘাস কাটতে গিয়ে সেদিন ইচ্ছা করে গায়ের উপর ১০/১২টা জোঁক বসিয়ে দিলাম, আর জোরসে হাত দিয়ে রগড়াতে লাগলাম। এই রকম করে সেদিন থেকে আমার জোঁকের ভয় গেল। তার পরদিন নির্ভয়চিত্তে ঘাস কাটতে যাচ্ছি, ঠাকুর বললেন, আর তোকে ঘাস কাটতে হবে না! ১৯ পৃ

আশ্রমে একটি নারায়ণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই মূর্ত্তির পূজার ভার পড়ল আমার উপর। আমি তখন (ব্রহ্মজ্ঞানী) কাজেই মূর্ত্তির প্রতি তেমন বিশ্বাস ছিল না। যেমন তেমন করে ফুল ছিটিয়ে পূজা করতাম। ঠাকুর একদিন আমায় ঐ ভাবে পূজা করতে দেখে আমায় খুব গাল পাড়লেন; বললেন, যেমন তেমন করে দেবতার পূজা করিস। আমি বললাম, ও আবার দেবতা কি? ও তো একটা ধাতুমূর্ত্তি। ওর তো প্রাণ নাই! এই কথা শুনে তিনি রেগে গিয়ে আর বেশী করে গাল দিতে লাগলেন। পরে ঠাকুর চলে গেলে পর আমি ঠাকুরটি (মূর্ত্তি) বার করে এনে তিন চড় কসে দিলাম, বললাম—তোমার জন্যেই তো আজ ঠাকুরের কাছে এত বকুনি খেতে হল। ঠাকুর কোথায় ছিলেন কি জানি, সব দেখতে শুনতে পেয়ে কাছে এসে হেসে হেসে বললেন, তবে না বলছিলি আমার ঠাকুরের প্রাণ নেই? প্রাণ নেই ত কথা বলছিলি কার সঙ্গে? ১৯ পৃ

(জঙ্গলে, রাত্রে যে যুবতী তাঁকে আশ্রয় দেন—পরিচয় জানিলেন ইনি কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ কন্যা—যোগ সাধনা করেন—নিগমানন্দ সকালে তাঁহাকে গুরু করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন) সে বললে তা হবে না...তোমার নবীন বয়স কাল রাত্রে আমার নিকট থাকাতে তোমার মন এমন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তাহলে কি করে দীর্ঘ দিন আমার কাছে থেকে যোগ শিক্ষা করবে? তারপর আমারও তো একটা দেহধর্ম্ম আছে—যদিও আমার বয়স হয়েছে। আমার বয়স কত জান?...৬০ বৎসর!—তার বয়সের কথা শুনে আমি অবাক...তাকে অল্পবয়স্কা যুবতী বলেই মনে করেছিলাম! ২৮ পৃ

(ফিরে ফিরে দেখি মেয়েটি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে হঠাৎ স্টেশনের কাছে এসে ফিরে দেখি মেয়েটি আর নেই)

(মহাপুরুষ) ছেলের মত আদর যত্ন করে সব শিখিয়ে দিলেন। পরে একদিন আমায় বললেন, ওরে দেখ, এখন তুই যা যোগ সাধনা করগে। কেবল শাস্ত্র পাঠ আর উপদেশ শ্রবণ করলেই হবে না। সাধন করা চাই। আবার যোগসাধনা করতে হলে ঘি দুধ খেতে হবে,...তার জন্য অর্থ সাহায্য আর লোকালয় দরকার। তা না হ'লে হবে না। কচুসিদ্ধ খেয়ে আর যোগ হয় না বাবা! ৩৭ পৃ

কালীঘাটে এসে দেখলাম – ঠাকুর এক বারান্দায় বসে আছেন।...সেটা নকুলেশ্বর মন্দিরের বারান্দা! সেখানে ইতিমধ্যে একবার চুরি হয়ে গিয়েছে। তাই (পাহারাওয়ালা) আমাদের থাকায় আপত্তি জানিয়ে নানা রকম ভয় দেখাতে লাগল। ঠাকুর উঠে যেতে চাইলেন। আমি বললাম—বস আমরা ত এই রাত্রির মত আছি।...ওর যা ইচ্ছে হয় তাই করুক! এমন সময় একজন সার্জেণ্ট সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে দেখে পাহারাওয়ালা বললে, এ দুটো ভণ্ড চোর এখানে বসে গাঁজা খাচ্ছে এখান থেকে যেতে বলায় যাচ্ছে না। সে বললে, যায় না ত করবে কি! তুমি তবে সারারাত্রি বসে বসে ওদের পাহারা দাও! ৫৩ পৃ

...এক স্থানে এক নমঃশূদ্রের বাড়ীতে গেলাম, আমার ঠাকুর বললেন, আমি এর বাড়ীতে অনেকবার যাতয়াত করেছি। এর সাধুর প্রতি খুব শ্রদ্ধা ভক্তি আছে।...আমি বসলাম ঠাকুর স্নানে গেলেন। আমি (গৃহস্বামীকে)... নমঃশূদ্র বলে জানতে পারলাম। ঠাকুর এলে বললাম...ঠাকুর শুনে বললেন, আরে বলিস কি নমঃশূদ্র! আমি তো বামুন বলে জানতাম। তাহলে চল চল অন্য কোথাও যাই!...আমি বললাম, না বললে তো খেয়েই নিতে। আরও কতবার এসেছ, খেয়ে তো নিয়েছ, এবার আমি বলায় বুঝি জাত যাবার ভয় হল। ৫৬ পৃ

শ্রীনিগমানন্দ...কেউ কেউ এমন প্রশ্ন করে বসে সে প্রশ্নের বিষয় সম্বন্ধে হয়ত জ্ঞান...নাই।...মজার গল্প আছে জান, এক জামাই শ্বশুরবাড়ী গিয়েছে। কারও সঙ্গে কথাবার্ত্তাও বলতে জানে না। সন্ধ্যার পর শ্বশুর আলাপাদি

করার উদ্দেশ্যে জামাইয়ের নিকট এসে বসেছেন। জামাই শ্বশুরের সঙ্গে কি আলাপ করবে, কিছুই ঠিক করতে পারছে না। অনেক ভেবে চিন্তে সে শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করল—শ্বশুর মশাই আপনার কি বিয়ে হয়েছে ?

আগে লক্ষ্মীপূজা ক'রে ঐশ্বর্য্যশালী হত, এখন হচ্ছে ক্রমশঃ লক্ষ্মীছাড়া। পূজা হয় কোথায়। যে ব্রাহ্মণ দ্বারা তোমরা পূজা করাও, সেই ব্রাহ্মণ চার পয়সার দক্ষিণার লোভে বাড়ী বাড়ী দৌড়ে বেড়ায়...সে এনে দেবে তোমার ঐশ্বর্য্য। ৭১ পৃ

আমি যখন ধর্ম্মপিপাসু হয়ে সদগুরুর খোঁজ করছিলাম, তখন একদিন ঘুরতে ঘুরতে এক বাবাজীর কাছে গিয়ে পৌছি। শুনলাম, তিনি নাকি কিছুই খান না। অথচ তার চেহারা বেশ হৃষ্টপুষ্ট দেখে আমি আশ্চর্য্য হলাম।...আমি বললাম, হাম গুরু খুঁজনেকো ওয়াস্তে ঘুমতে হ্যায় হিঁয়াপর আপকে বড়িঁয়া সাধু সমঝে আপকা পাশ আয়া হ্যায়। এই কথা শুনে বাবাজী বললে, আচ্ছা বাচ্চা, তুইঁার যেতনা রোজ খুসী···হিঁয়া ঠার যা। আমি রইলাম। দিনে খুব লক্ষ্য করে দেখলাম কিছুই খায় না।...শেষে বেটা ধরা পড়ল। একদিন রাত্রিতে ঘুমিয়ে আছি, রাত্রি আড়াইটার সময় হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল—। বাঁশের বেড়ার আড়াল দিয়ে দেখি, তার চেলারা ভাল মিষ্টান্ন আর অন্যান্য খাবার জিনিষ...একথালা পূর্ণ করে এনে দিল। বেটা গপাপগ করে কয়েক গ্রাসেই তা খেয়ে ফেল্লে। ৯৭ পৃ

আমি যখন হালিসহরে থাকতাম, তখন বারাকপুরে এক বাবাজীকে দেখতে যাই। তার অনেক বৈষ্ণবী। বৈষ্ণবীদের মধ্যে অনেক বৃদ্ধা ও যুবতী আছে। একদল ভিক্ষা করে আনে, আর কেউবা তার সেবা করে।... দেখলাম মেয়েদের কোন একটা ত্রুটি দেখলেই ভীষণ প্রহার করে। আমি কিন্তু তাকে ঘৃণা করি নাই, কারণ তার মধ্যে কি আছে কে জানে ? গৃহস্থেরা অনেকে একজন মেয়েকে বশ করতে পারে না, আর সে বাবাজী হয়ে এতগুলো যুবতী আর বৃদ্ধা মেয়েকে বশ করে রেখেছে, তার উপর আবার মারছে, গাল দিচ্ছে তবু তাকে ছাড়ে নাই। ৯৯ পৃ

···দুজন বন্ধু, বাড়ী যশোর জেলায়···এক জনের নাম নদের চাঁদ। দুজন কামরূপে এসে শকুন্ত বিদ্যা শিখলে। শকুন্ত বিদ্যায় মানুষ যে কোন জন্তুর

রূপ ধারণ করতে পারে...নদের চাঁদ বাড়ীতে এসে তার স্ত্রীর কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বললে।...স্ত্রী বললে, জীবনে কোনদিন কুমীর দেখি নাই আমায় কুমীররূপ দেখাও না। (সে) কিন্তু কুমীর হলে আর মানুষ হওয়ার শক্তি থাকবে না...এই বলে এক কলসী জল...মন্ত্রপূত করে বললে, যখন কুমীর দেখার সাধ মিটে যাবে তখন এই জল পড়াটা আমার সর্বাঙ্গে ঢেলে দিও...দৈবক্রমে যদি জলপড়া নষ্ট হয়ে যায়, তবে অমুক গাঁয়ে আমার বন্ধু আছে তাকে খবর দিলে সে এসে ব্যবস্থা করবে। —নদের চাঁদ কুমীরের রূপ ধরে তার স্ত্রীর কাছে এগিয়ে এল—(স্ত্রী) ভয়ে অস্থির—হঠাৎ তার পায়ে লেগে কলসীর সমস্ত জল গেল পড়ে।—মানুষ হবার আর কোন উপায় নাই দেখে লোকভয়ে সূর্যোদয়ের পূর্ব্বেই সে নিকটবর্তী মধুমতী নদীতে নেমে গেল।—স্ত্রী বুঝতে পারলে কি সর্বনাশ করেছে সে!—সে তাড়াতাড়ি তার স্বামীর বন্ধুকে আনবার জন্যে লোক পাঠালে। বন্ধু বাড়ীতে ছিল না। তাই বন্ধুর আসতে ৪/৫ দিন কেটে গেল। বন্ধু এসে সব শুনে বললে, আর উপায় নাই। এ বিদ্যার নিয়ম হচ্ছে জন্তুর রূপ ধরে যে পর্য্যন্ত সেই জন্তুর খাদ্য গ্রহণ না করে সে পর্য্যন্তই তাকে মানুষ করা যায়। ১৩০ পৃ

...শিষ্যের মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত গুরুরও নিষ্কৃতি নেই। এ সম্বন্ধে একটা সুন্দর গল্প আছে। (এক গুরুর এক শিষ্য ছিল, দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যের পর তার সখ গেল গৃহস্থাশ্রমী হয়, গুরুও অনুমতি দিলেন। গৃহী হয়ে সে বেশ ধনীমানী হল। অনেক দিন কেটে গেল হঠাৎ গুরুর তার কথা খেয়াল হল)... শিষ্যবাড়ী এসে গুরু তাকে বললেন, কি রে গৃহস্থাশ্রমের আস্বাদ তো পেলি এখন চল। শিষ্য উত্তর দিল, ঠাকুর ছেলেপিলেগুলোর মাত্র কচি বয়স একটু বড়-সড় হলে যাব! গুরু বললেন,...ভুলিস না যেন!...ভুলিস না যেন।...গুরু চলে এলেন। এমনি করে আবার ১২ বছর কেটে গেল।—(আবার তার বাড়ী এলেন) ...জিজ্ঞাসা করলেন, কি রে এখনও এতে মজে রয়েছিস। শিষ্য বললে,—ঠাকুর ছেলেপিলেদের এখন বিয়ের বয়স হয়েছে, বিয়েটা দিয়েই যাই আর কি!...গুরুজী আবার বিদায় হলেন। (আবার অনেক বছর কেটে গেছে শিষ্য না আসাতে) গুরুজী আবার একদিন তার বাড়ী উপস্থিত! ছেলে-পিলেদের জিজ্ঞাসা করলেন,...তোদের বাবা কোথায়? তারা বললে, বাবা

তো দু বছর হল মারা গিয়েছে ? (গুরুজী) এই রে বেটা মাটি করেছে...গুরুজী ধ্যানমগ্ন হলেন। শিষ্যের গতিপথ তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে ফুটে উঠল! তিনি দেখলেন, সে কুকুর হয়ে জন্মেছে...এই বাড়ীতেই অবস্থান করছে! কুকুরটাকে ডেকে···বললেন, কিরে মানুষ ছিলি কুকুর হলি দেরী করলে আরও কতও কত দুর্দ্দশায় পড়তে হবে কে জানে! ভালয় ভালয় ফিরে চল! সে বললে,··· আমি যে তোমার ব্রহ্মচারী শিষ্য সে কথা আমার খুব মনে আছে। এই ছেলে পিলেগুলো একেবারে অপদার্থ, রাত্রিতে মড়ার মত ঘুমোয়, চোর ডাকাত ঢুকলে ? তাই কুকুর হয়ে ওদের বাড়ী পাহারা দিচ্ছি! (গুরুজী)... শীগ্‌গির চলে আসিস কিন্তু! (আবার অনেক বছর দেখে গুরুজী গেলেন কুকুরটা দেখতে পেলেন না)—জিজ্ঞাসায় জানলেন সেটা মারা গেছে—(গুরুজী ধ্যানে বসলেন) দেখলেন—যে সে এই বাড়ীতে সাপ হয়ে সিন্দুক পাহারা দিচ্ছে।...

তাকে ডেকে বললেন, বেটা মানুষ ছিলি কুকুর হলি তারপর সাপ ..আরও কত কি হবে! চল এখনও সময় আছে! (সাপের পূর্ব্বজীবনের স্মৃতি নষ্ট হয়েছে) সে যেতে চাইল না তখন গুরুজী ছেলেদের ডেকে বললেন, এক বিষধর সাপ ঘরে আছে। অমনি ছেলেরা গিয়ে মাটি খুড়ে সাপটা বের করে খুব করে পিটতে সুরু করল। সাপটা আধমরা হতে গুরু বললেন, না আর মারিস না ওর কর্ম্মশেষ হয়ে গিয়েছে—দে এখন ওটা আমাকে আমি নিয়ে যাই···। ১৫০ পৃ

ভাস্করানন্দ স্বামী রাজার মত সোনার থালে ভাল ভাল রাজভোগ সব অনায়াসে ভোগ করতেন অথচ এদিকে নেংটা! ১৭৪ পৃ

ঠাকুর বললেন, আমাদের গাঁয়ে কালী পণ্ডিত বলে একজন পণ্ডিত আছেন, তাঁর এক ঘোড়া ছিল।...ঘোড়াটা তাঁর বশে ছিল না, তিনিই ঘোড়ার বশ ছিলেন। হয়ত উত্তর দিকে একটা গাঁয়ে তাঁর কাজ আছে, ঘোড়ায় চড়ে সেই দিকে যাবেন মনঃস্থ করেছেন, খানিক দূরে গিয়েছেনও, ঘোড়া আর সেই দিকে যেতে চায় না, ছুটল পশ্চিম দিকে অমনি কালী পণ্ডিত বললেন, আচ্ছা চল ঐ দিকেই, অমুক গাঁয়ে অমুকের সঙ্গে অমুক কাজটা আছে সেইটা সেরে আসি। ২০১ পৃ

পাঠ্য অবস্থায় এক পুস্তকে পড়েছি : এক ঋষি বনে কুটির বেঁধে তপস্যা করতেন। একদিন এক অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সন্ধ্যার সময়…অতিথি হয়ে এল। (ঋষি তার সন্ধ্যাহ্নিকের ব্যবস্থা করে-খাবারও দিয়ে রাখলেন)...সে বামুন সন্ধ্যাহ্নিক না করেই খেতে বসল। তাই দেখে ঋষি খুব চটে গেলেন, বললেন, – সন্ধ্যাহ্নিক না করেই খাও! তোমার ব্যবহার অতি কদর্য্য – এই সব বলায় ব্রাহ্মণ ক্ষুণ্ণ হয়ে অভুক্ত অবস্থাতেই চলে গেল। ভগবান এসে ঋষিকে বললেন, তুমি ওকে দূর করে দিলে কেন? ঋষি বললেন, ব্রাহ্মণের ছেলে হয়েও সন্ধ্যাহ্নিক না করেই খেতে চেয়েছিল তাই। ভগবান বললেন, ও এতেই তুমি ওকে দূর করে দিলে? আমি ওকে ঐরূপ দেখেও ৮০ বৎসর খাবার যুগিয়ে আসছি, আর তুমি এক বেলার খাবারটাও দিতে পারলে না? ২১৯ পৃ

পাঞ্জাবী মেয়েরা আমায় দেখে কতদিন এসে বলেছে—তুমি কিসের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ?—রূপ চাও যৌবন চাও? আমি তাদের বলেছি, না মাই, আমি রূপ যৌবন কিছুই চাই না, আমি ভগবান কা ওয়াস্তে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমার এই কথা শুনে পাঞ্জাবী মেয়েরা বলত – ছিঃ ছিঃ রাম। রাম। ২৩১ পৃ

ইন্দোরের বি বি পাঠক (গাইকোয়াড় ষ্টেটের রেভিনিউ অফিসার)—একদিন নদীর ধারে বসে (আধ্যাত্মিক) বিষয় চিন্তা করছে এমন সময় সম্মুখের আকাশের গায়ে এক দিব্য জ্যোতির্ম্ময় ফুটে উঠল—সে বুঝল ইনিই তত্বজ্ঞ পুরুষ। (পরে) – ঠিক সেই স্থানে আকাশের গায়ে স্বর্ণাক্ষরে নাম ফুটে উঠল স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস।—সে আমায় চিঠি লিখতে God No ও বলে। ২৩২ পৃ

একজন বিধবাবিবাহের সমর্থন করে আমার কাছে বলতে আরম্ভ করলে, এই যে ভ্রূণ হত্যা হচ্ছে তার চেয়ে বিধবাদের বিবাহ দেওয়া উচিত নয় কি? আমি বললাম, বিধবাদের দরুন তো তোমার প্রাণ কেঁদে উঠেছে কিন্তু এখন যে কুমারীরা পর্য্যন্ত ভ্রূণ হত্যা করছে তাদের তোমরা কি করতে পারছ? ২৪ পৃ

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা। শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(জেলে) অরবিন্দবাবু ও দেবব্রতের মত যাঁহারা অপেক্ষাকৃত গম্ভীর প্রকৃতির তাঁহারা পাশের দুইটি কুঠরীতে আশ্রয় লইলেন। আর আমাদের মত চ্যাংড়া যাহারা, তাহারা মাঝের বড় কুঠরীটি দখল করিয়া সর্ব্বদিন ব্যাপি মহোৎসবের আয়োজন করিতে লাগিল। ৪৮ পৃ

অরবিন্দবাবুর জন্য একটা কোণ নির্দ্দিষ্ট ছিল। সমস্ত প্রাতঃকাল তিনি সেইখানে আপনার সাধনভজনের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন। ছেলেরা চীৎকার করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিলেও কোন কথাই কহিতেন না। অপরাহ্নে দুই তিন ঘণ্টা পায়চারি করিতে করিতে উপনিষদ বা অন্য কোনও ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিতেন। তবে সন্ধ্যাবেলায় এক আধ ঘণ্টার জন্য ছেলেখেলায় যোগ না দিলে তাঁহারও নিষ্কৃতি ছিল না। ৫২ পৃ

কানাইলাল প্রভৃতি চার পাঁচ জন নিদ্রার কাজটা সন্ধ্যার পরই সারিয়া লইত। রাত ১০টা ১১ টার সময় সকলে যখন ঘুমাইয়া পড়িত তখন তাহারা বিছানা ছাড়িয়া কাহার কোথায় সন্দেশ আম বা বিস্কুট লুকান আছে তাহার সন্ধান করিয়া ফিরিত। যে দিন সে সব কিছু মিলিত না, সে দিন এক গাছা দড়ি দিয়া কাহারও হাতের সহিত অপরের কাছা বা কানের সহিত অপরের পা বাঁধিয়া দিয়া ক্ষুণ্ণ মনে শুইয়া পড়িত। একদিন রাত্রে প্রায় ১টা সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি কানাই একজনের বিছানার তলা হইতে একটা বিস্কুটের টিন চুরি করিয়া মহানন্দে বগল বাজাইতেছে। অরবিন্দবাবু পাশেই শুইয়াছিলেন। আনন্দের সশব্দ অভিব্যক্তিতে তাঁহারও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কানাই অমনি খান কয়েক বিস্কুট লইয়া তাঁহার হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিল। বিস্কুট লইয়া অরবিন্দবাবু চাদরের মধ্যে মুখ লুকাইলেন; নিদ্রাভঙ্গের আর লক্ষণ দেখা গেল না। ৫৩ পৃ

সেই হাতকড়া পরান অবস্থায় পুলিশ আমাদের রাস্তা দিয়া টানিয়া লইয়া যাইত। আমাদের জন্য ততটা ভাবনা ছিল না; কেন না ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়! ...কিন্তু অরবিন্দবাবুকে হাতকড়া পরাইয়া টানিয়া লইয়া যাইতে দেখিলে মনটার ভিতর একটা বিদ্রোহ জমাট হইয়া উঠিত। তিনি কিন্তু নিতান্ত নির্ব্বিরোধ ভদ্রলোকের মত সমস্তই নীরব হইয়া সহ্য করিতেন। ৬৪ পৃ

সাক্ষীরা একে একে আসিয়া আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া যাইত, আমাদের মনে হইত যেন থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছি। উকিল ব্যারিষ্টারের জেরা, পুলিশ কর্মচারীদের ছুটাছুটি—সবই যেন একটা বিরাট তামাসা! আমাদের হাস্য কোলাহলে মাঝে মাঝে আদালতের কাজকর্ম বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইত। জজ সাহেব আমাদের হাতকড়া লাগাইবার ভয় দেখাইতেন, ব্যারিষ্টারেরা ছুটিয়া আসিয়া অরবিন্দবাবুকে অনুরোধ করিতেন, ছেলেদের একটু থামতে বলুন। অরবিন্দবাবু নির্ব্বিকার প্রস্তর মূর্ত্তির মত এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন, ব্যারিষ্টারদের অনুরোধের উত্তরে জানাইতেন যে, ছেলেদের উপর তাঁহার কোন হাত নাই। ৬৫ পৃ

এত হট্টগোল ও দলাদলির মধ্যে একেবারে নিশ্চল স্থাণুর মত বসিয়া থাকিতেন অরবিন্দবাবু। কোন কথাতেই হ্যাঁ, না, কিছুই বলিতেন না। জেলের প্রহরীদের নিকট হইতে তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনিতে পাইতাম। কেহ বলিত তিনি রাত্রে নিদ্রা যান না, কেহ বলিত তিনি পাগল হইয়া গিয়াছেন। ভাত খাইবার সময় আরসুলা টিকটিকি ও পিপড়েদের ভাত খাইতে দেন, স্নান করেন না, মুখ ধোন না কাপড় ছাড়েন না ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্যাপারটা জানিবার জন্য বড় কৌতুহল হইত। কিন্তু তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সাহস কুলাইত না। মাথায় মাখিবার জন্য আমরা কেহই তেল পাইতাম না। কিন্তু দেখিতাম যে অরবিন্দবাবুর চুল যেন তেল চক্‌চক্ করিতেছে। একদিন সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি স্নান করবার সময় মাথায় তেল দেন? অরবিন্দবাবুর উত্তর শুনিয়া চমকিয়া গেলাম। তিনি বলিলেন, আমি ত স্নান করি না। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার চুল তবে অত চকচকে হয় কি করে? অরবিন্দ বলিলেন, সাধনের সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরের কতগুলি পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। আমার শরীর থেকে চুল বসা (fat) টেনে নেয়। ৬৭ পৃ

…শেষে শচীন আস্তে আস্তে তাহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনি সাধন করে কি পেলেন। অরবিন্দ সেই ছোট ছেলেটির কাঁধের উপর হাত রাখিয়া হাসিয়া বলিলেন, যা খুঁজছিলাম তাই পেয়েছি। ৬৮ পৃ

…আমরা তাঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া বসিলাম। অন্তর্জগতের যে অপূর্ব্ব

কাহিনী শুনিলাম তাহা যে বড় বেশী বুঝিলাম তাহা নহে; তবে এই ধারণাটি হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গেল যে, এই অদ্ভুত মানুষটির জীবনে একটা সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। জেলের মধ্যে বৈদান্তিক সাধনা শেষ করিয়া তিনি যে সমস্ত তান্ত্রিক সাধনা করিয়াছিলেন তাহারও কতক কতক বিবরণ শুনিলাম। জেলের বাহিরে বা ভিতরে তাঁহাকে তন্ত্রশাস্ত্র লইয়া কখনও আলোচনা করিতে দেখি নাই। এ সমস্ত গুহ্য সাধনের কথা তিনি কোথায় পাইলেন জিজ্ঞাসা করায় অরবিন্দবাবু বলিলেন যে, একজন মহাপুরুষ সূক্ষ্ম শরীরে আসিয়া তাঁহাকে এই সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা দিয়া যান। মোকর্দ্দমার ফলাফলের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, আমি ছাড়া পাব। ৬৮ পৃ

(উল্লাসকর ও বারীন্দ্রের ফাঁসির হুকুম হয়)...বারীন্দ্র ফাঁসীর হুকুম শুনিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সেজদা (অরবিন্দ) বলে দিয়েছে ফাঁসী আমার হবে না। ৬৯ পৃ

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৪র্থ ভাগ)

আহা নরেন্দ্রের কি স্বভাব! (তখন হয়েছে) মা কালীকে আগে যা ইচ্ছা তাই বলত: আমি বিরক্ত হয়ে একদিন বলেছিলাম, শ্যালা তুই আর এখানে আসিস না! তখন সে আস্তে আস্তে গিয়ে তামাক সাজে! সে আপনার লোক তাকে তিরস্কার করলেও রাগ করবে না! কি বল! ৬৭ পৃ

হলধারীর জ্ঞানীর ভাব ছিল। সে অধ্যাত্ম উপনিষৎ—এই সব রাতদিন পড়ত। এদিকে সাকার কথায় মুখ ব্যাঁকাতো। আমি যখন কাঙ্গালীদের পাতে একটু একটু খেলাম, তখন সে বল্লে, তোর ছেলেদের বিয়ে কেমন করে হবে? আমি বল্লাম তবেরে শ্যালা, আমার আবার ছেলে পিলে হবে। তোর গীতা বেদান্ত পড়ার মুখে আগুন। ছ্যাখো না এদিকে বলছে জগৎ মিথ্যা! —আবার বিষ্ণুঘরে নাক সিঁটকে ধ্যান! ৭২ পৃ

মাকে বলেছিলাম, মা আমি শুটকো সাধু হব না! ৯২ পৃ

মাষ্টার—আলমবাজার পর্য্যন্ত গাড়ী করে এসে ওখান থেকে হেঁটে আসছি! মণিলাল—উঃ খুব ঘেমেছেন! শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) তাই ভাবি, আমার এসব বাই নয়! তা না হলে ইংলিসম্যানরা (Englishman) এত কষ্ট করে আসে। ৯৭ পৃ

পরিচয় খুব দিচ্ছিল। আমি নানা শাস্ত্র পড়েছি বেদ বেদান্ত—ষড়দর্শন। একজনকে জিজ্ঞাসা কল্লে, বেদান্ত জান? সে বল্লে, আজ্ঞে না। তুমি সাঙ্খ্য পাতঞ্জল জান? সে বল্লে, আজ্ঞে না। (পণ্ডিত) দর্শন টর্শন কিছু পড় নাই? সে বল্লে, আজ্ঞে না।...এমন সময় বড় নৌকা ডুবতে লাগলো। সেই লোকটি বল্লে, পণ্ডিতজী আপনি সাঁতার জানেন? পণ্ডিত বল্লে, না। সে বল্লে, আমি সাঙ্খ্য পাতঞ্জল জানি না, কিন্তু সাঁতার জানি। ৯৯ পৃ

রামযাত্রা হচ্ছিল। কৈকেয়ী রামকে বনবাস যেতে বল্লেন, হলধারীর বাপ যাত্রা শুনতে গিছিল···একেবারে দাঁড়িয়ে উঠলো। যে কৈকেয়ী সেজেছে, তার কাছে এসে 'পামরী' এই কথা বলে দেউটি (প্রদীপ) দিয়ে মুখ পোড়াতে গেল। ১০৭ পৃ

(বৈরাগ্য দুই প্রকার—তীব্র আর মন্দা) আর এক রকম বৈরাগ্য, তাকে বলে মর্কট বৈরাগ্য। সংসারের জ্বালায় জ্বলে গেরুয়া বসন পরে কাশী গেল। অনেক দিন সংবাদ নাই। তারপর একখানা চিঠি এল—তোমরা ভাবিবে না, আমার এখানে একটি কর্ম্ম হইয়াছে। ১১১ পৃ

সন্ন্যাসীর হচ্ছে নির্জলা একাদশী। আর দুরকম একাদশী আছে। ফল মূল খেয়ে—আর লুচি ছক্কা খেয়ে। (সকলের হাস্য) লুচি ছক্কার সঙ্গে দুখানা রুটি দুধে ভিজছে।—তোমরা নির্জলা একাদশী পারবে না। কৃষ্ণকিশোরকে দেখলাম একাদশীতে লুচি ছক্কা খেলে। আমি হৃদুকে বল্লাম, হৃদু আমার কৃষ্ণ কিশোরের একাদশী করতে ইচ্ছে হচ্ছে। (সকলের হাস্য) তাই একদিন করলাম, খুব পেট ভরে খেলাম। তারপর দিন আর কিছু খেতে পারলাম না। ১১৩ পৃ

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধুকে টাকা দিতে হলেই তাকে আর ভাল লাগে না। রাজেন্দ্র মিত্র, আট শ টাকা মাইনে, প্রয়াগে কুম্ভমেলা দেখে এসেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম; কেমন গা মেলায় কেমন সব সাধু দেখলে? রাজেন্দ্র বল্লে, কই তেমন সাধু দেখতে পেলাম না। একজনকে দেখলাম বটে কিন্তু তিনিও টাকা লন। ভাবি যে সাধুদের কেউ টাকা পয়সা দেবে না ত খাবে কি করে? এখানে প্যালা দিতে হয় না—তাই সকলে আসে। ১১৩ পৃ

এখনও সন্ধ্যা হয় নাই। ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়া মাষ্টারের সহিত

কথা কহিতেছে।...এদিকে মহিমাচরণ পশ্চিমের গোল বারান্দায় বসিয়া মণি সেনের ডাক্তারের সহিত উচ্চৈঃস্বরে শাস্ত্রালাপ করিতেছেন। ঠাকুর নিজের আসন হইতে শুনিতে পাইকেছেন ও ঈষৎ হাস্য করিয়া মাষ্টারকে বলিতেছেন, ঐ ঝড়ছে ! রজোগুণ। রজোগুণ একটু পাণ্ডিত্য দেখাতে, লেকচার দিতে ইচ্ছে হয়। ১১৫ পৃ

সকলকেই দেখি মেয়েমানুষের বশ। কাপ্তেনের বাড়ী গিছলাম তার বাড়ী হয়ে রামের বাড়ী যাব। তাই কাপ্তেনকে বল্লাম, গাড়ীভাড়া দাও। কাপ্তেন তার মাগকে বল্লে, সে মাগও তেম্নি–ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া করতে লাগলো। শেষে কাপ্তেন বল্লে যে ওরাই (রামেরাই) দেবে। (ঠাকুর) গীতা ভাগবত বেদান্ত সব ওর ভিতরে। (সকলের হাস্য) ১২১ পৃ

(পঞ্চবটী হইতে ঠাকুর ফিরিলেন) শ্রীরামকৃষ্ণ-সিঁতির গোপালের প্রতি –হ্যাঁগা ছাতাটা এনেছ ? গোপাল –আজ্ঞে না। গান শুনতে শুনতে ভুলে গেছি। ছাতিটি পঞ্চবটীতে পড়িয়া আছে। গোপাল তাড়াতাড়ি গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ – আমি যে এত এলোমেলো তবু অতদূর নয়। রাখাল এক জায়গায় নিমন্ত্রণের কথায় ১৩ইকে বলে ১.ই ! আর গোপাল গরুর পাল। ১২৪ পৃ

কি জানো দেহ রক্ষার অসুবিধা হচ্ছে···নোটো (লাটু) চড়েই রয়েছে -ক্রমে লীন হবার যো। রাখাল এমনি স্বভাব হয়ে দাড়াচ্ছে যে তাকে আমার জল দিতে হয় সেবা করতে বড় পারে না ১৩০ পৃ

শাক্তেরাও বৈষ্ণবদের খাটো করার চেষ্টা করে। বৈষ্ণবরা বলে শ্রীকৃষ্ণ ভবনদীর কাণ্ডারী, পার করে দেন। শাক্তেরা বলে, তা তো বটেই, মা রাজ-রাজেশ্বরী তিনি কি আপনি এসে পার করবেন ? ঐ কৃষ্ণকে রেখে দিয়েছেন পার করবার জন্যে। (সকলের হাস্য) ১৩৬ পৃ

নিজের নিজের মত লয়ে আবার অহঙ্কার কত ! ও দেশে শ্যামবাজারে··· তাঁতীরা আছে। অনেক বৈষ্ণব তাদের লম্বা লম্বা কথা বলে, ইনি কোন বিষ্ণু মানেন ? পাতা বিষ্ণু (অর্থাৎ যিনি পালন করেন)–ও আমরা ছুঁই না ! কোন শিব ? আমরা আত্মারাম শিব, আত্মারামেশ্বর শিব মানি। কেউ বলছে, তোমরা বুঝিয়ে দাও না কোন হরি মান। তাতে কেউ বলছে, না আমরা আর কেন, ঐখান থেকেই হোক। ১৩৭ পৃ

বুড়ির মা রাণী কাত্যায়নীর মোসাহেব। বৈষ্ণবচরণের দলের লোক, গোঁড়া বৈষ্ণব। এখানে খুব আসা যাওয়া করতো। ভক্তি ছাখে কে! যাই আমায় দেখলে মা-কালীর প্রসাদ খেতে, অমনি পালালো। ১৩৭ পৃ

(শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভরের) কন্যা—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণর প্রতি—আমি তোমায় নমস্কার করলুম দেখলে না। শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) কই দেখি নাই। কন্যা—তবে দাঁড়াও আবার নমস্কার করি—দাঁড়াও এ পা, টা করি। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে উপবেশন করিলেন ও ভূমি পর্য্যন্ত মস্তক নত করিয়া কুমারীকে প্রতিনমস্কার করিলেন।...মেয়েটিকে গান গাহিতে বলিলেন। কন্যা বলিল, মাইরি, গান জানি না। তাহাকে আবার অনুরোধ করাতে বলিতেছে, মাইরি বল্লে আর বলা হয়? ঠাকুর তাহাদের (তাহার সহিত আরও দুএকটি সমবয়স্ক ছেলে মেয়ে ছিল) হইয়া আনন্দ করিতেছেন ও গান শুনাইতেছেন, প্রথমে, আয় লো তোর খোঁপা বেধে দি, তোর ভাতার এলে বলবে কি! ১৩২ পৃ

হাজরা—নরেন্দ্র আবার মোকদ্দমায় পড়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ—শক্তি মানে না। দেহ ধারণ করলে শক্তি মানতে হয়। হাজরা—বলে আমি মানলে সকলেই মানবে—তা কেমন করে মানি! শ্রীরামকৃষ্ণ—অতদূর ভাল নয়। এখন শক্তির এলাকায় এসেছে। জজসাহেব পর্য্যন্ত যখন সাক্ষী দেয়, তাঁকে সাক্ষীর বাক্সে নেমে এসে দাঁড়াতে হয়। ১৬১ পৃ

গান সমাপ্ত হইল। নরেন্দ্র ভবনাথ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে ঠাকুর কথা কহিতেছেন। সহাস্তে বলিতেছেন, হাজরা নেচেছিল। নরেন্দ্র—আজ্ঞা একটু একটু। শ্রীরাম কৃষ্ণ—একটু একটু। নরেন্দ্র (সহাস্তে) ভুঁড়ি আর একটা জিনিষ নেচেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—সে আপনি হেলে দোলে—না দোলাতে আপনি দোলে! (সকলের হাস্য) ১৬০ পৃ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৪র্থভাগ ১৭১ পৃ

একজনের শ্বশুর ভাসুরের নাম হরে, কৃষ্ণ এই সব। এখন হরি নাম তো করতে হবে! কিন্তু হরে কৃষ্ণ বলবার যো নাই। তাই সে জপ করছে:

ফরে ফৃষ্ট ফরে ফৃষ্ট ফৃষ্ট ফৃষ্ট ফরে ফরে।

ফরে রাম ফরে রাম রাম রাম ফরে ফরে। ১৭২ পৃ

ও দেশে এই মতের লোক (ঘোষপাড়ার মতের লোক) একজন দেখেছি। সরী (সরস্বতী) পাথর — মেয়ে মানুষ। এ মতের লোকে পরস্পরের বাড়ীতে খায়, কিন্তু অন্য মতের লোকের বাড়ী খাবে না। মল্লিকরা সরী পাথরের বাড়ীতে গিয়ে খেলে তবু হৃদের বাড়ীতে খেলে না। বলে ওরা জীব (অন্যমতের লোকেদের ওরা বলে জীব)। ১৭৭ পৃ

একজন স্ত্রীলোক একজন মুছলমানের উপর আসক্ত হয়; তার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ডেকেছিল। মুছলমানটি সাধুলোক ছিল, সে বল্লে আমি প্রস্রাব করবো, আমার বদনা আনতে যাই। স্ত্রীলোকটি বল্লে, তা···আমি বদনা দিব এখন। সে বল্লে, তা হবে না, আমি যে বদনার কাছে লজ্জা ত্যাগ করেছি সেই বদনাই ব্যবহার করবো — নূতন বদনার কাছে নির্লজ্জ হবো না। এই বলে সে চলে গেল।...১৮৬ পৃ

···দেখো চৈতন্যদেব কত বড় পণ্ডিত, আর তিনি অবতার, তিনি যে কালে এই নাম প্রচার করেছিলেন এ অবশ্য ভাল। (সহাস্যে) চাষারা নিমন্ত্রণ খাচ্চে তাদের জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমরা আমড়ার অম্বল খাবে? তারা বল্লে, যদি খেয়ে থাকেন তাহলে আমাদের দেবেন! তাঁরা যে কালে খেয়ে গেছেন, সেকালে ভালই হয়েছে। ২০৩ পৃ

বারোয়ারীতে নানা মূর্ত্তি করে...রাধাকৃষ্ণ হরপার্বতী সীতারাম···প্রত্যেক মূর্ত্তির কাছে লোকের ভীড়।···তবে যাদের কোন ঠাকুরের দিকে মন নাই তাদের আলাদা কথা। বেশ্যা উপপতিকে ঝাঁটা মারছে—বারোয়ারীতে এমন মূর্ত্তি করে। ও সব লোক সেইখানে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখে, আর চীৎকার করে বন্ধুদের বলে, আরে ও সব কি দেখছিস্ এদিকে আয়। এ দিকে আয়। ২২৫ পৃ

ঠাকুর এইবার ছোকরাদের সঙ্গে ফষ্টি নষ্টি করতে লাগলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ — আমি এদের কেবল নিরামিষ দিই না। মাঝে মাঝে আঁশ ধোয়া জল একটু একটু দিই তা না হলে আসবে কেন। ২২৬ পৃ

বটতলায় সন্ন্যাসীকে দেখলাম। যে আসনে গুরু পাদুকা রেখেছে তারই উপর শালগ্রাম রেখেছে। ও পূজা করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, যদি এতদূর জ্ঞান হয়ে থাকে তবে পূজা করা কেন। সন্ন্যাসী বল্লে, সবই করা যাচ্ছে

এও একটা করলাম। ২৩১ পৃ

শ্রীরামকৃষ্ণ—লোকে শ্বশুরবাড়ী যায়। এ তো ভেবেছিলুম, বিয়ে করবো, শ্বশুরঘর যাবো—সাধ আহ্লাদ করবো! কি হয়ে গেল! ২৬৬ পৃ

…ঠাকুর হাসিতেছেন কিয়ৎক্ষণ পরে মাষ্টার বাবুরাম প্রভৃতি ভক্তদের বলিতেছেন, আমার বড় হাসি পাচ্ছে। ভাবছি—এঁদের (যাত্রাওয়ালাদের) আবার আমি গান শোনাচ্ছি। নীলকণ্ঠ—আমরা যে গান গেয়ে বেড়াই তার পুরস্কার আজ হলো। শ্রীরামকৃষ্ণ—কোন জিনিষ বেচলে এক খামচা ফাউ দেয়—তোমরা ওখানে গাইলে, এখানে ফাউ দিলে। ২৮০ পৃ

শ্রীরামকৃষ্ণ (গোপাল মাকে) সে কি গো এই তুমি আমাকে গোপাল বল আবার নমস্কার! যাও বাড়ীর ভিতর গিয়ে একটি বেগুন রাঁধ গে-খুব কোঁড়ন দিও—যেন এখানে পর্য্যন্ত গন্ধ আসে। ২৯৪ পৃ

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রকে)—একটু গা না। নরেন্দ্র—ঘরে যাই অনেক কাজ আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বাছা আমাদের কথা শুনবে কেন? যার আছে কানে সোনা, তার কথা আনা আনা। যার আছে পোঁদে ট্যানা তার কথা কেউ শোনে না! ২৯৫ পৃ

ডাক্তার এইবার অসুখের স্থানটি দেখিবেন। গোল বারান্দায় একখানি কেদারাতে (চেয়ার) ঠাকুর বসিলেন। ঠাকুর প্রথমে ডাক্তার সরকারের কথা বলিতেছেন, শ্যালা যেন গরুর জিহ্বা টিপলে! ভগবান ডাক্তার—তিনি বোধ হয় ইচ্ছা ওরূপ করেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ—না, তা নয় খুব ভাল করে দেখবে বলে টিপে ছিল! ৩৪০ পৃ

ডাক্তার একাগ্রমনে শুনিতেছেন। গান সমাপ্ত হইলে বলিতেছেন, চিদানন্দ সিন্ধু নীরে ঐটি বেশ! ডাক্তারের আনন্দ দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন—ছেলে বলেছিল বাবা একটু মদ চেকে দেখ, তারপর আমায় ছাড়তে বলতো ছাড়া যাবে। বাবা খেয়ে বল্লে, তুমি বাছা ছাড় আপত্তি নাই কিন্তু আমি ছাড়ছি না। ৩৭০ পৃ

নোটো (লাটু) খতালে একত্রিশ জন ভক্ত। কৈ তেমন বেশী কৈ? তবে কেদার আর বিজয় কতকগুলো কচ্ছে! ৩৭৬ পৃ

নরেন্দ্র—সেদিন মহিম চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে আমরা গিছিলাম···আমাদের গান গাইতে বল্লে, গঙ্গাধর গাইলে :

শ্যাম নামে প্রাণ পেয়ে ইতি উতি চায়
সম্মুখে তমাল বৃক্ষ দেখিবারে পায় !

গান শুনে (মহিম চক্রবর্ত্তী) বল্লে, ও সব গান কেন প্রেম ট্রেম ভাল লাগে না। তা ছাড়া মাগ ছেলে নিয়ে থাকি, এ সব গান এখানে কেন ? শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) ভয় দেখেছ ! ৩৮০ পৃ

লীলাপ্রসঙ্গ।

একদিন কথা প্রসঙ্গে ঠাকুর, ভক্তের স্বভাব চাতক পক্ষীর ন্যায় হইয়া থাকে, বলিয়া বুঝাইয়া দিতেছিলেন। চাতক যেমন নিজ পিপাসা শান্তির জন্য সর্ব্বদা মেঘের দিকে তাকাইয়া থাকে—নরেন্দ্র তখন তথায় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন, মহাশয় চাতক বৃষ্টির জল ভিন্ন অন্য কিছু পান করে না—ঐ রূপ প্রসিদ্ধি থাকিলেও ঐ কথা সত্য নহে—। ঠাকুর বলিলেন, সে কিরে—চাতক অন্য পক্ষীর ন্যায় জলপান করে ?—তুই যখন দেখিয়াছিস তখন ত আর ঐ বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারি না—উহার স্বল্পদিন পরেই নরেন্দ্র এক দিবস ঠাকুরকে সহসা ডাকিয়া বলিলেন, ঐ দেখুন মহাশয় চাতক গঙ্গার জল পান করিতেছে। ঠাকুর ব্যস্ত হইয়া দেখিতে আসিয়া বলিলেন, কৈরে ? নরেন্দ্র দেখাইয়া দিলে তিনি দেখিলেন, একটি চামচিকা জল পান করিতেছে এবং হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ওটা চামচিকা যে। ওরে শালা, তুই চামচিকাকে চাতক জ্ঞান করিয়া আমাকে এতটা ভাবাইয়া দিস। তোর সকল কথায় আর বিশ্বাস করিব না। ১৭৯ পৃ

(নরেন্দ্রনাথের) তাঁহার পাশ্চাত্য মত সকলের পক্ষপাতিত্ব এ সময় তাঁহার বন্ধুবর্গের ভিতর এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে, গীতা অধ্যয়ন করিয়া তিনি যে দিন তাঁহাদিগের নিকট উহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন সেদিন বিস্মিত হইয়া তাঁহারা তাঁহার ঐরূপ আচরণের কথা ঠাকুরের কর্ণগোচর করিয়াছিলেন, ঠাকুরও তাহাতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সাহেবদের মধ্যে কেহ গীতা সম্বন্ধে ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া সে ঐরূপ করে নাই ত ? ১৯০ পৃ

(মহিমারণ চক্রবর্ত্তী)—কিসে লোকে তাঁহাকে ধনী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান ধার্ম্মিক, দানশীল ইত্যাদি যাবতীয় সদগুণশালী বলিবে, এই ভাবনা তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য নিয়মিত করিয়া সময়ে সময়ে তাহাকে লোকের নিকট হাস্যাস্পদ করিয়াও তুলিত। চক্রবর্ত্তী মহাশয় কোন সময় এক অবৈতনিক

শঙ্করানন্দ গল্প কথা। লেথক (প্রকাশক—সমরসাধন চৌধুরী—গ্রাম বামুনমুড়া, পোষ্ট বাদু, ২৪ পরগণা।)

বিদ্যালয় খুলিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন, প্রাচ্য-আর্য্য-শিক্ষা-কাণ্ড-পরিষৎ। তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন, মৃগাঙ্কমৌলী পুততণ্ডী, বাটিতে একটি হরিণ ছিল, তাহার নামকরণ করিয়াছিলেন 'কপিঞ্জল' কারণ তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তির কি শোভা পায়। ৩১২

স্বামীজী আমেরিকা থেকে ফেরার পর মায়ের সঙ্গে বাড়ীতে দেখা করতে গিছলেন। স্বামীজার ছোট ভাই ভুপেন তখন চীনে। মহিমবাবুর বাড়ীতেই ছিলেন। মা তখনও ছেলেকে 'বিলে' বলে ডাকতেন। বিলে মায়ের কাছে পাশ্চাত্যের লোকের শ্রদ্ধা ভক্তির কথা বলতে বলতে উজ্জল হয়ে উঠল। বিদেশের বাস্তব চিত্রের কল্পনায় সকলে মশগুল গল্প বেশ জমে উঠেছে। এমন সময় মা বলে উঠলেন, দেখ্, বিলে তোর নামটাম তো খুব হল আর কেন, এবার বিয়ে টিয়ে করে সংসার কর। স্বামীজী নিরুত্তর। কেবল একটু হাসলেন। মা আবার বলতে লাগলেন, এই তো মহিম বিয়ে করবে বলেছে, ভুপেনও করবে। বিলে সঙ্গে সঙ্গে মহিমকে জিজ্ঞাসা করে বসল, কিরে তুই বিয়ে করবি? মহিম উত্তর দিল, না। মা উত্তর শুনে ভীষণ রেগে গেলেন। মা ভাবতেই পারেন না, যে মহিম তা'র কথা ঠেলে দেবে, তা'র মুখের উপর ঐ রকম উল্টো জবাব দেবে। সামনে পড়েছিল চটি জুতো, তুলে নিয়ে মারলেন এক ঘা পিঠে। মারার পর মা আবার মহিমকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিরে বিয়ে করবি তো? মহিম উত্তর দিল, মা তুমি জুতো মেরেছ বলে কি আমি মত বদলিয়ে ফেলব। ৪৮পৃ

স্বামীজী একদিন তাঁর শোবার ঘরে বসে গান ধরেছেন। গানের আগাগোড়া রঙ্গরসে ভর্ত্তি—যদি হতে চাও সন্ন্যাসী, চাঁদ মুখে মাখ ছাই। শরৎ সত্য সত্যই সেই গান শুনে নিজেকে এত ভুলে গেলেন যে, উনুনের মধ্য থেকে

ছাই মুখে মেখে স্বামীজীর সামনে হাজির। কে জানত সে দিন তাঁর রসিকতা কোনদিন সত্যে পরিণত হবে। ৫৩ পৃ

(হরিহর মহারাজের গা হাত পা টিপিয়া দিত)—বললাম, তুমি ব্যথার জায়গায় জোরে টিপতে বলে তোমার দ্বারা আর টিপালুম না। ব্যথার উপর বেশী টিপলে ফোলে এবং ব্যথা আরও বেড়ে যায়। বলে কি না, 'বিষস্য বিষমৌষধম' বললাম, তাহলে ফোঁড়ার উপর কসে কিল মারলেই হয়। আবার বলে, অস্ত্রোপচারও যা মারাও তা। ৭১ পৃ

আমরা যখন স্কুলে পড়ি তখন আমাদের একজন হেড পণ্ডিত ছিলেন বড্ড কড়া তিনি আবার সুপারইনটেনডেণ্ট ছিলেন বোর্ডিং-এর। একদিন দেখি তিনি মুখ চোখ লাল করে গম্ভীর হয়ে হেড মাষ্টারের ঘরে ঢুকে ছেলেদের বিরুদ্ধে কমপ্লেন করছেন। কী সব.দুষ্টু ছেলে দেখুন। আমার ঘরের দরজায় পণ্ডিত শালা লিখে রেখেছে। আমি দরজাটা বন্ধ করে আসব এমন সময় দেখি খড়ি দিয়ে লেখা একটা কপাটে পণ্ডিত আর একটা কপাটে শালা। প্রথমে ভাবিলাম আমিই এর প্রতিকার করি। তারপর সমস্যাটি অত্যন্ত জটিল ভেবে আপনার কাছে পেশ করলাম। আপনি ছেলেদের যথাবিহিত শাস্তিবিধান করুন। এই আমি চাই। ১২৫ পৃ